সীরাতুন্নবী [সা.] ২০০৭ হিজরী ১৪২৮

সাহিত্য সংস্কৃতি

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৭

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১ গ্রীনওয়ে, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৭

প্র কা শ কা ল

জমাদিউস সানী ১৪২৮

আষাঢ় ১৪১৪

জুলাই ২০০৭

প্র চ্ছ দ

মুবাশ্বির মজুমদার

মু দ্র ণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্র কা শ না য়

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১ গ্রীনওয়ে, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩৩৩৩২০

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
সাইফুল্লাহ মানছুর

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

সদস্য
হাসান আলীম
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
নাসির হেলাল
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
আলতাফ হোসাইন রানা

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

পরিচালনা পরিষদ ২০০৭

সভাপতি	:	সাইফুল্লাহ মানছুর
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
সহকারী সেক্রেটারী	:	আবেদুর রহমান
গবেষণা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
মিডিয়া সম্পাদক	:	মাহবুবুল হক
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সাহিত্য সম্পাদক	:	মোশাররফ হোসেন খান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শাহ আলম নূর
প্রকাশনা সম্পাদক	:	নাসির হেলাল
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	:	আবদুর রহীম খান
অফিস ও পাঠাগার সম্পাদক	:	মোঃ বিল্লাল হোসেন

জো না ল দা য়ি ত্ব শী ল

জোন-এক

সভাপতি		মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সেক্রেটারী		শাহ আলম নূর

জোন-দুই

সভাপতি	:	মোঃ আবেদুর রহমান
সেক্রেটারী	:	হারুন ইবনে শাহাদাত

জোন-তিন

সভাপতি	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সেক্রেটারী	:	মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

জোন-চার

সভাপতি	:	মোঃ আমিনুল ইসলাম
সেক্রেটারী	:	আবদুর রহীম খান

জোন-পাঁচ

সভাপতি	:	হাসান আলীম
সেক্রেটারী	:	আবদুল্লাহ আল মামুন

টিম সদস্য

আসাদ বিন হাফিজ
মোঃ আবেদুর রহমান
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
হাসান আলীম
মোঃ আমিনুল ইসলাম

www.pathagar.com

আমাদের সাম্প্রতিক সিডি ভিসিডি প্রযোজনা

CHP ®

ক্যাসেট সিডি ভিসিডি ডিভিডি ক্রয়ের সময় মনোগ্রাম দেখে নিন

CHP ®

স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার

প্রধান কার্যালয়ঃ ফোন - ৯৩৪২২১৫, ০১৭১১৮২৭৯৫৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৩৬২৩৫০ e-mail : spondon@bangla.net

ঢাকার শো-রুম-১ : চাষীকল্যাণ ভবন (নীচতলা), ৪৩৫,এ/২, ওয়ারলেছ রেলগেইট, বড়মগবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৯৩৬০৭৭১

ঢাকার শো-রুম-২ : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৭১১৪৩৬১৬১৬

সিলেটের শো-রুম : করিম উল্লা মার্কেট (৪র্থ তলা), বন্দরবাজার
সিলেট, ফোন : ০১৭১৭১৩২৩২৯

ফেনী শো-রুম : তমিজিয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা), মিজান রোড
ফেনী, ফোন- ০১৭২৬৪৯৫৯৮৫

চট্টগ্রামের শো-রুম : ইসকপ অডিও ভিডিও সেন্টার, আন্দরকিল্লা, শাহী মসজিদ মার্কেট
২য় তলা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০১৭১১৩৮১৯৬০

বগুড়ার শো-রুম : ৭, ইসলামী ব্যাংক প্লাজা, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক
বগুড়া, ফোন : ০১৮১৯-০৪২০১০

সাতক্ষীরার শো-রুম : মুনশি পাড়া, পুরাতন সাতক্ষীরা, ফোন : ০১৭১০৯৫৮২৪৮

কুমিল্লা শো-রুম : কুমিল্লা টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্স, লাকসাম রোড
কুমিল্লা, ফোন : ০১৭২৫৬১১৩৩৬

যশোর শো-রুম : মোল্লাপাড়া মোড়, ঢাকা রোড, যশোর, ফোন : ০১৭১৬৯৩২৯০০

সূচীপত্র

স ম্পা দ কী য়
রাসূলুল্লাহর [সা] সমাজ বিপ্লব ॥ ১১

চ য় ন ॥ ক বি তা
রাসূলের [সা] আবৃত্তিকৃত কবিতাংশ ॥ ১৫

চা র খ লি ফা র [রা] ক বি তা
হযরত আবুবকর [রা] রচিত কবিতা ১৫ ▮ হযরত উমর [রা] প্রণীত কবিতার অংশ ১৬ ▮ হযরত উসমান [রা] লিখিত কবিতা ১৭ ▮ হযরত আলী [রা]-র কবিতা ১৭

তি ন সা হা বী [রা] ক বি র ক বি তা ং শ
আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা [রা] ১৮ ▮ কা'ব ইবনে যুহায়র [রা] ১৮ ▮ হাসসান ইবনে সাবিত [রা] ১৯

চ য় ন ॥ প্র ব ন্ধ
ইসলামের সাধনা ॥ এয়াকুব আলী চৌধুরী ২০ ▮ হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ॥ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ২২

প্র ব ন্ধ
সমাজ সংস্কারে ও সমাজ গঠনে শেষ নবী [সা]-এর আদর্শ ॥ আবু নকীব ২৭ ▮ নবী মুহাম্মাদের [সা] আদর্শ ॥ ড. কাজী দীন মুহম্মদ ৩২ ▮ আল্লাহর রাসূলের [সা] কিছু অনন্য গুণ ॥ এ. কে. এম. নাজির আহমদ ৩৮ ▮ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৪৩

www.pathagar.com

ক বি তা গু চ্ছ
আবদুর রশীদ খান ৫২ ▮ আশরাফ সিদ্দিকী ৫৩ ▮ আফজাল চৌধুরী ৫৫ ▮ মতিউর রহমান মল্লিক ৫৬ ▮ সোলায়মান আহসান ৫৬ ▮ আবদুল হালীম খাঁ ৫৮ ▮ মহিউদ্দিন আকবর ৫৯ ▮ জাকির আবু জাফর ৬০ ▮ ওমর বিশ্বাস ৬১ ▮ মনসুর আজিজ ৬২

প্র ব ন্ধ
ইসলামের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী ॥ মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী ৬৩ ▮ যখন এলেন আলোর নবী ॥ আসাদ বিন হাফিজ ৭৩ ▮ উপমহাদেশের সন ব্যবস্থাপনায় হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রভাব ॥ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ৭৮

ক বি তা গু চ্ছ
আবদুল মুকীত চৌধুরী ৮৬ ▮ সুজাউদ্দিন কায়সার ৮৭ ▮ নুরুল ইসলাম মানিক ৮৮ ▮ গাজী এনামুল হক ৮৯ ▮ শরীফ আবদুল গোফরান ৮৯ ▮ আল হাফিজ ৯০ ▮ হেলাল আনওয়ার ৯১ ▮ দেলোয়ার হোসেন ৯২ ▮ রেদওয়ানুল হক ৯৩ ▮ আফসার নিজাম ৯৩

সা হি ত্য
ফররুখের কবিতায় রাসূল [সা] ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ৯৪ ▮ সাহিত্য-চর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা ॥ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ১০৪ ▮ "উদিল আরবে নতুন সূর্য মানব-মুকুট-মণি" ॥ শফি চাকলাদার ১১৩

ক বি তা গু চ্ছ
মাহবুবুল হক ১১৮ ▮ সামুয়েল মল্লিক ১১৯ ▮ হারুন ইবনে শাহাদাত ১২০ ▮ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন ১২১

ভ্র ম ণ
শোয়েব নবীর দেশে ॥ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১২২

ছো ট গ ল্প
যেখানে মানুষ বড় ॥ জাফর তালুকদার ১৫৯ ▮ বরকতের ঝর্ণা ॥ হাসান আলীম ১৬৩

প্র ব ন্ধ
প্রাচ্যবিশেষজ্ঞগণের ডাহা মিথ্যাচার : প্রেক্ষাপট সীরাতে রাসূল [সা] ॥ ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম ১৬৭ ▮ বাংলাদেশের প্রান্ত হতে

www.pathagar.com

সালাম জানাই হে রাসূল [সা] ॥ ড. মাহফুজ পারভেজ ১৭১ ▮ চারিত্রিক উন্নয়নে রাসূলের [সা] আদর্শ ॥ ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম ১৭৬ ▮ নতুন এক সভ্যতার নির্মাতা মুহাম্মাদ [সা] ॥ ইকবাল কবীর মোহন ১৮৩

ক বি তা গু চ্ছ

মাহফুজুর রহমান আখন্দ ১৮৯ ▮ আলতাফ হোসাইন রানা ১৮৯ ▮ সা'দত সিদ্দিক ১৯০ ▮ ইব্রাহীম মন্ডল ১৯১ ▮ সোহরাব আসাদ ১৯১ ▮ শহীদ সিরাজী ১৯২ ▮ শেখ এনামুল হক ১৯৩ ▮ শুভ জাহিদ ১৯৪ ▮ খালীদ শাহাদাৎ হোসেন ১৯৫ ▮ মোঃ আমিনুল ইসলাম ১৯৬ ▮ মাসুদা সুলতানা রুমী ১৯৭

সা হি ত্য

আবূ তালিবের কবিতায় রাসূলুল্লাহ [সা] ॥ আহমদ আবুল কালাম ১৯৮

অ নু বা দ

ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক অবদান ॥ ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী ॥ তরজমা : আকরাম ফারুক ২০৫ ▮ হযরত মুহাম্মাদের [সা] নবুওয়াত ॥ তরজমা : সৈয়দ আবদুল মান্নান ২১১ ▮ রাসূল [সা] এবং বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিত ॥ মার্টিন লিঙস্ ॥ অনুবাদ : জিয়াউল আহসান ২২২

স ং স্কৃ তি

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য-সংস্কৃতি ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ২৩১ ▮ রাসূল [সা] নির্দেশিত আমাদের সংস্কৃতি ॥ হাশিম হায়দার ২৩৬

প্র ব ন্ধ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] লালনে মা হালীমার অবদান ॥ মুহাম্মাদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী ২৪৬ ▮ বাংলাদেশের যুবসমাজ এবং রাসূল [সা]-এর আদর্শ ॥ আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ ২৫১

ক বি তা গু চ্ছ

নূর-ই আউয়াল ২৫৭ ▮ নূরুজ্জামান ফিরোজ ২৫৭ ▮ নিজাম সিদ্দিকী ২৫৮ ▮ গোলাম নবী পান্না ২৫৯ ▮ শফিকুর রহমান রঞ্জু ২৬০ ▮ মালেক মাহমুদ ২৬১ ▮ জোনায়েদ মানসুর ২৬১ ▮ হারুন

www.pathagar.com

আল রাশিদ ২৬২ ▌নার্গিস চমন ২৬২ ▌জালাল খান ইউসুফী ২৬৩ ▌শাহ মুহাম্মদ মোশাহিদ ২৬৩

প্র ব ন্ধ

শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ [সা] ॥ মুহাম্মদ হামিদ হোসাইন আজাদ ২৬৪ ▌সীরাত চর্চার ইতিবৃত্ত ॥ নাসির হেলাল ২৭৪ ▌উসওয়াতুন হাসানা ॥ আবেদুর রহমান ॥ ২৯৬

ছো ট গ ল্প

আসল ঠিকানা ॥ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ২৯৯ ▌মানবদেহে কুসুম-কলি ॥ মোহাম্মদ সফিউদ্দিন ৩০৩

প্র ব ন্ধ

রাসূল [সা] নির্দেশিত ইসলামী জীবন ও সুন্দর আচরণ ॥ কাজী তাবাসসুম ৩১১ ▌রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসা ঈমানের শর্ত ॥ ফখরুদ্দীন আহমাদ ৩১৮ ▌অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় একমাত্র রাসূলুল্লাহ [সা] ॥ এস.এম. জহির উদ্দীন ৩২৩ ▌অপরাধ দমনে রাসূলের [সা] ভূমিকা ॥ হুসাইন আল জাওয়াদ ৩২৯

প্র তি বে দ ন

বার্ষিক প্রতিবেদন : এপ্রিল ২০০৬ থেকে মে ২০০৭ ॥ শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ৩৩২

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর [সা] সমাজ বিপ্লব

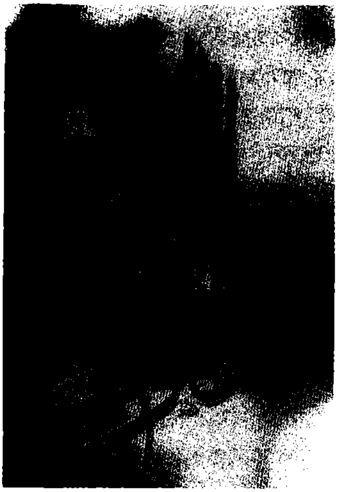

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] যখন জন্ম নিলেন, তখন শুধু মক্কা কেন, গোটা আরবের আকাশ ছিল অটকারে নিমজ্জিত। তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনসহ জীবনের একটি বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়েছে এই দু:সহ পরিবেশে। কিন্তু রাব্বুল আলামীনের একান্ত অনুগ্রহ ও মর্জিতে নবী মুহাম্মাদ [সা] সকলপ্রকার পাপ-পংকিলতা এবং অনাচার থেকে নিজেকে সযতনে দূরত্বে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই জাহিলিয়াতের মধ্যেও তিনি নিজেকে এতটাই পরিচ্ছন্ন রেখেছিলেন যে আপন পরিবার, গোত্র, সমাজ, দূর-সুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চারিত্রিক বিভা।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] নবুওয়তপ্রাপ্ত হলেন। ধারণ করলেন রাব্বুল আলামীনের বাণী। মহামহিম আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত করলেন রাসূলকে [সা]।

বস্তুত বিশ্বজাহানের কল্যাণের জন্যই রাসূলকে [সা] প্রেরণ করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাত– উভয় ক্ষেত্রেই রাসূলের [সা] উম্মতদের মুক্তির একমাত্র পথ– আল্লাহ এবং তাঁর হাবীবের [সা] বিশুদ্ধ অনুসরণ।

আজকের এই আধুনিকতার উৎকর্ষের মধ্যেও আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, আল্লাহর রাসূলের [সা] ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি যে বৈপ্লবিক কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেই অনুসৃত দিকগুলো আজকের আধুনিকতার চেয়েও অত্যাধুনিক ছিল। সোনালি সুদিন উপহার দিয়েছিলেন তিনি। স্বল্প, বলতে গেলে খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি পৃথিবীর বুকে এমন একটি কালজয়ী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন, এমন একটি বিশ্বায়নের রূপরেখা নির্মাণ করলেন যে সেই সময় পৃথিবীর অন্য আর কোথাও দ্বিতীয়টি তার নজির ছিল না। আজও নেই। রাসূল [সা] ছাড়া এমন আর কোনো দ্বিতীয় সফল রাষ্ট্রনায়ক নেই, যিনি সার্বিক বিচারে সকল ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রে সমান সফলতার দাবি করতে পারেন।

রাসূলের [সা] নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ এবং তাঁর মহান আদর্শ ও তত্ত্বাবধানে এমন একটি সাহাবী-কাফেলা গড়ে উঠলো– যারা ঈমান, আমল, আখলাক এবং সার্বিক যোগ্যতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। যে কারণে রাসূল-পরবর্তী সময়েও এই সত্যের মুজাহিদরা [রা] রাসূল-নির্দেশিত আল কুরআনের সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। বাহুবলের চেয়েও তাঁদের ছিল আদর্শ ও সত্য-ন্যায়ের তীব্র-তীক্ষ্ণ অস্ত্র। যার সম্মুখে অপরাপর কায়েমী শক্তিও মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল।

একথা ইতিহাস স্বীকৃত যে, রাসূল প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ ও কল্যাণ-রাষ্ট্র আজও পৃথিবীর বুকে মাইলফলক হয়ে আছে। তাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। হবেও না কখনো।

রাসূলের [সা] যে মহান আদর্শিক বিপ্লবের কারণে তৎকালীন একটি বর্বর ও অসভ্য সমাজ সোনায় পরিণত হয়েছিল, আজও যদি তার পূর্ণ অনুসরণ করা যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবেই আজকের দাবানলসম এই অশান্ত পৃথিবীর বুকে প্রশান্তির প্রবাহ বইয়ে দেয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

পৃথিবীকে আলোকময় ও অর্থবহ করে তোলার জন্য আজও প্রয়োজন রাসূলের [সা] অনুসরণ। প্রয়োজন আল কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করার। আল্লাহ্-মনোনীত এবং রাসূল-প্রতিষ্ঠিত সত্য, সুন্দর শাশ্বত দীনকে মানুষের সামনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুগোপযোগী করে তুলে ধরতে পারলে এবং মানুষের মন-মগজ থেকে বস্তুতান্ত্রিক ও জাগতিক দুর্ভার দূর করতে পারলে আজও সার্বিক সফলতা আসা সম্ভব এবং খুবই সম্ভব রাসূল-নির্দেশিত সেই আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

আজ এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনো সীমিত পরিসরে এবং নির্দিষ্ট কিছু দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবকে [সা] প্রেরণ করেননি। রাসূলকে [সা] প্রেরণ করা হয়েছিল বিশ্বজাহানের যাবতীয় কল্যাণের জন্য। সুতরাং তাঁর কাজ ও কর্তব্যের পরিধিও ছিল ব্যাপক-বিশাল। সসীম জীবনে তিনি অসীম ভূমিকা রেখেছিলেন।

রাসূলের [সা] উত্তরসূরি হিসাবে আমাদেরকে জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহকেই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহর [সা] কাঙ্ক্ষিত সেই আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ়।

যারা সমাজ-পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে ভাবেন, যারা শুদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোকধারায় সমাজকে আলোকিত ও উজ্জীবিত করতে চান– তাদের জন্য তো বটেই, সর্বোপরি সকল মুমিনের জন্যই একান্ত জরুরি মহান রব ও তাঁর রাসূলের [সা] নির্দেশিত পথকে অকুণ্ঠচিত্তে অনুসরণ করা। এর কোনো বিকল্প নেই, থাকতে পারে না।

আল্লাহপাক আমাদেরকে কবুল করুন। ■

www.pathagar.com

IBN SINA

Pioneer in Public Health
with
Genuine Love for Humanity

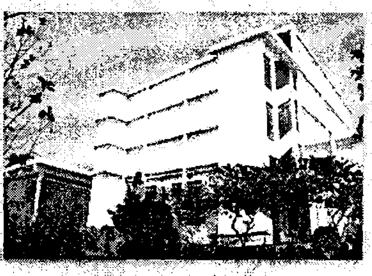

Quality Policy Of The Company

The IBN SINA Pharmaceutical Industry Ltd. is committed to serve the humanity by

- Providing the highest quality of products and services to its customers;
- Maintaining the ethical standard in all its functions and follow WHO-GMP right from procurement to reaching of finished goods and to the ultimate consumers;
- Marching onward for sustainable growth and continuous improvement.

ISO 9001 : 2000 Certification

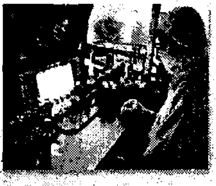

The IBN SINA Pharmaceutical Ind. Ltd. achieved the ISO 9001 : 2000 certificate in August 2004 for its quality management system for Product Development, Procurement, Production, Quality Assurance, Marketing, Sales and Distribution of pharmaceutical products.

Global Operations

Myanmar

Sri Lanka

Pakistan

Nepal

The history of IBN SINA Pharma dates back to 1983. After having significant success in the local market, IBN SINA started to export in neighboring countries. IBN SINA successfully exported its quality medicine in Myanmar and a good number of products are likely to be registered in Sri Lanka, Pakistan and Nepal. The Export journey is not confined within the subcontinent only, initiative has been taken to export its high quality products around the globe also.

IBN SINA

The **IBN SINA** Pharmaceutical Industry Ltd.

House # 41, Road # 10/A, Dhanmondi R/A, Dhaka 1209, Bangladesh.

ANAB

ISO 9001:2000 CERTIFIED

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] আবৃত্তিকৃত কবিতাংশ

"আল্লাহ্‌র নামে শুরু করি এই কাজ
যাঁর অসিলায় পেলাম পথের দিশা
করি যদি কেউ অন্যের ইবাদত
দুর্ভাগ্যের ভাগী হবো নিশ্চয়।
প্রভু আমাদের কত যে মহামহিম
আমাদের দীন কতো উত্তম দীন!"

[খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় নবীজী [সা.]
এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন।]

চার খলীফার [রা] কবিতা

হযরত আববুকর [রা] রচিত কবিতা

গুহার আঁধারে আমরা তখন
আমি শংকিত হইনি;
নবীজী আমাকে দিলেন আশ্বাস,
বললেন : ভয় নেই কিছুরই,
আল্লাহ্‌ আমাদের তৃতীয়জন।
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি
ঘোষণা দিলেন আমাকে, সকলকে–
তিনিই তো সাফল্যের যামিনদার।

www.pathagar.com

হযরত উমর [রা] প্রণীত কবিতার অংশ

বোন আমার করছিল পাঠ পবিত্র কালাম
তার উপর করেছি জুলুম।
মন আমার অনুতপ্ত। লজ্জিত আমি
আমার এই পদস্খলনে।
সে আরশের অধিপতি তার রবকে ডাকলো
কাকুতিভরে, বিশ্বাসে, অনুনয়ে
ডাগর আঁখি থেকে তার
ঝরল অশ্রু অবিরল ধারায়।
আমি প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত হলাম,
যে মহান সত্তাকে সে করছে আহ্বান
নিশ্চয় তিনি স্রষ্টা তাহার
মোতির মতো অশ্রুফোঁটায়
হল সে আমার অগ্রগামী।
বললাম আমি : সাক্ষ্য দিচ্ছি
আল্লাহ্ই আমাদের খালিক-মালিক
আর আহমদ [সা] আজ খ্যাতিমান নবী।
সত্যের নবী তিনি, সত্যসহ এসেছেন তিনি
পূর্ণ ভরসায়,
পরিপূর্ণভাবে করেছেন আদায় আমানত-ভার।
তাঁর পথে নেই কোনো জুলুম-শাসন।

www.pathagar.com

হযরত উসমান [রা] লিখিত কবিতা

আমি তো দেখেছি মৃত্যু কাউকে রেহাই দ্যায় না
না কেনো ক্ষমতাবানকে, না অন্য কাউকে।
আজ জাতির জন্যও নগরসমূহে কোনো ঠাঁই রইলো না
না থাকলো তাদের কোনো চারণভূমি।
দুর্গবাসীরা
তাদের কপাট রুদ্ধ করে রাত্রি যাপন করুক
কিন্তু মরণ তো পর্বতচূড়ায় মুহূর্তের মধ্যেই
হাজির হয়ে যায়।

হযরত আলী [রা]-র কবিতা :

ও ফাতিমা
নাও এই তরবারি,
যা কখনো কলংকিত হয়নি।
আমিও নই ভীরু-কাপুরুষ।
নই নীচ।
প্রাণধারণের শপথ,
বহু ব্যবহারের চিহ্ন আছে এ অস্ত্রে
যা নবী আহমদ [সা]-এর পক্ষে ঝলকিত হতো
আর উত্তোলিত হতো আমার প্রভুর
তৃপ্তি বিধানে,
বান্দার সবকিছু সম্পর্কে যিনি জ্ঞাত।

www.pathagar.com

তিন সাহাবী [রা] কবির কবিতাংশ

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা [রা]-র কবিতা

আমাদের আছেন আল্লাহর রসূল;
রাতের আঁধার চিরে যখন
উদিত হয় ঊষা
তখনও তিনি আল্লাহর কিতাব করেন তিলাওয়াত।
রাত কাটে তাঁর
শয্যা থেকে শরীর আলাদা ক'রে,
আল্লাহর হুযুরে মিনতি করে–
মুশরিকদের যখন আরো ভারী হ'য়ে আসে ঘুম।
আঁধারের পর নিয়ে এলেন তিনি
হিদায়াতের আলো।
আমাদের হৃদয় তাঁর প্রতি বিশ্বাসে উজ্জ্বল।
যা তিনি বলেন,
অবশ্য ঘটবে তা একদিন।

কা'ব ইবনে যুহায়র [রা] রচিত কবিতা :

শুনেছি,
আল্লাহ্‌র রসূল আমাকে
দিয়েছেন হত্যার নির্দেশ
আর
আল্লাহর রসূলের কাছে
আমার আশা তো ক্ষমার!
রসূল তো আল্লাহ্‌র নূর
উৎস তিনি জ্যোতিধারার
আর তিনি
আল্লাহ্‌র পথের দীপ্ত মুক্ত তলোয়ার!

www.pathagar.com

হাস্‌সান ইবনে সাবিত [রা]-এর কবিতাংশ

আমি কসম খেয়ে বলছি, দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে
একমাত্র আমিই এমন ব্যক্তি
যে রসূলুল্লাহর [সা.] কাছে চিরঋণী এবং এ কথা মোটেই মিথ্যা নয়।
আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ্‌র [সা.] মতো মানুষ কোনো নারী আজ পর্যন্ত
প্রসব করেনি।
যিনি সমগ্র মানবজাতির নবী ও দিশারী।
যে নবী আমাদের আলোকবর্তিকাস্বরূপ ছিলেন,
যাঁর সব কাজই ছিলো বরকতে পরিপূর্ণ, ন্যায়পূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক।
তাঁর চেয়ে অধিক প্রতিবেশীর হক-আদায়কারী এবং ওয়াদা-পালনকারী
আল্লাহ্‌ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতে সৃষ্টিই করেননি।
আপনার মহিষীগণ ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে প'ড়ে আছেন।
ফলে (বাইরে না যাওয়ার কারণে) তাঁরা পিঠের ওপর পিন দিয়ে
ওড়না জড়ান না।
তাঁরা সন্ন্যাসিনীদের মতো অপ্রতুল পোশাক পরেন।
কেননা বাহ্যত মনে হয়, তাঁদের সচ্ছলতা চলে গিয়ে
দারিদ্র্যের দিন শুরু হয়েছে।
হে শ্রেষ্ঠ মানব, আমি ঝর্ণার মধ্যে ছিলাম।
কিন্তু এখন আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি।

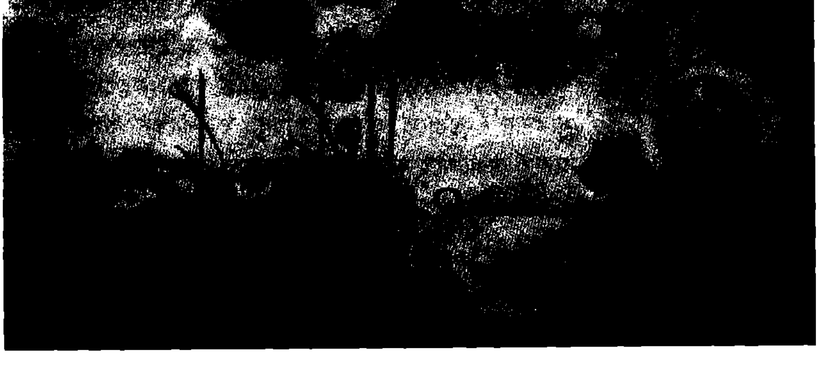

www.pathagar.com

ইসলামের সাধনা

এয়াকুব আলী চৌধুরী

■

বাঙ্গালী মুসলমান আজ সভ্যতার দরবারে হেঁট মাথায় দাঁড়াইয়া আছে। বল তাহার "সম্মোহিত", চক্ষু তাহার কোটরাগত, দৃষ্টি তাহার সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া উদার আকাশে পৌঁছিতেছে না। বাঙ্গালায় কোন শক্তিমান মুসলমানের জন্ম হইতেছে না, বাঙ্গালী মুসলমান বিশ্বে কোন বাণী পাঠাইতে না পারিয়া মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছে; এই লজ্জা সত্য হইলেও ইসলামের ইহাতে অগৌরবের কথা নাই। সত্য মুসলেমের পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ও প্রয়োজন আছে; ইসলামের বাণী তাহাকে বিশ্ব-সভ্যতার দরবারে আনন্দের ও গৌরবের সঙ্গে বহন করিতে হইবে।

আর্য-সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল তপোবন। তাহা মানুষের জাগতিক উন্নতির জন্য লালায়িত হয় নাই। তাহা চাহিয়াছে ও সাধনা করিয়াছে শুধু আত্মার মুক্তি ও দেহাতীত অবিনশ্বর আনন্দের, যে আনন্দের কখনও বিনাশ হইবে না, দেহের ক্ষুৎ-পিপাসা ও অর্থের চাকচিক্য যাহাকে কখনও মলিন করিতে পারিবে না। আর্য ঋষি শ্যাম সমতলে কুটীর বাঁধিয়াছেন, বনানীর অন্তরালে আপনাকে গোপন করিয়াছেন। দেহকে কৃশ করিয়াছেন এবং সংসারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও ভোগ-সাধনার অন্তরালে বসিয়া সাধনা করিয়াছেন শুধু। তাহার আদর্শ রাজা নহে ঋষি। সন্ন্যাস তাহার সাধনা, শাকান্ন ভোজনে তাহার তৃপ্তি, অর্ধহস্ত বস্ত্র-খণ্ডে তাহার লজ্জা নিবারণ হয়। তাহার গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ভোগ ও সংগ্রামে জর্জ্জরিত পাশ্চাত্য জগতে এই ত্যাগের মন্ত্র ও শান্তির বার্তাই বহন করিতেছেন। শারীরিক ভোগ সুখকে অতিক্রম করিয়া আত্মার অবিনশ্বর আনন্দ লাভের বার্তাই তাহার বিবেকানন্দ বীরকণ্ঠে ঘোষণা

www.pathagar.com

করিয়াছেন। ভারত এখন পর্যন্ত এই তপোবনের সভ্যতারই দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া আছে।

যীশুখৃস্ট তপোবনের ধর্ম প্রচার করিলেও খৃস্টান-জগত তাহা সাধনা করিতে আদৌ প্রস্তুত হয় নাই। খৃস্টান-জগত যে পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা আত্মার আনন্দ ও পরকালের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয় নাই, তাহার গতি সম্পূর্ণ বিপরীত পথেই ছুটিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা চাহিতেছে এই জগতের সুখ এবং এই দেহের তৃপ্তি, বর্তমান জীবনের আনন্দ; পার্থিব জীবনের সমস্ত সুখ সম্পদ ও আনন্দ নিঃশেষে পান করাই তাহার সাধনা। তাহার বিজ্ঞান তপোবন ভাঙ্গিয়া উপবনের সৃষ্টি করিয়াছে, পল্লী কাটিয়া নগর গড়িয়াছে, কুটীরমালাকে সে প্রতিদিন হর্ম্যমালায় পরিণত করিতেছে। তাহারা সাগর-ভূধর মরু-প্রান্তর গগন-পবন ও আকাশ-পাতাল তন্ন তন্ন করিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া জড় প্রকৃতির অণু-পরমাণু হইতে দৈহিক সুরা নিংড়াইয়া পান করিতেছে। মানুষের এই বর্তমান জীবনকে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া তোলাই তাহার সাধনা। পাশ্চাত্য জগত পারলৌকিক সুখ-চিন্তার মত প্রাচ্য জগতের নিকটে ঐহিক সুখ-সম্পদের বার্তাই প্রতি মুহূর্তে বহন করিয়া আনিতেছে; চীন, জাপান, মিসর, তুরস্ক, ভারত, আফগান প্রতি মুহূর্তে সেই বাণীর বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন তাহার উত্তাপে প্রাচ্যের সাধনার সৌধ ভাঙ্গিতেছে, তাহার রং-চেহারা বদল হইতেছে, তাহার চিন্তা ও লক্ষ্য ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে। প্রাচ্য জগতে প্রতি মুহূর্তে ধর্মের বিধি-নিষেধের বন্ধন খসিয়া পড়িতেছে, চিরকালের সংস্কার চূর্ণ হইতেছে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সমাজ-গঠনে ও রাষ্ট্র-নিয়মে সকল পথে প্রাচ্য দেশবাসী পরলোকের চিন্তা ভুলিয়া ঐহিক জীবনের উন্নতির সাধনার পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে চলিয়াছে।

এই আত্মমুখী সভ্যতা ও দেহমুখী সভ্যতা ইহার কোনটাই সম্পূর্ণ নহে। ইহার একটি অন্যদিকে গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিয়া পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করিতেছে। তপোবনের ভারতে, অহিংসার চীন-জাপানেও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও সাধনা চলিতেছে। পক্ষান্তরে ঐহিক ভোগ-সুখ-জর্জরিত পাশ্চাত্য জগৎ লালসার লাস্যলীলায় বিতৃষ্ণ হইয়া গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের শান্তি ও মুক্তির বাণী পরম সমাদরে গ্রহণ করিতেছে।

এই উভয়মুখী সাধনার মাঝখানে দাঁড়াইয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনসূত্র রচনা করিতেছে ইসলাম। ইসলাম সীমার মধ্যে অসীমের সুর বাজাইয়াছে, অসীমকে সীমার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইসলাম এই পার্থিব জীবনের সুখসম্পদ ও অন্তহীন কর্ম-সাধনাকে অবহেলা করে নাই, অথচ বর্তমানের এই মোহ, সম্ভোগের এই সুখ, সুখের এই সুরা, ইহাই মাত্র কণ্ঠ ভরিয়া পান করিয়া ইহারই মধ্যে ডুবিয়া মিশিয়া মুছিয়া যায় নাই। ইসলামের মহানবী আরব-মরুর গিরিশিরে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছেন, বিশ্বের অনন্ত প্রসারিত কর্মক্ষেত্র সুখে-দুঃখে চঞ্চল, মহিমায় উজ্জ্বল, অশ্রুতে সজল; ইহাকেই তিনি সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।■

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

দুনিয়াতে মানুষের উপস্থিতির পর থেকেই তাকে একদিকে যেমন এ বিশ্বের নানাবিধ সম্পদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, তেমনি প্রকৃতির নানাবিধ বিষয়ের সঙ্গে সংগ্রামও করতে হয়েছে। আব [পানি], আতশ্ [অগ্নি], খাক্ [মৃত্তিকা], বাদ [বায়ু] প্রভৃতি উপাদান ব্যতীত মানুষ মুহূর্তও এ দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারে না। আবার এ উপদানগুলো সংহারকের রূপ নিয়ে মানবকুলকে নানাভাবে ধ্বংস করতেও উদ্যত হয়। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়েই মানুষের তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজন হয়। আদি মানব জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই মানুষের মনে এ বিশ্বের উৎপত্তির মূলসূত্রের অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধিৎসার ফলেই মানব জীবনে দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মানুষ জানতে চেয়েছে কোথা থেকে এলো এবং কোথায়ই বা তাকে যেতে হবে? তবে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দুনিয়ায় যতগুলো ধর্ম দেখা দিয়েছে, তাতে যেমন আদি কারণের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে, তেমনি সে কারণকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে জীবনে রূপায়িত করার জন্য নানাবিধ আচরণও মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

দর্শনে আদি মানব স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই কর্তব্য বলে গণ্য হয়েছে। তাকে সাধনালব্ধ বিষয়ে রূপায়ণের কোন চেষ্টা দেখা দেয়নি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ পূর্বোক্ত বিষয়গুলোকে একদিকে যেমন জীবনের নানাবিধ চাহিদার সন্তোষ বিধানের জন্য ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছে, তেমনি সেগুলোর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপাদানগুলোর মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ নীতি আবিষ্কার করে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে। পানি, অগ্নি, মৃত্তিকা, বায়ু ব্যতীত মানব-জীবন অচল হয়ে পড়ে। আবার পানি, অগ্নি প্রভৃতি বন্যা, আগ্নুৎপাত ভূমিকম্প ও ঝঞ্ঝারূপে মানুষের সর্বনাশ করে। এগুলোকে এ ধ্বংসের ব্যাপার থেকে প্রতিহত করা থেকে তাদের মূলে যে কারণ বর্তমান সেগুলো আবিষ্কার করার জন্য সুদূর অতীত থেকে মানুষের প্রতিনিধি মনীষীগণ চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল অস্পষ্ট। খৃষ্টপূর্ব ৬২৪ সালে গ্রীস দেশীয় মনীষী মেলিস জগতের আদি সত্ত্বাকে পানি রূপে ধারণা করেছেন। তাঁর পরবর্তী চিন্তানায়ক এ্যানাক্সিম্যান্ডার [Anaximander, খৃষ্টপূর্ব ৬১১-৫৪৫-৪৬] আদি সত্তাকে সীমাহীন স্থানপূরক জীবন্ত সত্তা বলে ধারণা করেছেন। তাঁর পরবর্তী মনীষী এ্যানাক্সিম্যান্ডার [Anaximander, খৃস্টপূর্ব ৫৮৮-৫২৪]। তাকে অস্পষ্ট বা সীমাহীনরূপে ধারণা করেননি; বরং বায়ু, বাষ্প বা কুয়াশারূপে ধারণা করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে সকল বস্তুতেই বায়ু বর্তমান। সুতরাং বায়ুই এ জগতের আদি সত্তা। এভাবে আদি সত্তা সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে নানা মনীষী নানা মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতবাদের সারাংশ পাওয়া যায় প্লেটোর কালজয়ী দর্শনে। তিনি এগুলোকে একত্রিত করে সে সত্তার মধ্যে কতকগুলো ধারণা বা idea-র অস্তিত্বের সমাবেশ আবিষ্কার করেছেন। সেগুলোতে যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তাঁর শিষ্য এরিস্টোটল তাঁর মনীষার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার সাধনায় তাতে নানা বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। তিনি এ জগতে চারটি কারণকে উপস্থাপিত করে বলেছেন– ১. তারা হচ্ছে জড় কারণ যার দ্বারা বস্তু তৈরি হয়; ২. আকারগত কারণ যাকে বস্তুতে রূপায়িত করা হয়; ৩. যে শক্তি বা চালিকাশক্তি দ্বারা সে বস্তু তৈরি হয়; ৪. সর্বশেষ কারণ যার দরুন যে বিষয়টা তৈরি এ তত্ত্ব প্রকাশ করেছে। তিনি ভাষ্কর্যের মধ্যে সে চারটি কারণ রূপায়িত হলেই মূর্তিটি সাধিত হয় বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[১] প্লেটো দ্বারা আবিস্কৃত এবং এ্যারিস্টোটলের দ্বারা সংশোধিত ও সামঞ্জস্যশীল এ মতবাদে কারণের যে রূপ প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে তাঁদের গুরু-শিষ্যের মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁদের চিন্তাধারার কারণে যে রূপ পাওয়া যায়,– তা তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সমাধানে সক্ষম হলেও সে মানব জীবনকে প্রাকৃতিক নানা কঠিন সংকট থেকে রক্ষা করতে পারে না। সে কারণের পক্ষে আবিষ্কার সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় [Invariable] শর্তাধীন [Inconditional] ও অতিশয় নিকটবর্তী [immediate] কোন কারণে আবিষ্কারের প্রয়োজন। সে কারণের আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সে

www.pathagar.com

কারণের আবিষ্কার সম্বন্ধে কুরআন-উল-করীমে তাকীদ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে–তোমরা কি গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য কর না? তোমরা কি জলীয় যানের গতিবিধি লক্ষ্য কর না? এসব বাণী মানুষকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের সক্রিয় করে তুলে তাদের কারণ আবিষ্কারের জন্য তাকীদ দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেই সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দ্বারা তাঁর সৃষ্টিকে আরও উন্নত আরও সুন্দর করার জন্য তাকীদ করেছেন। প্রকৃতির নানা জাতীয় প্রাণী ও বিষয়বস্তু যাতে তাদের উপর কোনমতেই প্রাধান্য লাভ করতে না পারে– এজন্য তাদের হিকমত বা দার্শনিক জ্ঞান দান করেছেন। এ হিকমত শব্দের মধ্যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়বিধ জ্ঞান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, যারা এ জ্ঞান লাভ করেছে তারা অপর মানুষ থেকে উন্নত। এ জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষকে নানাবিধ বিষয়ের আদি কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তাদের কারণ আবিষ্কারের জন্য তাকীদ করেছেন।

মহানবীর [সা] উম্মতদের দ্বারা যখন স্পেন বিজিত হয় এবং কর্ডোভায় তারা যখন একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তখন তাতে বিজ্ঞানের সকল বিষয় খুব ভালোভাবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। তাতে বিভিন্ন বিষয়ের কারণ আবিষ্কারের জন্য আল-কুরআনের ও আল্লাহর রাসূলের আদেশকে পালন করার জন্য তাকীদ দেয়া হত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন ইংল্যান্ডবাসী রজার বেকন। তিনি কুরআন-উল-করীম প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলো ইংল্যান্ডে নিয়ে যান এবং তার নিকট থেকেই দর্শনে বহুল পরিচিত অভিজ্ঞতাবাদের জনক ফ্রান্সিস বেকন [১৫৬১-১৬২৬] তা আয়ত্ত করেন। এতে দেখা যায় আল-কুরআন থেকেই কারণ আবিষ্কারের নীতিও দুনিয়ায় প্রচলিত হয়েছে।

হযরত রাসূল-ই-আকরাম [সা] তাঁর পবিত্র জীবনে এ নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছেন। যখন তাঁর একমাত্র পুত্র কাসেমের ইন্তেকাল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্যগ্রহণ হয়, তখন কোন কোন সাহাবী এ দু'টো ঘটনার আকস্মিক সংযোগে অভিভূত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, রাসূলের পুত্রের মৃত্যুর জন্যই এ গ্রহণ হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল ভর্ৎসনার সুরে বলেছিলেন যে, তাঁর ছেলের মৃত্যুর জন্য এ গ্রহণ হয়নি, তা স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে। আল্লাহর রাসূল [সা] কতকগুলো রোগের ঔষধ নিজেই বলে দিয়েছিলেন। সে ঔষধগুলো তিব্ব-ই-নববীতে রয়েছে। এখনো সূফী-ই-কেরামের মধ্যে তার ব্যবহার রয়েছে। রাসূল [সা] জিহাদের সময় হযরত রুফেদা নাম্নী এক মহিলা সাহাবীকে পরিচর্যার জন্য নিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল কর্তৃক নার্সিং প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার বহু পূর্বেই হযরত রুফেদাকে আহত মুজাহিদের পরিচর্যায় গরম তেল ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিতেন। যে সকল মুজাহিদদের হাত বা পা বা শরীরের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, সঙ্গে সঙ্গে গরম তেল ব্যবহারের ফলে সেগুলো থেকে রক্ত বন্ধ হয়ে যেত। তাঁর প্রবর্তিত স্বাস্থ্যনীতির মধ্যে পরীক্ষণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত আরববাসীর দ্বারা

www.pathagar.com

রসায়নবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কারণ তারা তাদের পূর্ববর্তী গ্রীকদের চেয়ে অনেক বেশী পরীক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। বার্ট্রান্ড রাসেল মন্তব্য করেছেন, আরব দেশীয় লোকেরা গ্রীকদের চেয়ে বেশী পরীক্ষণশীল ছিল। তাদের আশা ছিল, তারা সাধারণ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করতে সমর্থ হবে। কিমিয়া সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য তাদেরকে সবাই সহানুভূতির চোখে দেখতেন। সমগ্র অন্ধকার যুগে প্রধানত আরবরাই সভ্যতার ঐতিহ্য চালু রেখেছিল এবং সামগ্রিকভাবে আরবদের নিকট থেকেই রজার বেকনের মতো খৃস্টানরা মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী হতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে আরবরা ছিল গ্রীকদের বিপরীতধর্মী। তারা ছোটখাট বিচ্ছিন্ন সত্যকে খুঁজতে ছিলেন ব্যস্ত। সাধারণ নীতির [আবিষ্কারের] দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না এবং যে সত্য আবিষ্কার করতেন তাকে যুক্তির মাধ্যমে সাধারণ নীতিতে উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন না। এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সমগ্র মধ্যযুগে আরবদের দ্বারা বিজ্ঞানের চর্চা ছিল গতিশীল। আরবদের দ্বারা বিজ্ঞানের এ চর্চার মূলে ছিল হযরত রাসূল-ই-আকরামের শিক্ষা এবং তা ছিল কুরআনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

কুরআন-উল-করীমের সঙ্গে রাসূলের [সা] সম্পর্ক ছিল নিকটতম। তাঁর ইন্তেকালের পরে একজন সাহাবী আম্মা আয়েশা সিদ্দীকা [রা]-এর কাছে এসে বললেন, আম্মা! আপনি রাসূল [সা] সম্বন্ধে আমাদের বর্ণনা করুন যাতে তাঁকে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি। হযরত আয়েশা বললেন– তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? আল্লাহর রাসূল [সা]-এর জীবনটাই ছিল বাস্তব কুরআন। কুরআন থেকে নির্দেশ পেয়েই আল্লাহর রাসূল [সা] মধ্যযুগে এ দুনিয়ায় বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য মানবজাতিকে আদেশ করেছেন। তাঁরই আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্যযুগের আরবরা বিজ্ঞানের চর্চায় যে আত্মনিবেশ করে, তার ফলেই এ যুগের মানুষ তাতে এতদূর অগ্রসর হয়েছে। আফসোসের বিষয়, তারা কারণের আবিষ্কার করে সে কারণের আবিষ্কারের মূলে যে মহামানবের প্রেরণা ছিল, তাঁকে ভুলে যেতে বসেছে। ■

তথ্যসূত্র

1. A History of Phylosophy-Traux Thelly Revised by Ledger Wood-Professor of Philosophy Princetin University-Central Book Depart. Allahad-pp-23-25-80-83-107
2. Bertrand Russell-Seientific Out book-pp-21-22.

www.pathagar.com

আল্লাহ্
ব্যবসাকে হালাল করেছেন
আর সুদকে করেছেন হারাম
সূরা বাক্বারাহ্ : ২৭৫

বাংলাদেশে প্রথম শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী জীবন বীমা
ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- বিদগ্ধ উলামা-এ-কেরাম সমন্বয়ে শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠিত
- সুদমুক্ত হালাল বীমা ব্যবস্থা
- লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত
- পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব
- সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ
- পারস্পরিক সংহতি ও সহযোগিতা

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত

প্রধান কার্যালয়ঃ টি.কে ভবন (১৪তলা), ১৩, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ পিএবিএক্স- ৮১৫০১২৭-৩১ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮১৩০৬১১

সমাজ সংস্কারে ও সমাজ গঠনে
শেষ নবী [সা]-এর আদর্শ

আবু নকীব

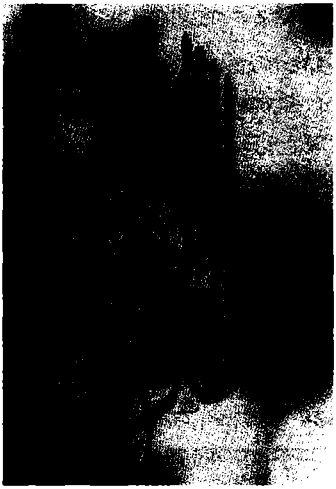

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ [সা] রহ্মাতুল লিল আলামীন হিসেবে সকল মানুষের নেতা। সকল মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনসহ্ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের শান্তি নিরাপত্তা ও ইনসাফ নিশ্চিত করার জন্য তিনিই একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর নেতৃত্বেই সেই অন্ধকার যুগের পাপ পংকিলতায় নিমজ্জিত, পশুত্ব ও পাশবিকতাকবলিত কলুষিত সমাজ পরিবর্তিত হয়েছিল, বরং পরিণত হয়েছিল সর্বযুগের, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব সমাজে। তাই তো মহান আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।"

জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে মানুষের যে সমাজে ছিল মানবতা ও মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত, যে সমাজে নারী সমাজকে মনে করা হত অভিশাপ, যে সমাজে দ্বন্দ্ব-কহল ছিল মানুষের নিত্যকার সাথী, যে সমাজের মানুষ ছিল অশান্তি অনাচার দুরাচার আর পাপাচারে নিমজ্জিত, যে সমাজে দুর্বলের ওপর সবলের জুলুম-অত্যাচার ছিল বলতে গেলে ভাগ্যের লিখনের মত অপ্রতিরোধ্য; সেই সমাজ রাসূলের নেতৃত্বে খোদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট পেল সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব সমাজ হিসেবে, দুনিয়ার সকল মানুষের অনুসরণীয় একটি আদর্শ ও মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে। আল্লাহ্ তায়ালা

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মদ [সা]-এর হাতেগড়া উম্মতকে একদিকে "খায়রা উম্মাহ" হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। তোমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা মানব জাতিকে সৎ পথে পরিচালনা করবে আর অসৎ পথে চলা থেকে বিরত রাখবে এবং ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি।" একইভাবে আবার ঘোষণা করেছেন মধ্যপন্থী এবং সব মানুষের অনুসরণীয় জাতি বা উম্মাহ হিসেবে। তিনি বলেন, "এভাবে তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে গড়া হয়েছে, যাতে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য তোমরা সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে ভূমিকা রাখতে পার এবং রাসূল হল তোমাদের জন্য সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা।"

আল্লাহ তায়ালার এহেন ঘোষণা কেবলই কথার কথা নয়, নয় কোন তত্ত্বকথাও। এটি বাস্তব সত্য এবং আজো প্রযোজ্য। এটা প্রযোজ্য থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। শর্ত একটিই। আর তা হল আমরা যারা মুসলমান নামে পরিচিত, তাদের জীবন জিন্দেগীর সকল দিক ও বিভাগে রাসূল [সা]-কেই মানতে হবে আদর্শ হিসেবে, কাণ্ডারী হিসেবে, বাস্তব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে। আজকের মানব সমাজের দুর্দশা-দুর্গতি সম্পর্কে যাদের মনে ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয়, যারা ব্যথাকাতর হৃদয় নিয়ে মানব সমাজে অর্থবহ সংশোধন, সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তাদেরকে মুহাম্মদ [সা]-কেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

মানব সমাজের বর্তমান দুরবস্থা, দুর্দশা ও দুর্গতি দূর করে একটি ন্যায় ইনসাফ ও শান্তি সুখের সমাজ গঠন করতে হলে বা করার লক্ষ্যে আমরা শেষ নবী মুহাম্মদ [সা]-কে কিভাবে অনুসরণ করতে পারি তা উপলব্ধি করতে হলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাঁর জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। মুহাম্মদ [সা] ওহী প্রাপ্তির পূর্বেই সমাজসেবা ও সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। অথচ তখন তিনি ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আর ওহী প্রাপ্তির পর তিনি চতুর্মুখী বিরোধিতা ও বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। কেন? কিভাবে? এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে পারলেই আজকের প্রেক্ষাপটে, মানবজাতির চরম সন্ধিক্ষণে আমরা সত্যিকারের পথের দিশা অর্জনে সক্ষম হতে পারি।

আমরা একটু আগে ইংগিত দিয়েছি ওহী প্রাপ্তির পূর্বে প্রায় ২৩ বছর যাবত মুহাম্মদ [সা] মানবতা মনুষ্যত্বের দুর্দশা দুর্গতি লাঘবের জন্য হিলফুল ফজুল নামক সংগঠনে শরীক হয়ে কাজ করেছেন। তখন তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল আমীন আসসাদেক হিসেবে সকলের কাছে প্রিয়ভাজন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও ঐ প্রচেষ্টায়, মানবতা মনুষ্যত্বের দুর্দশা-দুর্গতি দূর হয়নি। কিন্তু ওহী প্রাপ্তির পর থেকে মক্কায় তেরো বছর ধাপে ধাপে বাধা প্রতিবন্ধকতা চরম আকার ধারণ করেছে, তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কটের জীবনযাপন করতে হয়েছে। তাঁর সাথীদের এক পর্যায়ে হাবশায় হিজরত করতে হয়েছে। তিনি মক্কাবাসী থেকে হতাশ হয়ে তায়েফে গিয়েছেন।

www.pathagar.com

সেখানেও তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে চরম বাধা, প্রতিবন্ধকতার এবং মর্মান্তিক জুলুম-নির্যাতনের। অবশেষে প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করে তিনি মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানে গিয়েও এই বাধা প্রতিবন্ধকতার শেষ হয়নি। মক্কার কাফের মুশরিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া অসংখ্য যুদ্ধের মুকাবিলা করতে হয়েছে প্রিয় নবী মুহাম্মদ [সা]-কে। এরপরও তিনি জয়ী হয়েছেন, ন্যায় ইনসাফের রোল মডেল সর্বোত্তম মানব সমাজ বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা এবং সেই আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বিশ্ব জাহানের মালিক ও রব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পথনির্দেশ। মানুষের সমাজে সৃষ্ট বা বিরাজিত সমস্যাসমূহের কারণ ও এর প্রতিকারের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী তিনিই যিনি মানব জাতিসহ গোটা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, মালিক ও এর পালনকর্তা। তাঁর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে শেষ নবী মুহাম্মদ [সা] যে দিকনির্দেশনা পেয়েছেন তার ভিত্তিতেই তিনি ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে তাঁর সংস্কার সংশোধন ও সমাজ গঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁর গৃহীত কার্যক্রম ও কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর কার্যকর ভূমিকা দেখতে পাই মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও সংগতিপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে।

এক. মানব সমাজের সমস্যাসমূহকে তিনি একচোখাভাবে প্রান্তিক দৃষ্টিতে অবলোকন করেননি, ভারসাম্যহীন একদেশদর্শী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর গৃহীত সকল পদক্ষেপ ছিল সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের ভিত্তিতে তিনি মানব জাতির অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সমস্যাসমূহের মূল কারণ চিহ্নিত করেই তিনি এর প্রতিকার ও প্রতিবিধান পেশ করেছেন, তাও সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনার মাধ্যমেই।

দুই. তৌহিদ ও আখেরাতের ব্যাপারে মানবজাতির উদাসীনতাকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের সমাজে বিপর্যয় ও সংকট সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই বিপর্যয় ও সংকট থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতির জন্য তৌহিদের শিক্ষা সঠিকভাবে ধারণ করে গোটা জীবন পরিচালনার অংগীকার বা ঈমানকেই একমাত্র প্রতিকার ও প্রতিবিধান হিসেবে পেশ করেছেন। তৌহিদভিত্তিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে– চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বিশ্বাসেরই নাম হল ঈমান বিল আখেরাত। মানুষের সমাজে যুগে যুগে যে বিপর্যয় ও সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল কারণ এই তৌহিদ ও আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন, গাফেল এবং বেপরোয়া হওয়া। আজকের দিনে গোটাবিশ্বে প্রায় সর্বত্রই মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কাও সৃষ্টি হয়েছে এই একই কারণে। তাই আগামী দিনের পৃথিবীকে এই মহা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে মানবতা ও মনুষ্যত্বের ওপর থেকে পশুত্ব ও পাশবিকতার দৌরাত্ম্য ও রাজত্ব খতম করতে হলে মহানবী [সা]-এর আদর্শকে

www.pathagar.com

সমুন্নত করতেই হবে। মানব জাতির শান্তি কল্যাণ নিরাপত্তা ও ইনসাফের জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে সময়সাপেক্ষ এবং দীর্ঘ পথ চলার দাবি রাখে। তাই বলে অধৈর্য্য হয়ে রাতারাতি সাফল্যের জন্য আঁকা-বাঁকা কোন সংক্ষিপ্ত পথে চলার অবকাশ নেই। এমন চিন্তা সাফল্যকে করে তুলবে সুদূরপরাহত। মুহাম্মদ [সা] নবী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তারপরও তাঁকে এই মহান দায়িত্ব পালনে দীর্ঘ ২৩ বছর সময় নিতে হয়েছে। সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। তাই সত্যিকারের সাফল্য চাইলে দীর্ঘ পথ চলতে প্রস্তুত হবার বা থাকবার কোন বিকল্প নেই।

তিন. আমরা লক্ষ্য করি শেষনবী মুহাম্মদ [সা] উপরোল্লিখিত তৌহিদ ও আখেরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের মনে মগজে ও চরিত্রে একটি বিপ্লবী পরিবর্তন আনার চেষ্টা সাধনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সংখ্যা শক্তির বিচারে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও আল্লাহর নির্দেশে তাঁর রাসূলের প্রচেষ্টায় একদল ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের মানুষ তৈরি হয়েছে সেই চরম অধঃপতিত সমাজে। পরবর্তীতে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের ভিত রচনায় এই ব্যতিক্রমধর্মী নীতি-নৈতিকতার অধিকারী ব্যক্তিরাই রেখেছেন মুখ্য ভূমিকা। একযোগে একবারে সব মানুষকে ভাল মানুষে পরিণত করার বিষয়টি অসম্ভব ও অবাস্তব। সমাজ পরিবর্তনে নিউক্লিয়াসের ভূমিকা রাখার উপযোগী একদল লোক তৈরিই বাস্তবসম্মত। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী অনেক সময় বিরাট বাহিনীর ওপর বিজয় লাভে সক্ষম হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে" ইতিহাসের এটি বাস্তব সাক্ষী। আর এমনটি হয়েছে ক্ষুদ্র দলটির গুণগত মানগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই। রাসূল [সা]-এর মক্কী জিন্দেগীর তেরোটি বছরের কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ দাঁড়ায় এরূপ : তাঁর দাওয়াতী তৎপরতা ও এর বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে মক্কা নগরীতে প্রায় সব গোত্রের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলামকে জীবনের আদর্শ হিসেবে এবং আল্লাহর রাসূলকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে শুধু তাই নয়, ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তির সকল বাধা প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলায় নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রতিকূলে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিপক্ষের অপপ্রচার তাঁর দাওয়াতের পথে যেমন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি আরব জাহানের সর্বত্র আল্লাহর রাসূলকে পরিচিত হবার সুযোগও করে দিয়েছে। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে মদিনার আনসার গোত্র হয় পরম সৌভাগ্যের অধিকারী। তিন পর্যায়ে সাক্ষাৎ ও বাইয়াতের মাধ্যমে তাঁরা শেষ নবীকে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অত্যন্ত সজ্ঞানে এবং সচেতনভাবে। মদিনায় তাঁরা নবীকে শুধু আশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়, তাঁর নেতৃত্বে আল কুরআনের আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কঠিন সংকল্প সহকারে। কুরাইশদের নেতৃত্বে গোটা আরব বিশ্বের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে চাপিয়ে দেওয়া অসংখ্য যুদ্ধ, তদানিন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তির পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ, মদিনার ভেতর থেকে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র কোন কিছুই আর বাধ সাধতে পারেনি তাঁর বিজয়ের পথে। এই বিজয়কে সুসংহত করার জন্য তিনি কোন প্রান্তিক চিন্তার যেমন আশ্রয় নেননি তেমনি কোন একদেশদর্শিতাকেও প্রশ্রয় দেননি। রাতারাতি ম্যাজিকের মতো কোন সাফল্য প্রদর্শনেরও চেষ্টা করেননি। তিনি আল্লাহর নির্দেশে ইসলামের মৌলিক দাওয়াত পেশ করার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনায় মৌলিক পরিবর্তন আনার আপোষহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

এই চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে একদল সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরি করেছেন এবং মদিনার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়ক একটি নগররাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে কাজে লাগিয়ে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে আল কুরআনের নির্দেশনার ভিত্তিতে মানুষের শান্তি-কল্যাণ ও নিরাপত্তা এবং ইনসাফের নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়াস পেয়েছেন। যা আজো অনুসরণযোগ্য।

প্রকাশিত হলো!

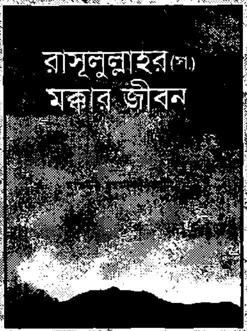

রাসূলুল্লাহর (সা.)
মক্কার জীবন
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি, দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতার মুখে দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ অব্যাহত রাখার কৌশলসহ রাসূলের (সা.) মক্কী জীবনের বৈচিত্রময় ঘটনার বর্ণনা দিয়ে **মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর** সাপ্তহিক সোনার বাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত **'রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কার জীবন'** শীর্ষক লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশিত হলো।

দাম ঃ ১০০.০০ টাকা

আপনার কপির জন্য
নিকটস্থ লাইব্রেরীগুলোতে যোগাযোগ করুন

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদের [সা] আদর্শ

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

ইসলামী জীবনে মিথ্যার স্থান নেই। সত্যিকার মুসলিম কোন দিন কোন কারণে মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা জীবনকে করে কলুষিত, মনুষ্যত্বকে করে অবনমিত। বিশ্বের যত পাপ, সবই মিথ্যা থেকে উদ্ভূত।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন : 'মিথ্যাবাদীর দোয়া কবুল হয় না। মিথ্যাবাদী জান্নাতে যাবে না। জীবন থেকে ঘৃণিত ও গর্হিত মিথ্যা দূর করতে পারলে সকল পাপ থেকেই বেঁচে থাকা যায়।'

একবার রাসূলুল্লাহর কাছে এক বেদুঈন এসে বললো, আমি চুরি ও যিনা করি এবং মিথ্যাও বলি। আমি একটি দোষ ছাড়তে চাই, কোনটি ছাড়বো? তিনি বললেন : মিথ্যা। সে ব্যক্তি মিথ্যা ছাড়ায় আর চুরি বা যিনা কোনটাই করতে পারেনি। এভাবে মানুষকে তিনি ক্রমান্বয়ে সংশোধনের পথে নিয়েছেন।

তিনি কেমন চরিত্রের মহামানব ছিলেন দেখুন। তিনি বলেন : লা ঈমানা লিমান লা আমানাতা লাহূ, ওয়া লা দীনা লিমান লা আহাদা লাহূ- যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে না [তা খিয়ানত করে] তার ঈমান নেই, আর যে ওয়াদা রক্ষা করে না তার কোন ধর্ম নেই।

www.pathagar.com

অত্যন্ত কঠোরভাবে এসব পালন করে তবে তিনি উম্মতের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কথা দিয়ে কথা না রাখাই তো আমাদের এখন 'ফরজ' [?] হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের পরিচিতি কি তা আজকের মুসলিম-অমুসলিম শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন মুসলিম রাষ্ট্র কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে পারে না। অথচ ইরাক ইরান আক্রমণ করে বসলো। চললো সাত বছর ধরে দুই পরে মুসলিম নিধন এবং মুসলিমের সম্পদ বিনাশ। এমন কী ইরাক কুয়েত দখল করলো। নির্যাতন চললো। এক মুসলিম দেশ অন্য মুসলিম দেশ পদানত ও দখল করে নিজ দেশের আওতাভুক্ত করে নিল।

এদিকে অন্য মুসলিম দেশ অমুসলিমদের ডেকে এনে নিজ দেশে সিন্দাবাদ সওদাগরের দৈত্যটিকে ঘাড়ে চাপিয়ে নিল। তাদের সঙ্গে কেবল যে 'বিধর্ম' এলো তাই নয়, এলো মারাত্মক 'এইডস', এলো হাজার হাজার 'সেবিকা'। নগ্নবেহায়াপনার এক প্রতিযোগিতা চললো মধ্যপ্রাচ্যে, চললো অধর্মাচার পবিত্র ভূখণ্ডে।

মহানবী [সা]-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী ছিল, লক্ষ্য করুন। বদর যুদ্ধে এক মুশরিক তার বর্ম ও ঢাল মুহাম্মাদ [সা] কে দিতে চাইলো। মুহাম্মাদ [সা] বললেন : তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছ? সে বললো : না। তিনি বললেন : ফিরে যাও, আমরা কোন মুশরিকের সহায়তা গ্রহণ করি না।

আমরা এখন ইসলামের ঘোরতর দুশমনদের আপন বলে গ্রহণ করে নিয়েছি। রাসূলের দেশে রাসূলের জন্মভূমিতেই তাঁর আদর্শের বিরোধিতা চলছে। আমরা কীভাবে আল কুরআনকেও ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের ওপর নির্ভর করাকে আমরা দুর্বলতা মনে করি।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আল কুরআনের সূরা মায়িদার ৫১নং আয়াতে স্পষ্ট বলেছেন: 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ লা তাওয়াখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া বা'দুহুম আউলিআউ বা'দিন; ওয়া মাঁয়ইয়াতাওয়াল্লাহুম ফাইন্না মিনহুম। ইন্নাল্লাহা লাইয়াহদীল কাওমায্ যালিমীন'- হে মুমিনগণ, তোমরা গ্রহণ করো না ইয়াহুদ ও নাসারাদের বন্ধুরূপে, তারা পরস্পর বন্ধু পরস্পরের। আর যে তাদের গ্রহণ করবে বন্ধুরূপে, তোমাদের মধ্য থেকে, সেতো তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন না যালিম কওমকে।[১]

আপনি মুসলিম হয়ে আরেক মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছেন। আপনি কেমন মুসলিম? আপনি মুসলিম হয়ে দু'দিন আগেও আরেক মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে সহায়তা করেছেন। এ কেমন কথা? এখন আবার আপনার বিরুদ্ধে আপনারই গতকালের বন্ধু অস্ত্রধারণ করায় আপনারা সমবেতভাবে ইয়াহুদ ও নাসারাদের ডেকে এনে নিজের ঘরে বসিয়েছেন। আপনাদের উভয় দলের কাছে মুসলিম বিশ্বের প্রশ্ন : আপনারা কি কুরআন পড়েন না, অথবা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনী জানেন

৩—

www.pathagar.com

না? নাকি কুরআন ও হাদিসের অর্থ– আপনাদের কাছে অন্যবিধ। অর্থাৎ আল-কুরআনের বাণী ও হাদীসের কথা এ সবের প্রভাব ফিকে হয়ে এসেছে! এগুলোর ওপর তেমন ভরসা করতে পারছেন না!

তবে স্মরণ করুন, ৫৭০ ঈসায়ী সালে, 'আমুল ফীল'-এ নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর জন্মের পঞ্চাশ দিন আগে মহরম মাসে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা। আবরাহা কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তেরটি হাতিসহ ষাট হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। আবরাহার বিরাট বাহিনী 'মুযদালফা' থেকে 'মিনার' দিকে 'মুহাসসীর' নামক স্থানে পৌছে। এদিকে কোরাইশগণ বিচলিত হয়ে নানাভাবে আবরাহাকে ফিরাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আবরাহা কিছুতেই নিরস্ত্র হলো না।

অগত্যা কা'বাঘরের মুতাওয়াল্লী কুরাইশ দলপতি আবদুল মুত্তালিব ও অপর কয়েকজন কুরাইশ সরদারকে নিয়ে কাবাঘরের দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে ধর্না দিলেন যেন আল্লাহই তাঁর ঘর হিফাযত করেন। তাঁরা তখন কাবাঘরে রতি ৩৬০টি মূর্তির কাছে ধর্না দেননি। একমাত্র আল্লাহর কাছ প্রার্থনা করেন : ইয়া আল্লাহ, আমরা দুর্বল মানুষ। আবরাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সেনাবাহিনী আমাদের নেই। তোমার ঘরের মর্যাদা তুমিই রা করো।

আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত তাদের দোয়া কবুল করেছিলেন। 'মুহাসসীরে' আসতেই আবরাহার নিজের হাতি 'মাহসুদ' আর এগুতো চায় না। মারধর করলে বসে পড়ে। শত চেষ্টা করেও মক্কামুখী তাকে এগিয়ে নেয়া গেল না। সে সময় অলৌকিকভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র আবাবীল পাখি এসে ঠোঁটে ও পায়ে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর এনে আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর বৃষ্টির মত বর্ষণ করতে থাকে। যার ওপরই এ পাথর পড়ে তার গোশত খুলে যায়, শরীর পচে যায়, রক্ত পানির মত হয়ে যায়। এভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে আবরাহা ও তার সমগ্র বাহিনী চর্বিত ঘাসের ন্যায় 'ভর্তা ভর্তা' হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। আবরাহার নিজ রাজ্যে আর ফিরে যাওয়াও হলো না, কাবা শরীফও ধ্বংস করা হলো না।

এ ঘটনা যারা প্রত্য করেছিলেন তাঁরা এর বিশদ বিবরণ জানেন। প্রত্যক্ষদর্শী হাজার হাজার লোক, যখন ৪০-৪২ বছর পরে নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রতি সূরা ফীল নাযিল হয়, তখনো জীবিত ছিলেন এবং এ সূরায় বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ঘটনার অলৌকিকত্ব স্বীকার করেছেন।

এখন কি এর চাইতেও নাযুক অবস্থা? না, ঈমানের দৃঢ়তা এবং আমলে মুমিন-এর অভাব ঘটেছে। আক্ষেপ, আমরা মহানবীর উম্মত হয়েও তার কথায় ও আল্লাহর বাণীতে আস্থা রাখতে ও নির্ভর করতে পারছি না।

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের আগে আরব দেশে ছিল কতিপয় বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও বিচ্ছিন্ন জনপদ। কোন সুষ্ঠু সংগঠন ছিল না। প্রত্যেক গোত্র নিজের রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী শাসিত হত। গোত্রপতি সে গোত্রকে শাসন করতো। অনেক

www.pathagar.com

সময় ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা এত বেশি প্রবল হয়ে উঠতো যে, স্বৈরাচারী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। ফলে চারদিকে লুটতরাজ, হত্যা, মারামারি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নির্বিচারে দুর্বলের অধিকার হরণ ও যুলম চালানো ছিল সবলের উত্তরাধিকার।

দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে আরবের এসব অনৈক্য ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি নির্মূল হয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত এ বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সমাজকে সুসংবদ্ধ মানবতাবোধে উজ্জীবিত করা হয়। একটি মহৎ আদর্শিক ঐক্যই একটা বিশৃংখল যাযাবর 'অসভ্য' জাতিকে একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে সহায়ক হয়। আর এ কাজটি করেছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি– নবী মুহাম্মাদ [সা]। তারা তাঁর আদর্শের সাথে সাথে তাঁর শাসন ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপও তর্কাতীতরূপে মেনে নিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্ব তাদের সবার জীবনে এনে দিয়েছিল এক সোনার কাঠির পরশ।

বস্তুত মহানবী ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল খাতামুন নাবীয়ীন। আল্লাহর তাওহিদ ও তাঁর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। এর অর্থ হলো, এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে তোলা যেখানে আল্লাহর দলই হবে বুনিয়াদি আদর্শ আর আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ হবে আইনের উৎস। মহানবী [সা] তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরবের বুকে তেমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সাফল্য এখানেই।

মহানবী [সা]-এর জীবনেই যেমন আরবের সকল অঞ্চল এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় এসে গিয়েছিল, তেমনি আরবের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চল মহানবীর [সা] আনুগত্য স্বীকার করে মদিনা রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। যেসব অঞ্চল মদিনা রাষ্ট্রের আওতাধীন হয়েছিল সেগুলোকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

যুদ্ধ জয়ের ফলে যেসব অঞ্চল মদিনা রাষ্ট্রের আওতাধীন হয়েছিল, সেসব অঞ্চলে মহানবী নিজের পক্ষ থেকে শাসক নিয়োজিত করেছিলেন।

সন্ধির ফলে যে সকল এলাকা রাসূলের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং যে সকল এলাকায় জাহিলী যুগের রাজতন্ত্র ও স্থানীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, মহানবী [সা] সে সকল রাষ্ট্রের রাজা বা আমীরকে পদচ্যুত না করে তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রেখেছিলেন; কেননা, সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য রাজ্য দখল করা মহানবী [সা]-এর নীতি বিরোধী ছিল।

অন্যের হাত থেকে মতা কেড়ে নিয়ে নিজে মতার অধিকারী হওয়া তাঁর আদর্শের পরিপন্থী ছিল। তাঁর রাজ্য জয়ের প্রধান ল্য ছিল মানুষের দাসত্বের প্রভাব বিলুপ্ত করে মানবতার প্রভাব কায়েম করা। তাই যেসব এলাকার রাজা বা শাসক ইসলাম মেনে নিয়েছে, আদর্শের অনুসারী হয়েছে, তাদের রাজ্য শাসনের ভার তাদের হাতেই রেখে দেন। এমনকি সে সকল প্রশাসক দীন ইসলাম কবুল না করলেও ইসলামী বিধান

www.pathagar.com

অনুযায়ী জিযয়া দিতে রাজী হলে তাদের হাতেই তাদের এলাকার শাসন ভার ছেড়ে দেন।

মহানবীর পররাষ্ট্রনীতিও ছিল সমালোচনার উর্ধ্বে। তিনি পার্শ্ববর্তী সকল দেশের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে নিজ দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা চালিয়ে যেতেন। আক্রমণ বা আগ্রাসন নয়, বন্ধুত্ব ও মিত্রতা তাঁর অন্যতম নীতি হিসেবে কাজ করেছে।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ল্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ এবং পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে সমস্ত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সবার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপে বিচার বিধান।

আধুনিককালের তথাকথিত 'সুসভ্য' ও 'সংস্কৃতিবান' জাতি নিজেদের মানবতার একমাত্র বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। অথচ এদের সবারই রাষ্ট্রীয় নীতি সংকীর্ণ জাতীয়তা ও ভৌগোলিক সীমাভিত্তিক। তাদের সেবা সকলের তরে নয়। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণেই তাদের যাবতীয় চেষ্টা পর্যবসিত। এরা অন্যের সাহায্যে এগিয়ে এলেও তা করে নিজ স্বার্থে। তারা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে দুর্বল ও পশ্চাদপদ জাতিতে নবতর দাসত্বের নিগড়ে বন্দি করার উদ্দেশ্যে সাহায্য করে, যাতে তারা প্রয়োজনের সময় তাদের হাতিয়ার রূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে, প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে।

মহানবীর [সা] উপস্থাপিত আদর্শ বা ইজম এ অর্থাৎ ইসলামে কোনরূপ প্রতারণা সুযোগ নেই। আদর্শ কোন দেশ বা জাতির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবার সুযোগ দেয় না। আর এক দেশের নগদ ঐশ্বর্য-বৈভব শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমি বা মহামূল্য খনিজসম্পদের প্রতি কারো লোভ থাকা অনুচিত। ইসলামের ল্য বিশ্বমানবের কল্যাণ এবং ইহকাল ও পরকালের নাজাতের জন্য হিদায়াত। কল্যাণ ও হিদায়াত এ দু'টো একে অন্যের পরিপূরক। কল্যাণ চাইলে হিদায়াত গ্রহণ অপরিহার্য আর হিদায়াত সর্বদা কল্যাণধর্মী। এককে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এটাই ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি।

ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। ভাষা বা অন্যকোন কারণে বা জাতীয়তার কারণে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টির সুযোগ এতে নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই অনারব ও আরব সমান। নিগ্রো কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী ও শ্বেতাঙ্গের সমান অধিকার। মানুষ হিসেবে তারা একই সমতলে। ইসলাম মূলত একটি আদর্শিক ও দীনি আন্দোলন।

এ নীতির কারণেই মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে আরব ও অনারব সমানভাবে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। তাঁদের আনুগত্য সকল নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য ছিল, যতণ তাঁরা সৎ ও আদর্শের অনুসারী থাকতেন। তাঁরা কোন পশ্চাদপদ বা অবহেলিত জাতি থেকে এলেও তাঁদের সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার করা হতো না।

মহানবী [সা] এ আদর্শের বাস্তবায়নে স্বয়ং সচেতন ছিলেন। হযরত সালমান ফারসী [রা] পারস্যদেশীয় হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী সমাজে তাঁর অবস্থান ছিল খুব উচ্চে। সুহায়ব রুমী

www.pathagar.com

ছিলেন একজন ক্রীতদাস। কিন্তু মহানবী [সা] কি যুদ্ধ, কি সন্ধি– সকল অবস্থায়ই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। হাবশী গোলাম হযরত বিলাল [রা] সম্পর্কেও এ কথা সত্য। ইসলামী রাষ্ট্রে তিনি যে কেবল মসজিদের মুয়াযযিনই ছিলেন তা নয়; নবী [সা] প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের তিনি ছিলেন কোষাধক্ষ্য। আধুনিক পরিভাষায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন তিনি।

এরূপ মহান ও আদর্শভিত্তিক মূলনীতির কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণেই নবী মুহাম্মাদ [সা] সকল দেশের সকল নেতার শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। মাইকেল হার্টস তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, নেতা ও মনীষীদের মধ্যে প্রথম বলে স্বীকার করেছেন। বার্নার্ডশ বলেছেন 'ইউনিক' বা অতুলনীয়। আর বার্টান্ড রাসেল তাঁকে সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠ 'রিফরমার' বা সমাজ-সংস্কারক অভিধায় বিভূষিত করেছেন।

আমাদের জীবনের যাবতীয় অবিশ্বাস ও নিপীড়নের অবসান সম্ভবপর একমাত্র রাসূলের [সা] আদর্শ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে তার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে তা আন্তরিকতার সঙ্গে সমাজে প্রয়োগ করে। বার্নার্ডশ বিশ্বাস করেন : নবী মুহাম্মাদ [সা] এর মত কোন ব্যক্তি বর্তমান বিশ্বের একনায়কত্ব পেলে বিশ্ব সমস্যা এমনিভাবে সমাধান করতে পারতেন, যার ফলে বিশ্বে সুখ ও শান্তি বিরাজ করতো।[২]

মহানবী মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন আদর্শ ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাতা এবং মিথ্যা ও দুর্নীতির উচ্ছেদকারী সমাজ-সংস্কারক। তিনি মানবতার প্রতিষ্ঠা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ, বিশ্বমানবতাভিত্তিক জাতি গঠন, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিষ্ঠা, সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা, শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, ঐশীতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব-সমাজ থেকে মিথ্যা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করেছেন। রাষ্ট্রনায়ক, শাসক, সমর নায়ক, বিচারকরূপে, অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাতা রূপে, মানুষে মানুষে সাম্যমৈত্রী বন্ধনে সচেষ্ট-সকল কর্তৃত্ব অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়করূপে অতীত ও বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন। সকল প্রকার অমানবীয় পাশবিক প্রবৃত্তি ও নীতির বিরোধী, অসত্য ও অন্যায়ের উচ্ছেদ সাধনে সার্থক ইহ-পরলৌকিক নেতৃত্বের আদর্শ মহামানব বিশ্বের একমাত্র মানবীয় আদর্শের ধারক ও বাহক। তাঁর মতাদর্শের আন্তরিক অনুসরণই বর্তমান সংকটময় সমাজের একমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়। এ মহাশিক্ষকের আদর্শই বিশ্বকে দিতে পারে মুক্তি।■

পাদটীকা :

১. সূরা মায়িদা ৫ আয়াত ৫১।

২. George Bernard Shaw, Getting married, London

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র রাসূলের [সা] কিছু অনন্য গুণ

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

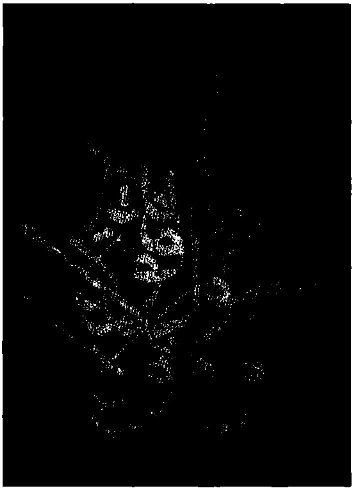

সাধারণ মানুষের জীবনে নানা রকমের দোষ ও গুণ দেখা যায়। কোন কোন মানুষের জীবনে গুণ থাকে কম, দোষ থাকে বেশি। ঠিক এর বিপরীতে কোন কোন মানুষের জীবনে গুণ থাকে বেশি, দোষ থাকে কম। কিন্তু দোষ শূন্যের কোঠায় এবং গুণ জীবনের সর্বাংশে এমন মানব সমাজে বিরল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী রাসূলগণ ছাড়া আর কারো জীবনে গুণের এমনি বিপুল সমাবেশ দেখা যায় না।

মুহাম্মাদ [সা] সর্বশেষ নবী। ঈসায়ী সপ্তম শতক থেকে শুরু করে পৃথিবীর অস্তিত্বের সর্বশেষ দিনটি পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর অঙ্গনে অনেক মানব প্রজন্মের আগমন ও নির্গমন ঘটেছে এবং ঘটবে। এদের সকলেরই জীবন গড়ার জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র [সা] জীবন।

একটি দু'টি করে গুণতে গেলে আল্লাহ্‌র রাসূলের [সা] শত শত গুণের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি তৈরি হবে স্বাভাবিকভাবেই। একটি মাত্র নিবন্ধে এসব গুণ নিয়ে আলোচনা করা একেবারেই অসম্ভব। তাঁর জীবনের অনন্য দু'চারটি দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই আমরা এই নিবন্ধের ইতি টানবো।

www.pathagar.com

মানুষের কল্যাণ কামনা

সকল ধরনের মানুষের কল্যাণ কামনা ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] একটি বিশিষ্ট গুণ। তিনি মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। মানুষের অকল্যাণ দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। কোন মানুষ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি উদাসীন থেকে নিজের জীবন বরবাদ করুক, তা তিনি চাইতেন না। তাই তিনি প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর পথে টেনে আনার জন্য বার বার তাদের কাছে যেতেন, তাদের সামনে আল্লাহর সঠিক পরিচয় তুলে ধরতেন এবং আল্লাহর পথে এগিয়ে আসার জন্য তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই 'নাসিহুল আমীন'।

দুঃস্থ মানবতার প্রতি দরদ

আল্লাহর রাসূল [সা] ছিলেন একজন মানব দরদী ব্যক্তিত্ব। সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত ও অসহায় মানুষের জন্য তাঁর অন্তর ছিলো সদা ব্যাকুল। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকল অভাবী মানুষের পাশে তাঁকে দেখা যেতো। তিনি বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তিনি তাদের বিপদমুক্ত করার চেষ্টা চালাতেন। অত্যাচারী মনিবের হাত থেকে মাযলুম ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের মুক্তির জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। ঋণভারে যাদের নাভিশ্বাস অবস্থা দেখা দিতো তাদের ঋণমুক্ত করার জন্য তিনি সাহায্যের হাত বাড়াতেন।

কারো অসুখের খবর পেলে তিনি তার কাছে হাজির হতেন, তাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছেন, কিন্তু সেই অর্থের সিংহভাগ তিনি পরার্থে বিলিয়ে দিয়েছেন। কোন অভাবী মানুষ হাত পেতে তাঁর নিকট থেকে খালি হাতে ফিরে যেতো না। অভুক্তকে আহার করিয়ে তিনি দারুণ তৃপ্তি পেতেন।

সকলের সাথে সদাচরণ

আল্লাহর রাসূল [সা] ছিলেন সদাচরণের বিমূর্ত রূপ। তিনি হাসিমাখা মুখে লোকদের সাথে আলাপ করতেন। তিনি গভীরভাবে তাঁর স্ত্রীদের ভালোবাসতেন। তাঁদের সাথে প্রাণ খুলে আলাপ করতেন, হাসিতামাশা করতেন। সন্তানদেরকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। যে কোন শিশুকে দেখলে তিনি আদর করতেন। চাকর-বাকরগণ নানাবিধ কাজে তাঁর সাহায্যকারী ছিলো বিধায় তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাতেন। কোনদিন তিনি কোন চাকরকে মারেননি, কোনদিন কাউকে বকেননি। কোন আত্মীয়-স্বজন তাঁর ব্যবহারে কখনো আঘাত পায়নি। পড়শীদের সাথে তিনি কখনো বিবাদ করেননি। একটি আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রতিনিয়ত তাঁকে অসংখ্য মানুষের সাথে ওঠাবসা ও আলাপ-আলোচনা করতে হতো। কিন্তু তিনি কোনদিন ধৈর্য হারাননি, বিরক্ত হয়ে কারো প্রতি রূঢ় আচরণ করেননি। তিনি যখন রাষ্ট্রপ্রধান হলেন তখন তাঁর ব্যস্ততা

www.pathagar.com

বেড়ে গেল শতগুণ। তখনো কিন্তু সেই শান্ত, ধৈর্যশীল ও সদালাপী মানুষটির মেজাজে কোন পরিবর্তন আসেনি। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি দল আসতো তাঁর কাছে, আসতো বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের দূতগণ। সকলেই তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হতো।

কথার অনুরূপ কাজ

আল্লাহর রাসূলের [সা] কথা ও কাজের মাঝে ছিলো অপূর্ব মিল। তিনি এমন কোন কথা বলতেন না যা নিজে করতেন না। তিনি লোকদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলতেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বোত্তম সালাত আদায়কারী। তিনি তো লোকদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথাই বলতেন, কিন্তু নিজে প্রতিদিন বহু রাকাআত অতিরিক্ত সালাত আদায় করতেন। সালাতুত্ তাহাজ্জুদে তিনি দীর্ঘ সূরা পড়তেন এবং বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন বলে তাঁর পা দু'টো ফুলে যেতো।

তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে রমাদানের ত্রিশটি রোযার নির্দেশ দিতেন। রমাদানের রোযা তো তিনি নিজে পালন করতেনই, তদুপরি এমন কোন সপ্তাহ যেতো না যে সপ্তাহে তিনি অতিরিক্ত রোযা রাখতেন না।

তিনি লোকদেরকে তাদের সম্পদের একটি অংশ আল্লাহর পথে দান করতে উৎসাহিত করতেন, কিন্তু নিজের সবকিছু দান করাতেই ছিলো তাঁর আনন্দ।

আবু যার গিফারী [রা] বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহর সাথে হাঁটছিলাম। পথে তিনি বললেন, 'ওহে আবু যার, উহুদ পাহাড়টি যদি আমার জন্য সোনায় পরিণত হত, তিন রাত পর তার একটি দিনার পরিমাণও আমার নিকট থাকুক তা আমি পছন্দ করবো না।'

তিনি লোকদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য বলতেন। তিনি বলতেন, 'আদম সন্তানের এই কয়েকটি বস্তু ছাড়া আর কিছুরই অধিকার নেই : বসবাসের জন্য একটি গৃহ, লজ্জা নিবারণের জন্য একটু কাপড় এবং ক্ষুধা মেটানোর জন্য শুকনো রুটি ও পানি।' একটি বিশাল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] বিশাল অট্টালিকার মালিক হতে পারতেন, পরতে পারতেন জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, আর খেতে পারতেন রকমারি সুস্বাদু ও মূল্যবান খাদ্য। কিন্তু বসবাসের জন্য একটি ছোট্ট ঘরকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় তিনি পছন্দ করতেন না। ভুরিভোজও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর ঘরে অনেক সময় কোন খাবারই থাকতো না।

মহানুভবতা

আল্লাহর রাসূলের [সা] ছিলো মহাকাশের মতো উদার এক হৃদয়। আর সেই জন্যই তিনি ছিলেন পরম ক্ষমাশীল। মাক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মুসলিমগণ হাবশায় ও ইয়াসরিবে হিজরাত করে যেতে বাধ্য হয়। শেষাবধি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে [সা] মাক্কা ছেড়ে ইয়াসরিবের পথ ধরতে হলো। তাঁকে ধরে দিতে পারলে একশ' উট ইনাম দেয়া হবে শুনে সুরাকাই ইবনু মালিক ঘোড়া ছুটিয়ে ইয়াসরিবের পথে এগুলো।

www.pathagar.com

দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সে আল্লাহর রাসূল [সা] ও তাঁর সফর সঙ্গী আবু বাকরের [রা] নিকটবর্তী হলো। আল্লাহর ইচ্ছায় তার ঘোড়ার পা তিন তিনবার মাটিতে পুঁতে গেলো। সে বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর রাসূলকে ধরে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহর রাসূল [সা] এই দুশমনকে ক্ষমা করে দিলেন।

উহুদ রণাংগনে রাসূলের [সা] চাচা হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব যুবাইর ইবনু মুতয়িমের ক্রীতদাস ওয়াহশীর বর্শার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত হামযা [রা] নিহত হওয়ায় আল্লাহর রাসূল [সা] খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন এবং এই হত্যার কঠোর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। মাক্কা বিজয়ের পর ওয়াহশী যখন অনুশোচনা প্রকাশ করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো, আল্লাহর রাসূল তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মাক্কার অন্যতম প্রবীণ সরদার উতবাহ ইবনু রাবীয়ার কন্যা এবং অন্যতম সরদার আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা চরম মুসলিমবিদ্বেষী ছিলো। একদল নারী নিয়ে সংগীত গেয়ে মুশরিক সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সে উহুদ রণাংগনে এসেছিলো। হামযার [রা] শাহাদাতের পর হিন্দা অন্যান্য নারীদের নিয়ে আনন্দ সংগীত গেয়েছিলো। শুধু তাই নয় পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠে সে হামযার [রা] নাক ও কান কেটে অলংকার বানিয়েছিলো। বুক চিরে হামযার [রা] কলিজা বের করে সে আক্রোশে চিবিয়েছিলো। মাক্কা বিজয়ের দিন হিন্দা গোপনে রাসূলের [সা] সান্নিধ্যে পৌঁছে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। আল্লাহর রাসূল [সা] তাকে ক্ষমা করে দেন।

আবু জাহলের সুযোগ্য পুত্র ছিলো ইকরিমা। পিতার মতোই সে ছিলো ইসলামের কট্টর দুশমন। তার নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে অনেক মুসলিম। মাক্কা বিজয়ের দিন অন্য কোন ফ্রন্ট থেকে মুসলিম বাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু যেই ফ্রন্টে ইকরিমা ছিলো সেইদিক থেকে মুসলিম বাহিনী বাধার সম্মুখীন হয়। অবশ্য শেষাবধি ইকরিমা পরাজিত হয়ে ইয়ামানের দিকে পালিয়ে যায়। এদিকে ইকরিমার স্ত্রী উম্মু হাকিম ইসলাম গ্রহণ করে। উম্মু হাকিম ইকরিমাকে ক্ষমা করে নিরাপত্তা দানের জন্য আল্লাহর রাসূলের [সা] নিকট প্রার্থনা জানায়। আল্লাহর রাসূল [সা] ইকরিমার জন্য আমান বা নিরাপত্তার ঘোষণা দেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর আল্লাহর রাসূল [সা] তেরটি বছর মাক্কায় অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে থাকেন। সত্য সন্ধানী লোকগুলো তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়। সত্যবিমুখ লোকগুলো শুরু করে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার। মুসলিমগণ নানাভাবে নিগৃহীত হন।

আল্লাহর রাসূলকে [সা] অনেক গালি দেয়া হয়েছে। তাঁর চরিত্র হননের লক্ষ্যে আজে বাজে কবিতা রচনা করে লোকদেরকে শুনানো হয়েছে। তাঁর মুখে ও মাথায় ধূলি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সালাতের সময় তাঁর পিঠে ঘাড়ে পশুর নাড়িভুঁড়ি তুলে দেয়া হয়েছে। তাঁর রান্নার পাতিলে নাড়িভুঁড়ি রাখা হয়েছে। রাতে তাঁর ঘরের দরজায় কাঁটা পুঁতে রাখা হয়েছে। ঘরের দরজায় আবর্জনা ফেলা হয়েছে। যখন তখন তাঁর ঘরের চালে ঢিল মারা

www.pathagar.com

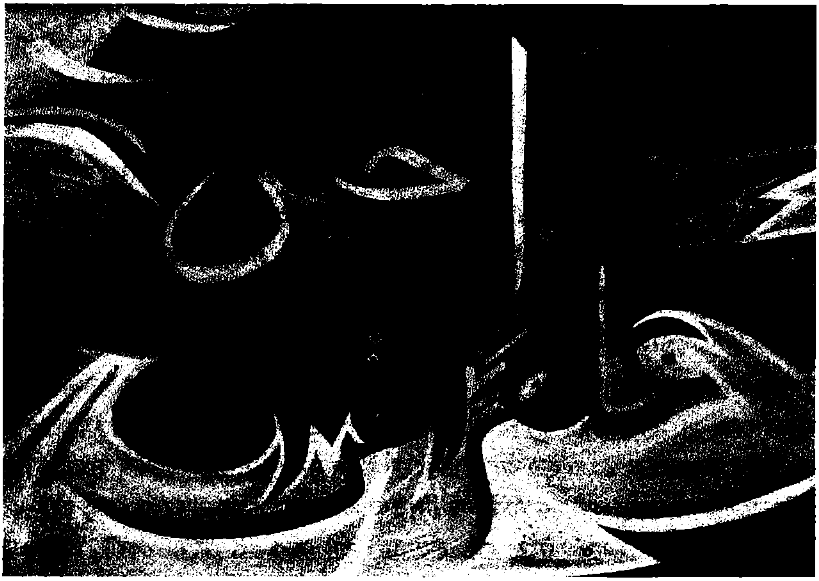

হয়েছে। তাঁর গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর জনসমাবেশে হামলা চালিয়ে তাঁকে আহত করা হয়েছে। তিন বছর একটি গিরিসংকটে আটক করে রেখে খাদ্য ও পানি সরবরাহ না করে কষ্ট দেয়া হয়েছে। তাঁর অনুগামীদেরকে বেদম প্রহার করা হয়েছে। মরুভূমির গরম বালুতে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁর মেয়েদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে। তাঁকে হত্যা করার জন্য বারো জন ঘাতক নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি ইয়াসরিবে চলে গেলে সেখানে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রণাংগনে তাঁর প্রিয় অনেক সাথীকে হত্যা করা হয়েছে। যারা এইসব কর্মকাণ্ডের হোতা তাদের অনেকেই মাক্কা বিজয়ের দিন কাবার চত্বরে জড়ো হয়েছিলো। গোটা মাক্কা নগরী মুসলিমদের পদানত। চারদিকে নাংগা তলোয়ার হাতে সত্যের সৈনিকরা দণ্ডায়মান। আল্লাহর রাসূলের [সা] নির্দেশ পেলে নিমেষে তারা যালিমদের গর্দান উড়িয়ে দেবে। সকলেই নির্দেশের প্রতীক্ষায়।

মহাবিজয়ীর কণ্ঠ থেকে গুরু গম্ভীরভাবে ঘোষিত হলো, 'লা তাস্‌রিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইযহাবু ফা আনতুমুত্‌ তুলাকাউ।' অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত।

মহানুভবতার এমন উদাহরণ আর কোথাও আছে কি?

আল্লাহর রাসূল [সা] ছিলেন মানব চরিত্রের পূর্ণত্বের প্রতীক। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে তাঁর উপস্থাপিত উদাহরণ অনন্য ও সবোত্তম। আর সেই জন্যই তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য উসওয়াতুন হাসানাহ।■

www.pathagar.com

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

মহানবী [সা] মদিনায় হিজরত করার পর মক্কার মুসলমানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মদিনায় হিজরত করতে লাগলেন। মদিনায় তখন প্রধান দু'টি গোত্র বনী আউস ও বনী খাজরাজ-এর বসবাস ছিল। কিন্তু দু'টি গোত্রের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে বিবাদ চলে আসছিল। আন্তকলহ ও অন্ত উভয় গোত্র অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উভয়ের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। ফলে মদিনায় তখন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলছিল।

মহানবী [সা] মাতৃকুলের দিক থেকে মদিনার খাজরাজ গোত্রের সাথে রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন। তাছাড়া, উভয় গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁরা সকলেই মহানবীকে [সা] নেতৃ পদে বরণ করে নেয়। ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে ও নবীর [সা] নেতৃত্বে ধীরে ধীরে তাদের পারস্পরিক অন্ত-কলহের নিষ্পত্তি ঘটে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মদিনায় বসবাসরত ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও তাদের আসমানী কিতাবে আখিরী নবীর আগমনবার্তা সম্পর্কে অবহিত থাকায় এবং মহানবী [সা] তাঁদের নবীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করায় ও তাঁদের নবীদেরকে তাঁর স্বীয় গোত্রভুক্ত ঘোষণা করায়

www.pathagar.com

তারাও প্রকাশ্যে মহানবীর [সা] বিরোধিতা করার কোন যুক্তি খুঁজে পায়নি। ফলে, অনুকূল পরিবেশে ইসলাম প্রচারের কাজ অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে।

তাই দেখা যায়, নবুওয়তের প্রাথমিক তের বছরে মক্কার বিরুদ্ধ পরিবেশে যেখানে মাত্র একশো পরিবারের শ'তিনেক লোক ইসলামে দাওয়াত কবুল করেছিল, মদিনার তুলনামূলক অনুকূল পরিবেশে সেখানে অত্যন্ত কালের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত সমগ্র আরব জগৎ এমন কি আরব ভূখণ্ডের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অটকাররাশি ক্রমান্বয়ে অপসৃত হয়ে বিশ্বে এক আলোকজ্জ্বল সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। তাই ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

মহানবীর [সা] হিজরতের পর মদিনা ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহানবী [সা]-কে সেখানে নবী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম তথাকথিত কোন ধর্ম নয়– এটা হলো একটি সামগ্রিক জীবন বিধান যা পরিচালিত হয় আল্লাহ-প্রদত্ত আইন এবং রাসূল-প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। ইসলামে মসজিদের স্থান বাস্তব জীবন থেকে স্বতন্ত্র নয়। যে মহানবী [সা] মসজিদে মুসলমানদের জামায়াতে ইমামতি করতেন তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসক, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান বিচারক। মদিনার মসজিদই ছিল তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র।

মূলত মসজিদ থেকেই মুসলমানগণ তাদের জীবনের সব শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে, কেননা তাদের জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি এবং একমাত্র উৎস হলো আল-কুরআন ও নবী-জীবনের আদর্শ। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ এ মূল ভিত্তি এবং উৎসের ব্যাপারে নির্গত এবং একনিষ্ঠ ছিল, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে ছিল তাদেরই একাধিপত্য। আর যখনই তারা এ মূল ভিত্তি এবং উৎস থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখনই পরাজয় এবং লাঞ্চনা-দুর্গতি হয়েছে তাদের অমোঘ ভাগ্যলিপি। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত যে, অমুসলমানদের উন্নতি যেকোন পথে সম্ভব। কেননা তাদের সাফল্য কেবল জাগতিক, পরকালে তাদের কেবলি লাঞ্চনা, কিন্তু মুসলমানদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা একমাত্র ইসলামের মাপকাঠিতে সুনির্দিষ্ট। তাছাড়া, মুসলমানদের জাগতিক এবং পারলৌকিক সাফল্য এক ও অবিভাজ্য। জাগতিক জীবন যার সফল, আখিরাতেও সে কামিয়াব আর দুনিয়ার জীবনে ব্যর্থতার অর্থ আখিরাতেও চরম জিল্লতি। তাই মুসলমানদের পুনর্জাগরণ বা বিজয় অন্য কোন আদর্শ বা জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমে নয়, একমাত্র ইসলাম এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। এ নির্ভুল, যুক্তিপূর্ণ, ঐতিহাসিক বাস্তবতা মুসলমানগণ যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করে ততই তাদের জন্য মঙ্গল।

মদিনায় এসে মহানবী [সা] ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে যেসব পদপেক্ষ গ্রহণ করলেন তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

www.pathagar.com

এক. ইসলামের ভিত্তিতে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক জীবন পরিশুদ্ধিকরণ ও পরিগঠন।

দুই. তৎকালীন মদিনায় বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও সকল পরে সম্মতিক্রমে তিনি চুক্তি সারের ব্যবস্থা করেন, যা সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং এটা ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় শান্তি শৃংখলা স্থাপনে এক অনুসরণীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এ চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা মদিনাবাসীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মুসলিম-অমুসলিম বিরোধের অবসান ঘটে এবং মদিনাবাসীদের নিরাপত্তা, বিশেষত বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুকাবিলায় সকলে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

তিন. দেশে-বিদেশে সর্বত্র আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়। মক্কার বিরুদ্ধ-পরিবেশে নবুওয়তের দায়িত্ব পালনে যেসব কঠিন বাধা ছিল, মদিনার অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশে তা বহুলাংশে বিদূরিত হয়। ফলে দীন প্রচারের কাজ তিনি এখানে পূর্ণদ্যমে চালাতে থাকেন। মদিনা

চার. রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল ভিত্তি প্রশাসন, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে মহানবী [সা] ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে এক সর্বোত্তম ও সমগ্র মানবজাতির জন্যে এক অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করেন।

এছাড়া, জীবন ও সমাজের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তিনি যেসব সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিগঠনের কাজ করেন, মানবজাতির সামনে সেসবই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। ফলে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তিনি যেসব শিক্ষা বা নীতি-আদর্শ প্রচার করেছেন, মানব জাতির জন্য তা যে সর্বোত্তম, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইসলামের ভিত্তিতে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক জীবন পরিগঠন ও পরিশুদ্ধিকরণের কাজ ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মহানবীর [সা] ব্যক্তিগত জীবনের কাজ এবং আচরণই ছিল এক্ষেত্রেও মুসলমানদের জন্য একমাত্র এবং সর্বোত্তম অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি একাধারে স্বামী, পিতা, মনিব, প্রতিবেশী, সমাজপতি, বিচারক, সমর-নায়ক, ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সবার সামনে যে জীবন্ত ও নিখুঁত মানবীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন সাহাবাদের জন্য সেটাই ছিল সর্বাধিক ও একমাত্র অনুপ্রেরণার বিষয়। সমগ্র মানবজাতির জন্যেও সেটাই সর্বোত্তম আদর্শ। তাই দেখা যায়, সাহাবায়ে কিরাম নবী-জীবনের আদর্শ অনুসরণ করে মানবীয় গুণাবলী, সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও শৌর্য-বীর্যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে এটা এক অনন্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

www.pathagar.com

আধুনিক যেকোন সমাজে একাধিক ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির বসবাস একান্ত স্বাভাবিক। ইসলাম যদিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কিন্তু খাস করে মুসলমানদের জন্য এর অনুসরণ অত্যাবশ্যক। সমাজে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্ধারণও তেমনি জরুরি।

মহানবী [সা] মদিনায় এসে সেখানে বসবাসকারী সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে এক সম্মিলিত, ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র কায়েম করলেন। অথচ তাঁর আগমনের অব্যহিত পূর্বে এখানকার অধিবাসীগণ বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকতো। মদিনার আদি অধিবাসীদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। পরবর্তীতে ফিলিস্তিন থেকে বিভিন্ন সময় ব্যাবিলনীয়, গ্রীস ও রোমক শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে ইহুদিগণ মদিনা ও তার আশেপাশে খাইবার, ফাদাক প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করে। ইহুদিগণ প্রধানত বনী নাদির, বনী কুরাইজা ও বনী কাইনুকা এ তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। এক সময় তারা মদিনার আদিবাসীদের তুলনায় সংখ্যায় অধিক হয়ে পড়ে এবং মদিনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু তাদের এ আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে ইয়েমেন থেকে আউস ও খাজরাজ নামে দু'টি গোত্র এসে মদিনায় বসতি স্থাপন করে। তদানীন্তন অন্যান্য আরবদের মতো তারাও ছিল পৌত্তলিক। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ইহুদিদের নিকট থেকে তারা মতা ও আধিপত্য ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু কালক্রমে ইহুদিদের তিন গোত্র এবং আউস ও খাজরাজ এদের সকলের মধ্যেই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়ে যায়। এমনি এক চরম সংকটময় মুহূর্তে মহানবী [সা] মদিনায় হিজরত করে তাদের সকলকে নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন। এটা ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ' [Charter of Madina] নামে পরিচিত। এ সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে উদ্ধৃত হলো :

১. পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহম্মদ [সা]-এর তরফ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মক্কা ও মদিনার মুসলমান সমাজ ও তাঁদের সাথে সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত।

২. শান্তি ও যুদ্ধের সকল অবস্থায় সকল মুসলমানের সাধারণ স্বার্থ এক ও অভিন্ন। তাঁদের মধ্য থেকে কোন লোকই পৃথকভাবে তাদের নিজ ধর্মের শত্রুর বিরুদ্ধে কোন সটি অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

৩. আমাদের রাষ্ট্র-কাঠামোয় যোগদানকারী অমুসলমানদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা হবে। আমাদের লোকদের মত তাদের প্রতিও আমাদের সাহায্য-সদিচ্ছা সমানভাবে বিতরিত হবে।

www.pathagar.com

৪. অমুসলমানগণ মুসলমানদের সাথে এক জাতীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং মুসলমানদের মতোই তারা স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে।

৫. অমুসলমানগণ সমাজের সহযোগী ও মিত্ররাও তাদের মতো সমান নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা ভোগ করবে।

৬. অপরাধী, অন্যায়কারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হবে। একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও কোন অপরাধীর ব্যাপারে সুপারিশ বা তাকে সমর্থন করা যাবে না।

৭. অপরাধীকে অবশ্যই পাকড়াও করতে হবে এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. অমুসলিম ও মুসলিম সমাজের মিত্রদেরকে সহায়তাকারী হিসেবে সম্মান করতে হবে।

৯. মদিনার নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ইহুদী সমাজ সকল শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবে।

১০. এ সনদের অংশীদার সকলেই মদিনাকে পবিত্রতা করবে।

১১. মুসলমানদের মিত্র হিসেবে স্বীকৃত অমুসলমানরা মুসলমানদের কোন শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না।

১২. এ সনদ গ্রহণকারী সকল পকে তাদের যেকোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তা আল্লাহর রাসূলের নিকট হাজির করতে হবে।

মদিনা সনদের সুফল

এ ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনের ফলে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘ মেয়াদী বহুবিধ তাৎপর্যপূর্ণ সুফল অর্জিত হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

এক. এ চুক্তির মাধ্যমে মহানবী [সা]-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে দলমত নির্বিশেষে মদিনার সকলেই মেনে নিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়। ফলে অমুসলমানরাও বিচার-সালিস ও নিরাপত্তার জন্য তাঁর নিকট হাজির হতো এবং সর্ববিষয়ে তাঁর অতুলনীয় পবিত্র, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হতো। ফলে তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে সকলেই আল্লাহর দীনের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে।

দুই. প্রত্যেক সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ চুক্তির দ্বারা মদিনার সকল শ্রেণীর নাগরিকদের সম্মতি ও সহযোগিতা নিয়ে সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সুনিশ্চিত করা হয়। এছাড়া, অন্যায় ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, সে যে কোন ধর্ম, বংশ বা গোত্রেরই হোক না কেন, মূলত সে সমাজ-শত্রু, কঠোর হাতে তার শাস্তি বিধানের মাধ্যমেই সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। নাগরিক দায়িত্ববোধ ও সামাজিক ন্যায়ানুগ অনুশাসন প্রতিষ্ঠার এটাই হলো মূল ভিত্তি।

www.pathagar.com

তিন. ইসলামী সমাজে অমুসলমানগণ মুসলমানদের পবিত্র আমানত। তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করার সকল দায়িত্ব মুসলমানদের দীনী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, তাদের ধর্মীয় কাজ-কর্মেরও পূর্ণ স্বাধীনতা ইসলামে স্বীকৃত। ফলে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেই তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গ্যারান্টি বিদ্যমান।

চার. মক্কার বিধর্মীদের জুলুম-অত্যাচার দুর্বিষহ হবার কারণে এবং চরম বিরুদ্ধ-পরিবেশে আল্লাহর দীন প্রচারের কাজ বিঘ্নিত হয়ে পড়ায় মহানবী [সা] আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। এখানে নির্বিঘ্নে দীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা অত্যাবশ্যক ছিল। এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে সে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় এবং মহানবী [সা] নির্বিঘ্নে তাঁর আসল দায়িত্ব অর্থাৎ দীন প্রচারের কাজ স্থানীয় এবং দূর-দূরান্ত সর্বত্র পূর্ণোদ্যমে চালাবার সুযোগ পান।

পাঁচ. মহানবী [সা] মক্কা ত্যাগ করে এলেও তিনি জানতেন, মক্কার বিধর্মীগণ এখানেও হামলা করতে পারে এবং মদিনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার বিধর্মীদের সাহায্য-সহযোগিতায় মুসলমানদের নির্মূল করার চেষ্টা করতে পারে। তাঁর এ আশঙ্কা অত্যন্ত কালের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়। মক্কার বিধর্মীরা মুসলমান নিধনে মদিনার বিধর্মীদের সহযোগিতা চাইলে এ চুক্তির কারণে তারা প্রকাশ্যে সে সহযোগিতা দিতে অস্বীকার করলো। তবে গোপনে তারা কিছু কিছু সহযোগিতা প্রদান করলেও প্রকাশ্যে ব্যাপক সহযোগিত প্রদানে তারা বিরত থাকে। ফলে বাস্তবে তা অতটা মারাত্মক প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া, চুক্তি অনুযায়ী শত্রুর হামলার মুকাবিলায় মদিনা রক্ষার দায়িত্ব মুসলমান-অমুসলমান সকলের ওপর সমভাবে অর্পিত ছিল। সুতরাং যে কোন বহি:শত্রুর মুকাবিলায় মদিনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে মদিনার অমুসলমানরাও নৈতিকভাবে বাধ্য ছিল। তারা সর্বাংশে এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না এলেও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, অন্তত প্রকাশ্যে শত্রুকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থেকেছে। এটাও মুসলমানদের জন্য ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা।

তাই দেখা যায়, মদিনা-সনদ মহানবীর [সা] রাজনৈতিক পন্থা ও দূরদর্শিতার এক অতুলনীয়, অনন্য উদাহরণ। এ সনদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, মানব-ইতিহাসে এটাই হলো সর্বপ্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে শাসকের আগমন-নির্গমন ঘটেছে, অনেক দিগ্বিজয়ী সমর-নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু মহানবীর [সা] পূর্বে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কেউ কোন লিখিত দলিল প্রণয়ন করেননি। তাই এ সনদকে ইতিহাসের প্রথম ম্যাগ্‌নাকাটা রূপে আখ্যায়িত করা যায়। এতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুয়ের সমান নাগরিক অধিকারের সর্বজনীন নীতি ঘোষিত হয়েছে। ধর্মানুশীলন, পরমতসহিষ্ণুতা ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা এতে স্বীকৃত হয়েছে। মহানবী [সা]-ই সর্বপ্রথম এটা উপলব্ধি করলেন যে, রাষ্ট্র-পরিচালনায় জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সদিচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদান একান্তই আবশ্যক। তাই এটাকে নি:সন্দেহে ইসলামী গণতন্ত্রের এক প্রকৃত, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এটা

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, পন্থা ও মহামানবিকতার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ঐতিহাসিক মুরের ভাষায় : "It reveals the Man in his real greatness a master mind, not only of his own age, but of all ages."

মদিনায় দুই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পর মহানবী [সা] একদিকে যেমন ইসলামের ভিত্তিতে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ ও পরিগঠনে মনোযোগী হলেন, অন্যদিকে মদিনা-সনদ সম্পাদন করে মুসলিম-অমুসলিম তথা ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে মদিনার সকল নাগরিক নিয়ে একটি শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র-কাঠামো বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসল দায়িত্ব নবুওয়তের কাজ বা আল্লাহর দীন প্রচারের কাজেও সর্বোতোভাবে সচেষ্ট হলেন। বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশে পরিকল্পিতভাবে সুশিক্ষিত প্রচারক দল প্রেরণ করতে লাগলেন। মক্কার চরম প্রতিকূল পরিবেশে দীন প্রচারের কাজ তেমন অগ্রসর হতে পারেনি, মদিনার অনুকূল পরিবেশে প্রচারাভিযান দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলো। ইসলামের সুমহান আদর্শ ও মহানবীর [সা] সমুন্নত চরিত্র ও অনন্য ব্যক্তিত্বের কথা শুনেও দূর এবং নিকটের বহু লোক তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে উপনীত হতে লাগলো।

অবশ্য ইসলামের পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ধীরে ধীরে সেখানেও অনেক বাধা ও সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। মদিনার ইহুদিরা ইসলামের দ্রুত প্রসারে ক্রমাগত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং গোপনে নানা শত্রতা শুরু করে। কিন্তু মক্কার পরিবেশ থেকে মদিনার পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মক্কায় স্বদেশের প্রবল প্রতিপক্ষীয়দের মুকাবিলায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন, আত্মরক্ষায় অপ্রতুল মতার অধিকারী। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে তিনি প্রতিরক্ষার আয়োজন বা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সক্ষম।

মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন মহানবী [সা] স্বয়ং। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মদিনার রক্ষা-ব্যূহ নির্মাণে, অভিনব রণ-কৌশল অবলম্বনে, সৈন্য পরিচালনা, সমর-কৌশল বিনির্মাণে ও যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁর অপূর্ব পারদর্শিতা এবং নৈপুণ্য ছিল অতিশয় বিস্ময়কর। এছাড়া যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শত্রুর সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হবে মহানবী [সা] তারও এক আদর্শ নীতিমালা তৈরি করে গেছেন, যা সর্বকালীন মানুষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য।

মহানবী [সা] মদিনায় বসবাসকালে মোট সাতাইশটি যুদ্ধ পরিচালনা এবং ষাটটি সমরাভিযানের আয়োজন করেন। সাধারণত বিধর্মীদের সরাসরি আক্রমণের মুকাবিলায় এ সাতাইশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সামরিক অভিযানগুলো প্রেরিত হয় প্রধানত মদিনার নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং ইসলাম প্রচার নির্বিঘ্নে পরিচালনার উদ্দেশ্যে মহানবী [সা] যখন খবর পেয়েছেন যে, কোন গোত্র বা অঞ্চলের লোকেরা মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে অঙ্কুরেই তাদের সমরায়োজন ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা করেন। সমর-

www.pathagar.com

কৌশলের এটা এক অতি কার্যকর দিক। শত্রুপক্ষকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদিনা পর্যন্ত অগ্রসর হতে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাদের আগ্রাসী তৎপরতা অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়ায় ব্যাপক যুদ্ধ এবং ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মুবাল্লিগ বা রাসূলের দূতকে অন্যায় অথবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয়, কখনো বা বন্দী বা নিপীড়ন করা হয়। এমতাবস্থায় সমরাভিযান প্রেরণ করে বিরুদ্ধ-শক্তিকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে মহানবীর [সা] জীবনকালে ছোট-বড় মোট ষাটটি সমরাভিযান পরিচালিত হয়।

মহানবীর [সা] রণ-নৈপুণ্য ও সমর-কৌশল ছিল সবিশেষ অভিনব ও সকল সমরবিদদের জন্য শিক্ষণীয়। এজন্য প্রথমে ইসলামের যুদ্ধ-নীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলাম শান্তির ধর্ম। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। কিন্তু দুনিয়ায় যারা জুলুম-অন্যায় করে, দীন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের প্রতিহত করা এবং প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা যুদ্ধ করা ইসলাম সঙ্গত মনে করে। আবার এ অস্ত্রধারণও কেবল সবলের পইে সম্ভব। মক্কায় ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের ওপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়, কিন্তু মুসলমানদেরকে তখন প্রতিরোধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আকাবার বাইয়াতের পরই আল্লাহর তরফ থেকে এ ব্যাপারে প্রথম অনুমতি আসে এবং হিজরতের পরে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই তা কার্যকরী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন :

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সম তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গীর্জা, ইয়াহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে [অর্থাৎ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় যারা সচেষ্ট]। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ার।' [সূরা হাজ্জ : ৩৯-৪১]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে ইসলামের যুদ্ধ-নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইসলামের যুদ্ধ-নীতি সম্পর্কে আরো কতিপয় আয়াত :

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না।' [সূরা বাকারা : ১৯০]

www.pathagar.com

অন্য আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদেরকে ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবে না [অর্থাৎ নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, রুগ্ন, সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্মযাজক প্রমুখ যারা যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধে সহায়তা করতে অম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি]। [সূরা বাকারা : ১৯৩]

পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে সবই মূলত ব্যক্তিগত, দু' গোষ্ঠী ও জাতিগত স্বার্থ উদ্ধার, অর্থ-সম্পদ, মতা ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নারী-লিপ্সার কারণে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের দু'ত্র জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় না। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্তৃত উপলব্ধি করা যায় যে, কেবলমাত্র আক্রান্ত হলে বা জালেমের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য এবং অন্যায়-অসত্যকে প্রতিহত করে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত বা আল্লাহর দীনকে কায়েম করা বা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যই শুধু যুদ্ধ করা সঙ্গত। আবার এমন যুদ্ধেও সীমালংঘন বা নীতিবান বর্জিত হওয়া সঙ্গত নয়। অন্যায়-অসত্য বা জুলুম-নির্যাতনকে প্রতিহত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু শক্তি প্রয়োগই বিধেয়, তার অতিরিক্ত নয়। তাই ইসলামের যুদ্ধ-নীতি অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির সপক্ষে নয়, বরং শান্তি ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য। এ মূলনীতির অনুবর্তী হয়েই মহানবী [সা] সকল যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

মোটকথা, মহানবী [সা] মদিনায় মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক তথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে যে রাষ্ট্র কায়েম করেন, সর্বসম্মতিক্রমে তিনিই সে রাষ্ট্রের অধিপতি হিসেবে বরিত হন। আল্লাহর প্রেরিত নবী হিসেবে তিনি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সে রাষ্ট্রের সকল কিছু পরিচালনা করেন। তাঁর ফলে সেটা একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাসূলের নেতৃত্বে ও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত এই রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী সর্বাধিক দিয়ে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। কিছুদিন আগেও যারা পৃথিবীতে সর্বাধিক অস্ত্র অনুন্নত, দরিদ্র ও শতধা বিচ্ছিন্ন বর্বর জাতি হিসেবে পরিগণিত হতো, রাসূলের নেতৃত্বে ইসলামী আদর্শের অনুসরণে তারাই অতি অল্পকালের মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ, সুশিতি, উন্নত এবং শক্তিশালী আদর্শ জাতি হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়।■

www.pathagar.com

বিশ্বাসের শর্ত ॥ আ ব দু র র শী দ খা ন

সারাটা জীবন গেলো নিজেকেই শুধু ভালবেসে,
বুকে নিয়ে অন্য এক মানবীর রূপের দোলাকে।
যে মাধ্যাকর্ষণে আমি বরাবর শুধু নিম্নমুখী
তাকে অতিক্রম শেষে কবে হবো পার
প্রতিশ্রুত বিশ্বাসের সোনালী দুয়ার
অন্তরাগে সেই সাধ্য কোথায় আমার!
কানে বাজে, সেই কবে এক কবি পূবের হাওয়াকে
পশ্চিমে যাবার তাড়া দিয়ে তার মনের বেদনা
জানাতে বলেছে তাঁর শাহী দরবারে;
নদীর মাঝির কাছে তার আবেদন
শুধু তাকে মদিনা নেবার;
মদিনার ধূলি হতে কি আকুল আকুতি তাহার;
নিজেদের চেয়ে বেশী তাঁকে
ভালবেসে ছিলো বলে ঈমানের পরীক্ষায় তারাই সফল।
অধম আমার
আত্মপ্রেমে জৈবিক তাড়নায় সারাটা জীবন গেলো
হলো না তো আবশ্যিক সে সফর আর;
দয়িতের দ্বারপ্রান্তে তারা সবে উজার হৃদয়
অপেক্ষায় কাটায় সময়।
সময় শরীর শক্তি সব গেছে এখন আমার;
সে সময়ে আমি হতে পারতাম তাঁর
অন্যতম প্রধান প্রেমিক, হা কপাল!
সেই আমি নিজেকেই শুধু ভালবেসে
ক্ষণিক যৌবনবতী কামুকী প্রণয়ে
হৃদয়ে মগজে চোখে লেগেছে যে ঘোর
তাতেই হারিয়ে গেলো মরুভূতে পাথর চাপার
জ্বলন্ত ঈমানটুকু; ন্যুব্জদেহে ভর সন্ধ্যাবেলা
সংগহীন পাড়ে বসে আছি;
অথচ পারতেন যিনি দুই জাহানের হতে শ্রেষ্ঠ মুর্শিদ আমার
তাঁকে আমি সরায়েছি দূরে; বিপরীত মেরুতে দাঁড়ায়ে
নিমজ্জিত তবু মগ্ন নিরর্থক বাতিল জীবনে।

www.pathagar.com

সামুদ্রিক ॥ আ শ্ রা ফ সি দ্দি কী

হঠাৎ সমুদ্র হাওয়া আজো ছুঁয়ে যায়
হঠাৎ সমুদ্র হাওয়া আলোগোছে ডাক দিয়ে যায়
কেউবা শুনতে পাই
কেউবা পাই না!
বড় ছোট হয়ে গেছি : বড় নীচ হয়ে আছি :
মশারীর ছোট ঘেরে আছি মোরা সব
পৃথিবী আকাশ সূর্য বুঝি দেখি নাই
বহু বহু দিন!

কেবল সূর্যের পথে তুলেছি সঙ্গিন!
নিজেরি ছোবলে মোরা নিজেরা আহত!
হয়ে গেছি শুধু নত! শুধু অবনত !!

কিন্তু সমুদ্র আজো রয়ে গেছে জেনো।
সমুদ্র রয়েছে রবে– সমুদ্র অমর।

একদা শৈশবকালে তুমিই এ সমুদ্রকে
হৃদয়ে মেখেছো
তুমিই এ সমুদ্রকে শোণিতে দেখেছো,
হে বনিআদম! তুমি ভুলে গেলে সে শক্তির ঝড়?
মরুভূমি মরুদ্যানে ওয়েসিস, পাকা শস্য খেত,
আংগুর-খুবানী-বাগ, শহর, বন্দর,
গ্রানাডা, মিসর, ব্যাবিলন
প্রাণ-সমুদ্রের সেই দৃঢ় আলোড়ন :
(যে প্রাণ-সমুদ্রের কাছে এ পৃথিবী ছিল ক্রীড়নক)
সে প্রাণকে হারালে কোথায়?
উত্তর হাওয়ার গানে, দক্ষিণ হাওয়ার গানে, পুবাল
হাওয়ার গানে গানে
যে প্রাণ গেয়েছে গান– সে প্রাণকে কোথায় রেখে এলে?
তুমি বুঝি বেঁচে নেই আর!
তোমার শিরায় বুঝি বহে না শোণিত–
নিভেছে সম্বিত!

www.pathagar.com

দেখিতে পাওনা তাই নীলাকাশ, রোদ, আলো, পাখী
মশারীর ছোট ঘেরে আছো নামহীন
নিজেদেরি পাপানলে মরো প্রতিদিন
মর্মির নগরে বুঝি আছো অন্তরীণ!

এই অন্ধকার ছেড়ে, এ জড়তা ঠেলে ফেলে
সবকিছু অবহেলা– যদি একবার
প্রাণ ভরে সে সূর্যকে গায়ে মাখিতাম,
সে বাতাস প্রাণ ভরে নিতে পারিতাম,
আবার সমুদ্র তীরে গিয়ে দাঁড়াতাম
প্রাণ-সমুদ্রকে মোর পুনঃ জাগাতাম
হাসিতাম, উঠিতাম, ছুটে ফিরিতাম,
স-সাগরা ধরণীকে পুনঃ জানিতাম,
আবার সে সমুদ্রের গান গাহিতাম
সমুদ্রকে পুনঃ চিনিতাম
আপনাকে ভেঙ্গে গড়িতাম,
তাহলে হয়ত পুনঃ আমাদের নবজন্ম হতো!
যে জন্ম দেখেছিল একদিন হযরত বেলাল
যে জন্ম দেখেছিল একদিন বুদ্ধ আর মেরীর দুলাল
যে জন্ম সমুদ্র স্রোতে মুছেছিল সহস্র জঞ্জাল!

সে সমুদ্র ঝড় চাই। আয় ঝড়! ঝড় নেমে আয়।
আত্মার সত্তায় আর শিরায় শিরায়।

www.pathagar.com

নবুয়ত সদৃশ খেলাফত ॥ আ ফ জা ল চৌ ধু রী

"প্রথমে নবুয়ত, তারপর খেলাফত, তারপর রাজতন্ত্র, তারপর
বিচ্ছিন্ন জাতির রাষ্ট্রিক শাসন– তারপর নবুয়ত সদৃশ খেলাফত।"
(মিশকাত শরীফ ২৯ : ৪২৩)

তুমি বড়াই করছো ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদের, বিসদৃশ মুকুট পরে
সং সেজে অবমানিত করেছ নিজেকে হে মুসলিম উম্মাহ্!
কতদিন আর কতকাল তুমি আত্মবিক্রীতের মত
তোমার সুষমা, তোমার খুশবু বিজাতীয়ের ভোগের
পসরা করে রাখবে?– এখন তোমার পরিচয় কি?
তুমি কি মুসলমান না তুমি তুর্কী, আরবী, বাঙালি বা কুর্দী
ইরাকী, ইরানী, মালয়ী, হাবশী– বাহ্ কত কী?
–কত বর্ণ, কত জাতিভেদ?
আর এখন হাদু ও নাসারার পদতলে পিষ্ট খোরাশান
ফিলিস্তিন ও ইরাক। যিল্লতির চরম সীমায় উপনীত তোমার
অন্তর ও বাহির হে উম্মাহ্। হে উম্মাহ্।
জাতীয়তাবাদের গাজন সাজিয়ে ফেনা তুলেছ তুমি
তুরস্কে, আরব জাহানে ও বাঙলায়। আর দেড় হাজার বছরের
তোমার অর্ন্তরাজ্য নিকুচি করছে এই আদেখলেপনার।
তবে এরওতো শেষ আছে– শুনতে পাওকি বরাভয়?
সেই আশ্বাস-ধ্বনি, তোমার প্রাণপ্রিয় রাসূলের [সা.] ডাক, তোমার বধির
কর্ণবিদারী সেই হাঁক–সেই পতাকা উড়ছে পতপত
–অতঃপর নবুয়ত সদৃশ খেলাফত!

www.pathagar.com

রাসূল [সা] ॥ ম তি উ র র হ্ মা ন ম ল্লি ক

কারো কাছে চাননি কিছুই তিনি শুধু দিয়েই গেছেন
পাওয়ার জন্য হননি পাগল
ভাবেননিতো চাওয়াই আসল
বরং তিনি দুখীর দ্বারে নিজের সবই নিয়েই গেছেন

পরের কথা ভেবে ভেবে কেটে গেছে জীবন যে তাঁর
বরণ করে নিয়েছিলেন
ক্ষুধার জ্বালা তাই অনাহার

দান করেছেন, নেননিতো দান সমস্ত বিলিয়েই গেছেন

কারোর কাছে পাতেননি হাত চাননি কারো অনুগ্রহ
পরাজিত করেছিলেন সব লালসা সকল মোহ

নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেছেন ত্যাগ করেছেন নিজের চাওয়া
হৃদয় দিয়ে খোঁজ নিয়েছেন হোলো কিনা সবার পাওয়া
মনের সঙ্গে সমস্ত মন জীবনভর মিলিয়েই গেছেন।

বালক মুহাম্মদ [সা.] ॥ সো লা য় মা ন আ হ্ সা ন

আকাশের পানে চেয়ে থেকে থেকে
চোখে আসে আঁসু পানি,
মরুর হাওয়াতে শোনে সে
বালক মানুষের কাত্‌রানি।

সেই সে বালক, জীবন শুরুতে
মেষের রাখাল সনে
তপ্ত মরুতে উদয়-অস্ত
দুঃখের দিনটি গোনে।

দুঃখ তাহার নিজের জন্য
নয় গো এত্তটুক।

www.pathagar.com

মানুষের লাগি মন তড়পায়
পায় না মোটেই সুখ।

নেই সমাজে নিয়ম-নীতি
নেই মানুষের দাম,
অর্থ কড়িতে কেনাবেচা চলে
'গোলাম' তাহার নাম।

সেই গোলামের ছিল না মোটেই
মনুষ্য-অধিকার,
ইচ্ছে হলেই মনিব করেছে
জীবনও সংহার।

বর্ণে গোত্রে বিভক্ত ছিল
বৈরীতে অতঃপর।
ছুঁতো-নাতা নিয়ে হানাহানি হতো
বংশ পরম্পর।

নারীরা ছিল অসহায় বড়
ছিল না তাদের মান,
দীনহীন পিতা জীবন্ত পুঁতে
বাঁচাতো সে খান্দান।

এতো সব সাত অনাচার আর
বে-ইনসাফি দেখে।
বালকের মন ছট্‌ফট্‌ করে
রাতটি কাটায় জেগে।

একটা কিছু করার তাড়না
ভাঙে ঘোর-নিদ-ভুল
বালক গড়ে শান্তির সেনা
'হিলফুল ফওজুল।'

সেই সে বালক মুক্তির দূত
জপি তার মনে নাম,
মুহাম্মদ– রাসূল তিনি
আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

শুধু তোমার জন্য ॥ আ ব দু ল হা লী ম খাঁ

তোমার মতো অসীম সুন্দর নিয়ে
কবিতা লেখার উপযোগী শব্দ কোনো ভাষায়ই আমি
পাইনা খুঁজে। আর সুন্দরতমের যেসব উপমা নিয়ে
কবিরা গর্ব করে সত্য বলতে কি
তার একটিও তোমার উপযোগী নয়–

হে রাসূল আমার,
পুরনো সাদামাটা শব্দ উপমা তোমার অপরূপসুন্দর
পায়ের কাছে ধরতে আমার ভীষণ লজ্জা করে।
সব শব্দই বহু ব্যবহারিত
সব উপমাই সীমাবদ্ধ
সব উপমায়ই আছে অন্তত একটা ফুটো
যা তোমার জন্য প্রয়োগ করতে পারি না–
যেমন চাঁদে কলঙ্ক আছে
ফুলে আছে কীট
অথচ পৃথিবীতে এমন কোনো মায়ের পুত নেই
যে তোমার এক কণা ত্রুটি ধরতে পারে।
কত কবিই তো তোমাকে নিয়ে লিখেছে কবিতা
কত ভাবে এঁকেছে রূপের ছবি
কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ দেখেছে কে
তোমার সম্পূর্ণ বলেছে কে?

আমার মন বলে প্রাণ বলে
তোমার সম্পূর্ণ আজো কেউ বলতে পারেনি
কোনোদিন পারবেও না
কী করে বলবে? তুমি যে সীমার অধিক সুন্দর
কবির কল্পনার অধিক অপরূপ।
তুমি যত ব্যক্ত নিরুপম তার চেয়ে অধিক
তুমি যত উক্ত অপরূপ তার চেয়ে অধিক
অপরূপ সুন্দর।

হে রাসূল আমার–

www.pathagar.com

তুমি বিশ্ব কাব্যের তুলনাহীন পরিপূর্ণ
এক নিটোল কবিতা। মণিমুক্তার মতো– শব্দ ছন্দে
আমার বুক ভরে আছ
প্রাণ ভরে আছ
আছ চোখের তারায় দেহের শিরায়
রক্তের কণায় কণায়। তোমাকে বর্ণমালায়
সাজাবার বৃথা চেষ্টা করবো না আর।

তুমি আছ বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর
মানুষ মানুষে এতো ভালোবাসাবাসি
শীত গ্রীষ্ম
আলো আঁধার
সংগ্রাম বিদ্রোহ
জীবন মৃত্যু
মিলন বিরহ
হাসিকান্না
সবই ভালো লাগে। খুব ভালো লাগে
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল।

দরূদ-সালাম ॥ ম হি উ দ্দি ন আ ক ব র

আমার নবী সবার সেরা
সব জনমের, সর্বকালের
শ্রেষ্ঠ মানুষ– নবীর নবী
আল্লা'পাকের প্রিয় রাসূল তিনি,

আমরা তাঁকে দীন-দরদী
প্রাজ্ঞ জনের শিরোমণি
বিশ্ব সেরা রাষ্ট্র নায়ক
দুই ভুবনের ত্রাতা বলেই চিনি।

www.pathagar.com

তাঁর উছিলায় সৃষ্টি তাবৎ
কৃষ্টি এবং সভ্যতা আজ
বিকশিত হচ্ছে তাঁরই–
সম্মানেতে; আমরাও যে ধন্য,

অনন্য চরিত্রটি তাঁর
আদর্শ যে তোমার আমার
তাইতো লাখো নিযুত কোটি
দরূদ-সালাম রাসূল পাকের জন্য।

* পড়ুন– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নাত ॥ জা কি র আ বু জা ফ র

মুহাম্মদ এই একটি নামে এত প্রেমের ঢল
জগতজুড়ে ভালোবাসার অবাক কোলাহল।

একটি নামে পাগলপারা হাজার কোটি মন
মনের মাঝে সুদৃঢ় হয় জান্নাতি বন্ধন
পবিত্রতার রওশনিতে মন করে উজল।

কত চোখের অশ্রুভেজা ঐ মদীনার পথ
তার সে পথে চলার তরে করেছে শপথ
আল জিহাদের পথে তারা থাকবে অবিচল।

মুহাম্মদের নামে যারা ফোটায় প্রেমের ফুল
ফুলের সুবাস নিয়ে করে নিজেকে নির্ভুল
তার জীবনে মেলবে পাখা সুখের শতদল।

www.pathagar.com

নিগূঢ় পথের সান্নিধ্য ॥ ও ম র বি শ্বা স

তোমার পথের খোঁজে যে নদীটা চলে গেছে
দিগন্ত পর্যন্ত যেতে যেতে সেই নদী আরো দিগন্ত ছুঁয়েছে
এমন আবেগ অনুরাগে ভরা মিশে থাকা নোনাজল ভক্তের অনুকম্পা নিয়ে
যেতে যেতে নিয়ে গেছে সেই পথে সে আরো সন্ধানী চোখ
তোমার পথের রশ্মিরেখা ধরে চলছে অনন্ত যুগ প্রথম পথের শেষে
চলতে চলতে আরো নতুন নদীর তীর ছুঁয়েছে প্রান্তের ভেলা।

তোমার পথের খোঁজে চলেছে নদীরা
যেতে যেতে মিশে গেছে স্পর্শরেখার অতলে
যেতে যেতে সে পথের বাঁকে বাঁকে ফেলেছে নোঙর
পিপাসী চোখের চাহনিতে বন্দরের সুগন্ধি ও কস্তুরির সুস্বাদু
আমেজে আনন্দে দোলা অবসন্ন মন বন্দনার বাহুবন্ধনে জড়ানো।

তোমার প্রেমের ঘাটে ঘাটে নোঙর ফেলেছে তুলে নিতে পথের সঙ্গীরা
তোমার ধ্যানের ভেলা ভাসিয়ে চলেছে
এ চলা পথ পথের উপরই থাকবে মজনুর ভালোবাসা।

এ পথেই পুরুষেরা যোগ দেয় নারীর মহিমা
মিশে আছে পথজোড়া তুলে নিতে সকল বেদনা কষ্টসুখ
এ পথে তোমার খোঁজে প্রেমের নিশানা খুঁজে কেটে যাচ্ছে বিগত রাত্রির স্বপ্ন
যেতে যেতে বন্দরের খোঁজে তৃষিত আলাপ।

এ পথেই নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধা আছে
মৃগনাভী নীল জোছনার মায়া
নিঃসংশয় চলা পথ দৃশ্যমান প্রজ্জ্বলিত ঠিকানার খোঁজ।

তারুণ্যের সাঁতার এ নদী পথে যদি হয়
আমার দু'চোখ ক্লান্তিহীন সান্নিধ্যের মধ্যে অনবরত
মগ্ন হয়ে আছে ধ্যানে
শুধুই তোমার জন্য দিগন্ত বিস্তৃত মায়াময় স্বর
পংক্তিমালার জাল ছড়িয়ে দিয়েছি আমি বুঝি পথ চিনে নিতে ভুল করি নাই
জনতার ভিড় ঠেলে এক পুণ্য নদী এই পথের খবর বলে দিয়েছে আমায়।

www.pathagar.com

হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে ॥ ম ন সু র আ জি জ

হৃদয়ের ঠনা মাঠে রুয়ে দেই তোমার সবক
জীবনের ভরা মাঠে ফসলেরা হাসবে
বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে টোল পড়ে ভাসবে
মানুষেরা দেখে নেবে ঠনা মাঠে আলোর চমক।

আলোর চমক দেখে পৃথিবীও আলোকিত হবে
নক্ষত্রের পাশে তারারাও মিটিমিটি জ্বলবে
খোলা আকাশের মাঝে ছুটে ছুটে কত কথা বলবে
তার বুকে মধ্যমণি হয়ে তুমি জ্বলে রবে।

আজো তবু হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে তোমার ছবিতে চোখ বুঁজি
তোমার সে মধু ভরা কথাগুলো ইশারাতে খুঁজি
খুঁজে খুঁজে দৃষ্টিরা অকারণে হয় হয়রান
মনের গহীন কোনে মন তবু পেতে রয় কান।

হঠাৎ হৃদয় মাঝে উঁকি দেয় হাসি মাখা নবীজির ছবি
তার সাথে একটা অধম শুধু নতজানু হয়ে বলে 'আমি এক কবি'।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, সারওয়ারে কাওনাইন, রাহ্মাতুল লিল 'আলামীন, শাহানশাহে আরব ও আজম বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভাগমন নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। রূহানী দুনিয়া থেকে এ বস্তুজগতে মহানবীর [সা] আবির্ভাব সত্যি সত্যিই বিশ্বস্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের এক অপরূপ করুণা। তাঁর আগমনে শিরক, পৌত্তলিকতা, জাহেলিয়াত ও বর্বরতা দূরীভূত হয়। তাঁর শুভাগমনে বিশ্বের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এমন মহামানবের জীবনচরিত আলোচনা একটি বড় ইবাদত। তাঁর পবিত্র জীবনের প্রতিটি ঘটনা মানুষের হেদায়েতের জন্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

রবিউল আউয়াল মাস আমাদের দেশে একটি উৎসবের মাস হিসেবে পালিত হয়। বিশেষ করে ১২ রবিউল আউয়াল অনেকেই ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে থাকেন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, সালফে-সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের কেউ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করেননি।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জন্মতারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সীরাতকারকগণের মধ্যে যদিও মতভেদ রয়েছে, তথাপি তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, মহানবী [সা] রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম পক্ষে সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তা ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যকার কোন একদিন ছিল।

অপরদিকে রাসূল [সা] এর ওফাতের দিন-তারিখ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনায় কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সব ধরনের বর্ণনায় যে কয়টি তথ্য সম্পর্কে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, সে বিষয়গুলো তুলে ধরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। বিষয়গুলো হচ্ছে [ক] ওফাতের সন একাদশ হিজরী। [খ] মাসটি ছিল রবিউল আউয়াল। [গ] সময়টি ছিল মাসের প্রথম থেকে ১২ তারিখের মধ্যে কোন একদিন। [ঘ] দিনটি ছিল সোমবার। [সহীহ ওফাত অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর যুগ থেকে নিয়ে ৬ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে 'মিলাদুন্নবী মাহফিল' নামে কোন আমলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ৬০৪ হিজরী সনে সুলতান আবু সাঈদ মুজাফ্ফর ও আবুল খেতাব ইবনি দাহিয়্যাহ মিলাদুন্নবী মাহফিলের সূচনা করেন। তখন থেকে এ মনগড়া পদ্ধতি চালু হয়ে যায়।

বর্তমানে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে যে রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। যে কাজটি সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে ছিল না, ইসলামের প্রথম ৬ শতাব্দীতে যার (ঈদে মিলাদুন্নবীর) কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না তা আজ কিভাবে সাওয়াবের কাজ কিংবা রাসূল [সা]-এর মহব্বতের নিদর্শন বিবেচিত হতে পারে?

মিলাদুন্নবীর সূচনা সপ্তম শতাব্দীর সূচনা লগ্নে শুরু হয়ে পরবর্তীতে তাতে আরো অনেক কিছু যুক্ত হলেও ইতোপূর্বে কেউ এটাকে "ঈদ" আখ্যায়িত করার সাহস করেনি। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে 'ঈদ' বানিও না।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে এটা ঈদে মিলাদুন্নবীর মর্যাদা লাভ করেছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্য দু'টি ঈদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। ইসলামের সাথে যদি এর কোন যোগসূত্র থাকতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাকে 'ঈদ' আখ্যায়িত করতেন। তাঁর জন্মদিবসে ঈদ পালন করা যদি তাঁর কাছে পছন্দনীয় হতো, তাহলে শুধু তিনি কেন, খোলাফায়ে রাশেদীনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবসকে 'ঈদ' আখ্যা দিয়ে 'জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী' পালন করতেন। অথচ তাঁরা কখনও এ জাতীয় কিছু করার কল্পনাও করেননি। অতএব, হয়তো বলতে হবে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে আমরা ভুলের মধ্যে আছি। কিংবা বলতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন আমাদের জন্য আনন্দদায়ক; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জন্য আনন্দদায়ক ছিল

www.pathagar.com

না এবং তাঁর প্রতি আমাদের যতটুকু ইশ্‌ক ও মহব্বত আছে, সাহাবায়ে কেরামের তা ছিল না [নাউজুবিল্লাহ]।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখ নিয়ে তো মতভেদ রয়েছে- কেউ বলেছেন ৯-ই রবিউল আউয়াল, আবার কেউ ১৮-ই রবিউল আউয়াল বলেছেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হলো ১২-ই রবিউল আউয়াল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত লাভ করার তারিখ যে ১২-ই রবিউল আউয়াল, তাতে কারোই দ্বিমতই নেই। আমরা যেন ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের জন্য সেই তারিখ নির্ধারণ করে নিলাম, যেদিন প্রিয় নবীজী জগতবাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ইহজগত ত্যাগ করেছেন। আমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের ওপর ঈদ উৎসব পালন করছো, না তাঁর ওফাতের উপর, তাহলে আমরা কী জবাব দেবো?

মোটকথা, এ তারিখকে ঈদ দিবস মনে করা সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। বরং দ্বীন ও শরীয়তে সুস্পষ্ট বিকৃতি ঘটানোর শামিল। কারণ, ঈদ একটি ইসলামী পরিভাষা। আর যে কোন ইসলামী পরিভাষাকে শরীয়ত স্বীকৃত নয় এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিকৃতি সাধন।

আনুগত্য ছাড়া মহব্বতের দাবী অবান্তর

হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু তারা ব্যতিত যারা আমার কথা গ্রহণ করেনি। প্রশ্ন করা হলো কে আপনার কথা গ্রহণ করেনি? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার কথা অমান্য করেছে, সে আমার কথা গ্রহণ করলো না।" [মিশকাত, বুখারী]

হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে আমার সুন্নাতকে মহব্বত করলো, সে আমাকে মহব্বত করলো। আর যে আমাকে মহব্বত করলো, সে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [তিরমিযী, মিশকাত]

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের নিদর্শন হলো তাঁর সুন্নাতকে মহব্বত করা।

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব [ভারতের একজন অতি উঁচু স্তরের বুজুর্গ আলেম]-কে প্রচলিত মিলাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, জনাব! আমরা তো প্রতি মুহূর্তেই মিলাদের আলোচনা করি। কারণ, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়ি। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ না করতেন, তাহলে এ কালিমা কিভাবে পড়তাম? তাঁর আলোচনা তো প্রতি মুহূর্তে হওয়া উচিত। তাঁর আচরণ ও উচ্চারণের আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

www.pathagar.com

যার প্রতি মানুষের ভালবাসা থাকে, তার আলোচনা প্রতিটি কথায় উচ্চারিত হতে থাকে, তাকে স্মরণ করার মাধ্যমে প্রতিটি আলোচনা সমাপ্তি ঘটে। যে বস্তু কল্পনায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তা প্রতিমুহূর্তে স্মরণ হতে থাকে। আল্লাহ ও রাসূল-এর সাথে যার মহব্বত আছে, তার প্রতিটি কথায় যদি আল্লাহ ও রাসূল স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে আশ্চর্যের কী আছে? সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা তো এই ছিলো যে, তাঁদের প্রতিটি কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক আলোচনা এসে যেতো। প্রতিটি আচরণে ও উচ্চারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আলোচনা এসে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য বিশেষ কোন সময় বেঁধে দেয়ার কী প্রয়োজন? আর এরই কী প্রয়োজন যে, তাঁর আলোচনা হলে শুধু জন্মবৃত্তান্ত কিংবা মু'জিযার আলোচনা হতে হবে এবং তাঁর বর্ণিত শরয়ী হুকুম-আহকাম এবং দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের আলোচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হবে? তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ-ই তো আলোচনার দাবী রাখে।

রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মোৎসব] পালন করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বড় রকমের কুসংস্কার। এটা আসলে জনৈক মুসলমান বাদশাহর আবিষ্কার। তিনি খ্রিস্টানদের বিপরীতে চিন্তা করলেন, খ্রিস্টানদের মধ্যে যেমন বড়দিনে উৎসব পালিত হয়, আলোকসজ্জা হয়, আমরাও অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবসে আনন্দোৎসব পালন করতে পারি। বাদশাহর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল।

ইসলামের এ ধরনের অস্থায়ী শান ও মর্যাদার কোন গুরুত্ব নেই। ইসলামের মর্যাদা তো হলো হযরত উমর [রা] যখন সিরিয়ায় তাশরীফ নিলেন এবং সিরিয়ার লোকেরা তাঁকে নতুন পোশাক পরিধান করার অনুরোধ করলো। তখন তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বললেন– আমরা এমন জাতি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে পারি, তাহলে আমাদের সম্মান ও মর্যাদা সকলের কাছেই থাকবে। আমাদের সম্মান আসবাব-উপকরণ দ্বারা নয়। আমরা সম্মানের উপযুক্ত হলে তা আসবাব-উপকরণ ছাড়াও হতে পারে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী

কোন বিশেষ সময় বা ঘটনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা যতো অধিক হবে, তার ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ততো বেশী অপছন্দনীয় হবে। আর শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘিত হওয়ার মাপকাঠি শুধু কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও ক্বিয়াস। ইসলামী শরীয়তের এই চার মূলনীতি দ্বারা সুপ্রমাণিত যে, রবিউল আউয়াল মাসে যেসব কর্মকাণ্ড একশ্রেণীর লোকের মাঝে প্রচলিত রয়েছে; যেমন– মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আনন্দোৎসব করা, জুলুস বের করা, আলোকসজ্জা করা, পতাকা-প্লাকার্ড স্থাপন করা ইত্যাদি– তা শরীয়তের সুস্পষ্ট সীমালঙ্ঘন। সুতরাং অবধারিতভাবেই এ সবকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট চরম অপছন্দনীয়।

www.pathagar.com

বিদ্‌'আত-এর পরিচয়

বিদ্‌'আতের পরিচয় হলো, যা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও ক্বিয়াস, শরীয়তের এ চার মূলনীতির কোনটি দ্বারা প্রমাণিত নয়। অথচ মানুষ তা দীনের অংশ হিসেবে করে থাকে। বিদ'আতের এ পরিচয় জানার পর ভেবে দেখা দরকার যে, আমাদের বন্ধুগণ এ ধরনের যেসব কাজ [যেমন, ঈদে মিলাদুন্নবী, উরস ইত্যাদি] করে থাকে, তা শরীয়তের উল্লিখিত চার মূলনীতির কোনটি দ্বারা প্রমাণিত কিনা এবং তা মানুষ দীন মনে করছে কিনা?

বিদ'আত নিন্দনীয় হওয়ার রহস্য এখানেই। তাতে যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তা নিষিদ্ধ হওয়াতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আমাদের বাস্ত ব জীবনেও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন, সরকারের অনুগত কোন কর্মচারী যদি সরকারী কোন আইন বা সংবিধান ছাপতে গিয়ে শেষে কোন একটি ধারা নিজের পক্ষ থেকে সংযোজিত করে এবং উক্ত ধারা রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য কল্যাণকরও পরিলক্ষিত হয়, তারপরও তা অপরাধ বিবেচিত হবে এবং এ ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবে। দুনিয়ার আইন-কানুনে যখন একটি ধারা সংযোজিত করা অপরাধ, তাহলে শরীয়তের আইন ও বিধানে কোন ধারা সংযোজিত করা, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়, কেন অপরাধ বিবেচিত হবে না?

ঈদ পালন একটি শরয়ী বিধান

ঈদ শরীয়ত নির্দেশিত একটি উৎসবের নাম। যেহেতু এটি একটি ধর্মীয় উৎসব, তাই তা পালন করার পদ্ধতিও ধর্মীয় বিধান থেকে আহরণ করতে হবে।

বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে, আনন্দোৎসব দু'প্রকার। একটি পার্থিব উৎসব এবং একটি ধর্মীয় উৎসব। সুতরাং ধর্মীয় উৎসব পালনের পদ্ধতি কি হবে, তা ওহীর মাধ্যমে জানতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি ধর্মীয় উৎসব পালনে বিশেষ কোন রেওয়াজ বা প্রথা অনুসরণ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে, শরীয়ত এ ক্ষেত্রে উৎসব পালনের অনুমতি দিয়েছে কি দেয়নি। এখানে নিজের মনগড়া কোন কিছু প্রচলন ঘটানো জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যেহেতু এ উৎসবের মূল ভিত্তি হলো দীন। তাই সাধারণ মানুষ উৎসব পালনের যে কোন মনগড়া পদ্ধতিকেও দীন মনে করে। এটা অনেক বড় ধরনের বিভ্রান্তি। তবে পার্থিব উৎসবের ক্ষেত্রে যদি তাতে অন্য কোন অনিষ্টের আশংকা না থাকে, তাহলে তা মনগড়া পদ্ধতিতেও হতে পারে।

বর্তমানে ভারত উপমহাদেশে আমাদের মুসলিম ভাইগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবস [বারই রবিউল আউয়াল]-কে ঈদের দিন [উৎসব দিবস] হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে এরূপ আক্বীদা বা বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব পদ্ধতি দেখে, যারা নিজের ধর্মীয় নেতাদের সাথে এরূপ উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কিন্তু উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে বুঝে নেয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লামের জন্মদিবসের আনন্দ দুনিয়াবী [পার্থিব] আনন্দ নয়; বরং এটা ধর্মীয় আনন্দ। সুতরাং তার প্রকাশ পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য শরীয়তের অনুমতি প্রয়োজন।

ইসলামের দু'টি ঈদ, তৃতীয় কোন ঈদ নেই

মানুষ ঈদে মিলাদুন্নবী প্রথা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ আমাদেরকে দু'টি ঈদ দিয়েছেন- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

মানুষ তৃতীয় আরেকটি ঈদ বানিয়ে নিয়েছে। এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সুস্পষ্ট সংঘাত হয়ে গেলো। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন- সরকারী আইনে ছুটির দিবসসমূহ নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু লেখক বা টাইপরাইটার উক্ত ছুটির সাথে আরো একদিন বৃদ্ধি করে দিল যে, প্রধান বিচারপতি সাহেব যেদিন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেদিনও ছুটি থাকবে। কারণ, তিনি রাষ্ট্রের পদস্থ কর্তাব্যক্তি। তাই তার নিয়োগপ্রাপ্তির আনন্দোৎসব উপলক্ষে ছুটি থাকা উচিত। আইনজ্ঞদের নিকট এ ছুটি বর্ধিতকরণ নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ বিবেচিত হবে। এজন্য রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা দায়ের হবে। কি চমৎকার উৎসব পালন! যার নিয়োগপ্রাপ্তি উপলক্ষে এ কাজ করা হয়েছে, সেই মামলা দায়ের করবে। এখানে আনন্দ প্রকাশ অপরাধ নয়; বরং ২য় অংশটি অপরাধ। উক্ত অপরাধ হলো, রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধানে সাধারণ নাগরিকের পরিবর্তন ঘটানো। এ কারণে গোটা বিষয়টি অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছে এবং আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে।

অনুরূপভাবে বারই রবিউল আউয়াল তারিখে উন্নত খাবার পাকানো, নতুন পোশাক পরিধান এবং আনন্দোৎসব পালন ইত্যাদি সত্তাগত দিক থেকে দূষণীয় নয়। বরং দূষণীয় এ কারণে যে, তাতে শরীয়তের বিধান ও আল্লাহর আইনের বিকৃতি ঘটছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু দু'টি ঈদের ঘোষণা দিয়েছেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। সুতরাং এ দুই ঈদ ব্যতীত কোন ঈদ সাব্যস্ত করা শরীয়তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং শরয়ী বিধানে বিকৃতির শামিল।

আল-কুরআনের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী

ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চারটি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস। ঈদে মিলাদুন্নবীর ওপর ইনশাআল্লাহ প্রতিটি মূলনীতির আলোকে আলোচনা করা হবে। প্রথমে কুরআনুল কারীমের আলোকে আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা রয়েছে, যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন কোন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত-২১]

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত [অর্থাৎ শরয়ী দলীল ব্যতীত] দীনের কোন বিষয় নির্ধারণ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

আর সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ঈদে মিলাদুন্নবীকে শরয়ী কোন দলীল ছাড়াই দীনি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়তের কোথাও তার হুকুম বিদ্যমান নেই। এটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্ট।

হাদীসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে দীন বহির্ভূত কোন নতুন কথা সংযোজন করলো, তা প্রত্যাখান করা আবশ্যক।"

পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করা হয়েছে, তা এ হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন্নবীকে দীনি বিষয় মনে করে প্রবর্তন করা হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসের 'নতুন কথা' দ্বারা এমন বিষয় উদ্দেশ্য যার কার্যকারণ পূর্বে ছিল, অথচ পূর্বে তার আমল বিদ্যমান ছিলো না। তবে যে বিষয়ের কার্যকারণ পূর্বে বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু তার ওপর শরয়ী কোন বিধান নির্ভরশীল, তা শরীয়তের অনিবার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

সুনানে নাসায়ী সূত্রে বর্ণিত–

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার কবরকে ঈদ উৎসবের বস্তুতে পরিণত করো না। আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যাবে।" [সুনানে নাসায়ী]

এ হাদীসে ঈদ নয় এমন বস্তুকে ঈদ মনে করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। হয়তো প্রশ্ন হতে পারে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে তো সকলে সমবেত হয়। এর জবাব হলো, সমবেত হওয়া তো জায়েয। কিন্তু ঈদ উৎসবের ন্যায় সমবেত হওয়া জায়েয নেই।

অর্থাৎ মানুষ ঈদগাহে যেভাবে সমবেত হয়, সেভাবে আমার কবরে সমবেত হয়ো না। আর ঈদ উৎসবের নিয়ম হলো, তার জন্য দিন-তারিখ নির্দিষ্ট থাকে, তাতে একজন অপরজনকে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান করে। সুতরাং এভাবে সমবেত হওয়ার ওপর হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে একে অপরকে আহ্বান করা ব্যতীত অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেত হয়ে গেলে তা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, রওজা শরীফ যিয়ারতের জন্য সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটির কোনটিই পাওয়া যায় না। তার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দিন-তারিখ নির্ধারিত নেই। বরং আগে পরে যখন যার ইচ্ছা সুযোগমত গিয়ে জিয়ারত করে আসে এবং সকলে এক সাথে সমবেত হওয়াকে আবশ্যকও মনে করা হয় না। মোটকথা, এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রওজা শরীফে ঈদের পদ্ধতিতে সমবেত হওয়া না জায়েয। সুতরাং স্থানের দিক থেকে যেমন ঈদ পালন [রওজা শরীফকে ঈদগাহ বানানো] নিষিদ্ধ ও না জায়েয। তদ্রূপ কোন

www.pathagar.com

দিবসকে ঈদের দিন মনে করা [যেমন, বারই রবিউল আউয়ালকে ঈদের দিন মনে করা] নিষিদ্ধ ও না-জায়েয।

উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে দুরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য [যা কখনো ফরয, ওয়াজিবও হয়ে থাকে] যখন ঈদের ন্যায় সমবেত হওয়া না- জায়েয। তাহলে অন্য কোন মনগড়া উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে?

হাদীস শরীফে আছে, একবার ঈদের দিন কয়েকটি বালিকা খেলা করছিলো। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত উমর [রা] তাশরীফ এনে তাদেরকে খেলার জন্য শাসালেন। ফলে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

হে উমার! তাদেরকে খেলতে নিষেধ করো না। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ঈদ [উৎসব দিবস] রয়েছে। এটা আমাদের ঈদ।"

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বালিকাদের খেলা জায়েজ হওয়ার কারণ হিসেবে বললেন, "এটা আমাদের ঈদ।" খেলা জায়েজ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি ঈদের দিনকে উল্লেখ করলেন। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ হুকুম ঈদের দিনের সাথে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যদি প্রত্যেকের জন্য ঈদ উৎসব প্রবর্তন করা জায়েয হয়, তাহলে প্রতিদিন এ ধরনের খেলা জায়েজ হবে এবং 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 'ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনের সাথে যে হুকুম সীমাবদ্ধ করেছেন, তা অর্থহীন হয়ে যাবে। ফলে শরীয়ত প্রণয়নকারীর কথা অর্থহীন সাব্যস্ত হবে।

বর্তমানে মানুষ যেসব বিষয় নিজের থেকে নির্ধারণ করে নিয়েছে (যেমন ঈদে মিলাদুন্নবী ইত্যাদি), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সে সকল বিষয়ের শিক্ষা দান করেননি। বরং সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। আর শরীয়তের উসূল ও নীতিমালার আলোকে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ কাজ সম্পূর্ণ না-জায়েয, বিদ'আত ও গোমরাহী।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও ইজ্‌মায়ে উম্মত

কুরআন ও হাদীস দ্বারা তো ঈদে মিলাদুন্নবীর নিষিদ্ধতা ও তা বিদ্'আত হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেলো। এখন অবশিষ্ট থাকলো ইজমায়ে উম্মত। ইজ্‌মায়ে উম্মত দ্বারাও ঈদে মিলাদুন্নবী নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। কারণ, ফিকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো, উম্মত কোন বিষয় পরিত্যাগ করার ওপর একমত হওয়া একথা প্রমাণ করে যে, বিষয়টি না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে। ফিকাহবিদগণ অসংখ্য ক্ষেত্রে এ মূলনীতিকে দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কাজ সর্বদা পরিত্যাগ করাকে তা না-জায়েয হওয়ার সপক্ষে দলীলরূপে গ্রহণ করতেন। যেমন তাঁরা বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা] ঈদের নামাজ পড়েছেন; কিন্তু তাতে আযান ও ইকামত ছিলো না।'

www.pathagar.com

অনুরূপ যে কাজ সমগ্র উম্মত বর্জন করেছে [অর্থাৎ যা কেউ করেনি], তা বর্জন করা ওয়াজিব। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই ফিকাহ্‌বিদগণ দুই ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত অনুমোদন করেননি। সুতরাং যদি এ মূলনীতি মেনে না নেয়া হয়, তাহলে দুই ঈদের নামাজে আযান ও ইকামত যুক্ত করা উচিত। আর যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ মূলনীতি অন্য ক্ষেত্রেও দলীলরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন হতে পারে যে, গোটা উম্মত ঈদে মিলাদুন্নবী বর্জন করেনি। কারণ, উম্মত দ্বারা তো এ যুগের উম্মতও উদ্দেশ্য। এ যুগের উম্মত হিসেবে আমরা তা করছি। কাজেই ইজমা' থাকলো কিভাবে? জবাব এই যে, ফিকাহ্ শাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হলো, অতীতে যে বিষয়ের উপর গোটা উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, পরবর্তীতে তাতে মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্ববর্তীদের ঐকমত্যকে পরবর্তীদের মতানৈক্য বাতিল করতে পারে না। আর পরবর্তীগণ ঈদে মিলাদুন্নবী প্রথা চালু করার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববর্তীগণের তা বর্জন করার ওপর ঐকমত্য ছিলো। সেই ঐকমত্য এখন বাতিল হতে পারে না।

এ মূলনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত এই যে, হানাফী ইমামগণ মৃত ব্যক্তির একাধিক জানাযার নামাজ [একই ব্যক্তির জন্য] না-জায়েয বলেছেন এবং প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এটা সাহাবী ও তাবি'য়ীগণ কর্তৃক স্বীকৃত নয়।

মোটকথা, এটা শরীয়তের এক সর্বসম্মত মূলনীতি যে, গোটা উম্মতের কোন বিষয় বর্জন করা তা শরীয়ত স্বীকৃত না হওয়ার দলীল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে সাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, প্রচলিত ঈদে মিলাদুন্নবী বিদ'আত ও কুসংস্কার। তা বর্জন করা অপরিহার্য।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও ক্বিয়াস

এখন অবশিষ্ট থাকলো ক্বিয়াস। ক্বিয়াস দু'প্রকার- ১. এমন ক্বিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে প্রমাণিত। ২. এমন ক্বিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে প্রমাণিত নয়। আর শরীয়তের বিধান হলো, মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ক্বিয়াস অগ্রহণযোগ্য। ঈদে মিলাদুন্নবী সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের যুগে বিদ্যমান ছিল। আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের পরবর্তী যুগে যেসব নতুন নতুন বিষয় ও সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, সেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য। যেমন বর্তমানে ব্যবসার যেসব নতুন নতুন পদ্ধতি ও নিত্য নতুন বস্তুর আবিষ্কার চলছে, তার বৈধতা মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তিদের ক্বিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

তাছাড়া কোন বিষয়ে আমরা কিয়াসের শরণাপন্ন তো তখন হব, যদি তাতে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের বক্তব্য না থাকে। তাঁদের ক্বিয়াস আমাদের ক্বিয়াসের ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ, আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, তাকওয়া-আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিমুখতা এবং দীনের জন্য ত্যাগ ও কোরবানী তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আমাদের চেয়ে অনেক ঊর্ধে ছিলেন। সুতরাং তাঁদের চিন্তার সাথে আমাদের চিন্তা সংঘাতপূর্ণ হলে তাঁদের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঈদে মিলাদুন্নবী বিদ্'আত হওয়ার সপক্ষে আরেকটি যুক্তি এই যে, বারই রবিউল আউয়াল আমরা আনন্দ প্রকাশ করতে পারি না। কারণ, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতও হয়েছিলো এদিনে। আবার শোকও প্রকাশ করতে পারি না। কারণ, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ দিনে। বড় অদ্ভুত মিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম দিবস ও ওফাত দিবস এবং তাঁর জন্মের মাস ও ওফাতের মাস প্রসিদ্ধ মতানুসারে এক ও অভিন্ন। এর কারণ কী? বিচিত্র নয় যে, এ অভিন্নতা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেউ যেন বারই রবিউল আউয়ালকে উৎসব দিবসে পরিণত না করে, আবার শোক দিবসেও পরিণত না করে। কারণ, যদি কেউ উৎসব দিবস বানাতে চায়, তাহলে ওফাতের কল্পনা উৎসব প্রকাশে অন্তরায় হবে। আবার যদি কেউ শোক দিবস বানাতে চায়, তাহলে শুভ জন্মগ্রহণের কল্পনা শোক প্রকাশে অন্তরায় হবে। এ যুক্তি দ্বারাও রবিউল আউয়াল উৎসব দিবস হওয়ার যৌক্তিকতা তিরোহিত হয়ে যায়।

আনন্দ ও শোক প্রকাশের জন্য এ দুটি ঘটনার চেয়ে বড় আর কোন ঘটনা হতে পারে না [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মগ্রহণের ঘটনার চেয়ে অধিক আনন্দদায়ক কোন ঘটনা নেই এবং তাঁর ওফাতের ঘটনার চেয়ে অধিক বেদনাদায়ক কোন ঘটনাও নেই]। যখন সাহাবায়ে কেরামের যুগেই উৎসব দিবস ও শোক দিবস পালনের যুক্তি তিরোহিত হয়ে গেলো, তাহলে পরবর্তী যুগের জন্য তো তা আরো সুস্পষ্টভাবেই তিরোহিত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জন্মদিবস পালন তাঁর অবমাননা

কেউ বলতে পারেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস হিসেবে উৎসব পালন করি। আমি বলবো, এরূপ যারা করে, তারা বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বে-আদবী করে।

সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সাথে, যাদের তাঁর সাথে কোন তুলনাই হয় না, এভাবে তুলনা করা যায় যে, তাঁর জন্মদিনের আনন্দের জন্য দুনিয়ার অতি নগণ্য পন্থা অবলম্বন করা হবে, যা রাজা-বাদশাহদের জন্য করা হয়?

সোমবার তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ইবাদতও করেছেন। জন্মগ্রহণের তারিখ বারই রবিউল আউয়ালে তো তিনি কোন ইবাদত করেছেন বলে প্রমাণ নেই। এ যুক্তির দাবী তো হলো, প্রত্যেক সোমবার ঈদ [উৎসব] পালন করা। অথচ এটা কেউ করে না। মোটকথা, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা বিদ'আত এবং তা বর্জন করা অপরিহার্য। ■

www.pathagar.com

যখন এলেন আলোর নবী

আসাদ বিন হাফিজ

■

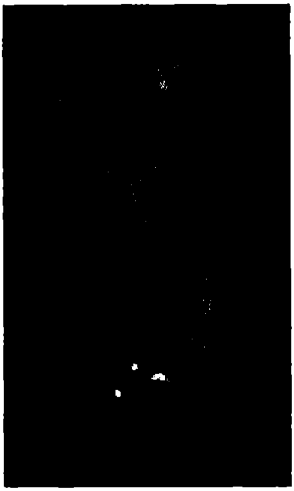

আরব দেশ। ধূ ধূ মরুভূমি। চারদিকে কেবল বালি আর বালি। পাহাড় আর পাহাড়। কোথাও গাছপালা নেই। নদীনালা নেই। খাল-বিল নেই। নেই চোখ জুড়ানো ফসলের ক্ষেত। এখানে ওখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় পর্বত। ওগুলোর শরীর জুড়ে পাষাণ শিলা ও কঠিন পাথর। কোথাও সোদা মাটির গন্ধ নেই। ফলবান বৃক্ষ নেই। ফুলের বাগান নেই। নেই সবুজ ঘাসে ভরা অবারিত মাঠ।

পথের পাশে ছায়াদার বৃক্ষ নেই। দীঘি নেই, পুকুর নেই। সবুজের ছোঁয়া নেই কোথাও। শুধু বালি আর পাহাড়। পাহাড় আর পর্বত। অনেক দূরে– দূর-দূরান্তে দু'একটি বাবলা গাছ।

www.pathagar.com

সীমাহীন বালির রাজ্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে সামান্য মরুদ্যান। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি খেজুর বৃক্ষ। তাও কাঁটায় ভরা। পাশে এক চিলতে ওয়েসিস। হয়তো ওখানেই তৃষ্ণার্ত পথিক পাবে সামান্য পানির সন্ধান। এরপর আবার বালি। আবার পাহাড়। আবার পর্বত। আবার কঠিন পাথর ও শিলা।

যেমন কঠিন দেশ তেমন পাষাণ সে দেশের মানুষগুলো। তাদের অন্তরে দয়ামায়া নেই। হৃদয়ে নেই স্নেহ-মমতা। মনে নেই এতটুকু প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। আছে শুধু হিংস্রতা। আছে ঘৃণা আর ক্ষোভ। আছে হিংসা আর লোভ। আছে শক্তির বড়াই। আছে অহংকার ও ক্ষমতার দাপট। শঠতা ও প্রতারণা।

সে দেশে নিয়ম নেই, নীতি নেই। আইন নেই, শৃংখলা নেই। ফলে সারা বছর মারামারি লেগেই থাকে। গোত্রে গোত্রে মারামারি। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মারামারি। বংশ পরম্পরা চলে এ হানাহানি। আরবের বালু সিক্ত হয় মানুষের রক্তে। রক্তের ধারা বয় দুর্বলের। রক্তের ধারা বয় বিপন্ন পথিকের। কেউ নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারে না। নারী পারে না ঘরের বাইরে যেতে। চারদিকে শুধু জিঘাংসার তান্ডব। চারদিকে মারামারি। চারদিকে হানাহানি। মরুর বাতাসে আকুলি বিকুলি করে মজলুমের আর্তনাদ। মানবতার কান্না গুমরে মরে পাহাড়ে-পর্বতে। সত্য, সুন্দর, সভ্যতা, সততা, মানবিকতা নির্বাসিত হয় মানুষের সমাজ থেকে। সেখানে বাসা বাঁধে অসত্য, অসুন্দর, অসভ্যতা, অসততা, অমানবিকতা।

সততার বালাই নেই বলে দুর্নীতিতে ছেয়ে যায় দেশ। সব সম্পদ গিয়ে জমা হয় কতিপয় জালিমের হাতে। সারা আরবে কায়েম হয় রাহাজানি, ছিনতাই ও সন্ত্রাসের এক ভয়াল রাজত্ব। সাধারণ মানুষের জীবন কাটে অভাব আর অনাহারে। পেটের খিদে কুড়ে খায় মানুষের বুদ্ধি বিবেক। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে তারা আপন কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে শুরু করে। এভাবে পুরো সমাজটাই হয়ে পড়ে মানুষের বসবাসের অযোগ্য। মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে কাতরায় সভ্যতা। মানুষের স্বভাব হয়ে পড়ে পশুরও অধম। নিরাশার আঁধার ঘিরে ধরে সবাইকে। কারো মনে শান্তি নেই। অন্তরে নেই এক রত্তি স্বস্তি। ভয় আর শংকা কাঁপন তোলে বুকের ভেতর। কখন যে কেমন করে আক্রান্ত হবে জানে না কেউ।

ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। এ জ্বালা ভুলিয়ে দেয় আল্লাহ-খোদার নাম। গুড়িয়ে দেয় ন্যায়-অন্যায় বোধ। তখন আবির্ভাব ঘটে ধর্ম ব্যবসায়ীদের। তারা গড়ে তোলে নকল খোদার অসংখ্য মূর্তি। নিজের অভাব অভিযোগের কথা খুলে বলতে বলে তাদের কাছে। বিপদে আপদে তাদের কাছে চাইতে বলে সাহায্য। দিশেহারা মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে আপন স্রষ্টাকে ভুলে সে সব দেবদেবীর পুজো করতে থাকে। কারো কাছে চায়

www.pathagar.com

বিত্ত বৈভব, কারো কাছে চায় শক্তি। কারো কাছে চায় ক্ষুধার খাবার, কেউ চায় রোগ মুক্তি। ভয় সন্ত্রাসে মূর্তির কাছে মাথা কুটে কেউ নিরাপত্তা চায়। কেউ ছুটে যায় মূর্তির কাছে বিপদে যেন হয় সহায়।

কিন্তু এসব মূর্তি সবই তো মানুষের বানানো। তাদের না আছে কোন ক্ষমতা, না আছে কোন শক্তি। কি করে তারা মানুষের উপকার করবে? কি করে তারা দুর্বলের হাত ধরবে? তাই বিপন্ন মানুষের কোন আশাই আর পূরণ হয় না। দূর হয় না তাদের অভাব। পিছু ছাড়ে না ধেয়ে আসা বিপদ। আর এই সুযোগে একদল মানুষ অসহায় মানুষের খোদা বনে যায়। দুর্বলরা বাধ্য হয়ে মেনে নেয় শক্তিমানের প্রভুত্ব। নিরাশার কালো মেঘ ছেয়ে ফেলে তাদের জীবন। সে জীবন জুড়ে কেবল অন্ধকার। অন্ধকার তাদের অন্তরে। অন্ধকার সমাজ জীবনে। অন্ধকার অর্থনীতিতে। অন্ধকার সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে। প্রেতরাত্রির মত চারদিকে শুধু আঁধারের রাজত্ব। বড়দের কেউ সম্মান করে না, ছোটদের কেউ আদর করে না। মায়ের জাত নারীদের কোন ইজ্জত নেই। কেউ তাদের মানুষও গণ্য করে না। তারা যেন কেবল ভোগের সামগ্রী। আর দশটি বিলাস সামগ্রীর মতই নিছক কোন পণ্য।

দুঃখী মানুষগুলো দুঃখ ভুলতে এবার ডুব দেয় নেশার সমুদ্রে। সম্পদশালীরা ক্ষমতার গর্বে হাতে তুলে নেয় ভোগের পেয়ালা। দেখতে দেখতে সবাই আকণ্ঠ ডুবে যায় নেশার নীল দরিয়ায়। সমাজে ছড়িয়ে পড়ে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা। নেশার ঘোরে মানুষ হয়ে যায় পশুর অধম। লোপ পায় তার মান-অপমান বোধ, লোপ পায় তার হুশ-জ্ঞান। মান নেই, হুশ নেই, তবু সে মানুষ। তবু তারা পথ চলে। তবু জীবনকে বাঁচাতে পালিয়ে বেড়ায় মরুভূমির সীমাহীন সীমানায়।

মরুভূমির বালির ওপর দিনের বেলা ঝাঁপিয়ে পড়ে খইফোটা রোদ। রোদের ছোঁয়া পেয়ে চিকচিক করে বালির কণা। নদীর ঢেউয়ের মত ঢেউ উঠে বালির সমুদ্রে। মনে হয় থই থই পানির স্রোত বইছে। কিন্তু না, এ যে দৃষ্টির বিভ্রম! চোখের দেখা সঠিক নয়। মনের বুঝাও সঠিক নয়। আসলে ওখানে কোন পানি নেই, আছে কেবল বালির খেলা। এর নাম মরীচিকা। এই মায়া মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে প্রাণ হারায় কত তৃষ্ণার্ত পথিক। বালির ওপর পড়ে থাকে মৃত মানুষের শুকনো হাড়-হাড্ডি।

রাতে সে আরবের আকাশেও চাঁদ ওঠে। শাপলা ফুলের মত তারায় তারায় ভরে যায় মরুভূমির রাতের আকাশ। কোমল আলো ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে, পর্বতে, মরুভূমির দিগন্ত জোড়া বালির রাজ্যে। কিন্তু তাতে তাদের মনের আঁধার দূর হয় না। দূর হয় না সমাজের অন্ধকারও। বরং সভ্যতা আগের মতই ডুবে থাকে নিকষ আঁধারে। দস্যুর হাতে লাঞ্ছিতা নারীর মত পড়ে থাকে অসহায় মানবতা।

www.pathagar.com

চাঁদের কোমল আলো যেমন তাদের মনের কালো দূর করতে পারে না তেমনি পারে না সূর্যের কিরণও। বরং রোদের তীব্র আলোর নাচন তাদের দৃষ্টিকেও যেন অন্ধ করে ফেলে। বাইরে ও ভেতরে তখন জমাট বাঁধে সমান আঁধার। নিকষ সে আঁধারে ডুবে থাকে আরবের অসহায় মানুষগুলো। ডুবে থাকে তাদের অশান্ত মন। ডুবে থাকে অমানবিক এক সমাজ ও সভ্যতা।

কিন্তু রাত যত বিভীষিকাময় হোক এক সময় পূর্বাকাশে দেখা দেয় আঁধার বিনাশী আলোর নাচন। সে আলোয় পালিয়ে যায় সমস্ত অন্ধকার। ঘুম ভাঙা মানুষেরা দুঃস্বপ্নের বদলে চোখের সামনে দেখতে পায় প্রসন্ন সকাল। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যুগ যুগ ধরে এমনটিই চলে আসছে। ইচ্ছে করলেই কেউ রাতকে চেপে ছোট করতে পারে না, দিনকে পারে না টেনে বড় করতে। রাত যত বড় হওয়ার কথা ততটুকুই হয়। দিনও যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকুই থাকে। সমাজ জীবনেও রাত নামে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে। মানুষ যখন তার স্রষ্টাকে ভুলে যায়, যখন সে হারিয়ে ফেলে তার আত্মমর্যাদা তখন সেখানে বাসা বাঁধে অন্ধকার। মানুষ যখন জানে না কেন আল্লাহ তাকে বানিয়েছেন, এ পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তখনই মানুষকে গ্রাস করে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার। যখন এমন অন্ধকার নেমে আসে সমাজ জীবনে তখনই সে সমাজ হয়ে পড়ে মানুষের বসবাসের অযোগ্য। সেখানে তখন ছড়িয়ে পড়ে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার। সমাজ থেকে হারিয়ে যায় পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা। ছড়িয়ে পড়ে হিংস্রতা ও রাহাজানি। মানবিকতার জায়গা দখল করে পশুত্ব ও বর্বরতা। রক্ষক হয় ভক্ষক। শাসক হয় শোষক। মানুষ ভুলে যায় একদিন তাকে মরতে হবে। মরার পর আল্লাহর কাছে এ দুনিয়ার কাজের হিসাব দিতে হবে। ফলে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, বেহায়াপনা, চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে মানুষ। জড়িয়ে পড়ে যার যতটুকু শক্তি ও সামর্থ আছে। যার যেমন সুযোগ আছে। ভাবে, এতেই তার কল্যাণ ও মঙ্গল হবে। পরের সমস্যা নিয়ে আর তখন কেউ মাথা ঘামায় না। অন্যের অধিকার রক্ষার কথা কেউ আর চিন্তাও করে না। এভাবে কোন সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ মানুষকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য আবার প্রেরণ করেন নবী ও রাসূল। তারা আল্লাহর বাণীবাহক। তারা মানুষকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন আল্লাহর কথা। স্মরণ করিয়ে দেন 'মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি। দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহ মানুষের ভোগের জন্য বানিয়েছেন আর মানুষকে বানিয়েছেন আল্লাহর এবাদত করার জন্য।'

এভাবে সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের সংখ্যা হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ। তারা কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা সময়ে

www.pathagar.com

আসেননি। তারা এসেছেন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে। মানুষকে জানিয়েছেন তার দায়িত্বের কথা। জানিয়েছেন সমাজ ও সভ্যতায় তার করণীয় বা কর্তব্য কি?

যখনি সভ্যতা বিপন্ন হয়েছে তখনি তারা এসেছেন। দুর্নীতির ঘূর্ণিপাকে পড়ে মানুষ যখন দিশা হারিয়েছে তখন তারা এসেছেন। যখন ঘন আঁধারে ছেয়ে গেছে মানব সমাজ তখন তারা এসেছেন। সভ্যতা যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে তখন তারা এসেছেন। তারা এসেছেন বিপর্যস্ত মানবতাকে উদ্ধার করতে। তারা এসেছেন পাশবিকতার বিস্তার রোধ করতে। তাদের হাতে ছিল হেদায়াতের মশাল। তাদের হাতে ছিল আল্লাহর নূর। সে মশাল ও নূরের আলোয় তারা পথভোলা মানুষকে দেখিয়েছেন সোনালী সুপথ। তাদের আগমনে অন্ধ ফিরে পেয়েছে তার দৃষ্টি। ঘুমন্ত মানবাত্মা দুঃস্বপ্নের রাত পেরিয়ে পৌঁছে গেছে আলোর বন্দরে।

আরবে যখন নেমে এলো ঘোর অন্ধকার- যার বিবরণ একটু আগে দিয়েছি, তখন সেখানে একজন নবীর আগমন অপরিহার্য হয়ে পড়লো। সময়টা ছিল ৫৭০ ইসায়ী সাল। আল্লাহ তার প্রিয়তম হাবীব হযরত মুহাম্মদকে [তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক] সেখানে নবী হিসাবে প্রেরণ করলেন। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য তাঁকে দিলেন কোরআন। সেই কোরআনের আলোয় দূর হয়ে গেল অন্ধকারের অমানিশা। মানুষ ফিরে এলো আল্লাহর পথে, সত্যের পথে, সততার পথে। আর তখন শত্রু হয়ে গেল বন্ধু। মানুষ হয়ে গেল মানুষের ভাই। পরের সম্পদ কেড়ে নেয়ার বদলে নিজের সম্পদ পরকে দান করতে শিখল মানুষ। বন্ধ হয়ে গেল সন্ত্রাস ও রাহাজানি। বন্ধ হয়ে গেল অনাচার, দুর্নীতি। পাপকে পাপ হিসাবে চিনল সবাই। ছেড়ে দিল পাপের পঙ্কিল পথ। মাত্র তেইশ বছরের সাধনায় তিনি এমন এক সমাজ গড়ে তোললেন- যে আরবে অভাবের তাড়নায় কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিত মানুষ, সেই আরবে দান করার জন্য কোন গরীব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল যে পরশ পাথরের গুণে তার নাম আল কোরআন ও আল হাদীস। প্রকৃতির দিন ও রাত্রির আঁধার দূর করার জন্য যেমন প্রয়োজন সূর্য এবং চাঁদ তেমনি সমাজ ও সভ্যতার আঁধার দূর করার জন্য প্রয়োজন হাদীস ও কোরআন। চাঁদ ও সূর্য ছাড়া জগতকে আলোকিত করা যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব কোরআন ও হাদীস ছাড়া সমাজ ও সভ্যতাকে আলোকিত করা। ■

www.pathagar.com

উপ-মহাদেশের সন ব্যবস্থাপনায় হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রভাব

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

বিশ্বব্যাপী সন ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তা'আলার প্রবর্তিত বিধান কার্যকরী রয়েছে। সন গণনায় সকল দেশে সকল কালেই ১২ মাসে বছর গণনা করা হয়। আল্লাহ পাক স্বয়ং যে এ নিয়ম জারি করেছেন তার উল্লেখ পাই আমরা মানব জাতির জন্য নেয়ামতস্বরূপ প্রেরিত পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপী কিতাব আল কুরআনে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন– 'ইন্না ঈদ্দাতা শুহুরিহি ইনদাল্লাহি ইছনা আশারা শাহারান ফী কিতাবিল্লাহি ইয়াওমা খালাকাচ্ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদ' অর্থাৎ 'নিখিল বিশ্ব ও নভোমণ্ডল সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনার মাস বারটি। বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমাদৃত হযরত ঈসা [আ]-এর সংশ্লিষ্টতায় সৃষ্ট ঈসায়ী সনেও ['খ্রিস্টীয়' ও 'ইংরেজী' এ ভুল নামে বেশী পরিচিত] ১২ মাসে বছর গণনা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ইংরেজদের শাসন কায়েম থাকায় এটি এখানকার জনজীবনে দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া উপমহাদেশে সপ্তম শতাব্দী থেকেই ইসলামের আগমন ঘটায় এখানে ইসলাম ধর্মের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর স্মারকে চালু হওয়া হিজরী সনও ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। হিজরী সনের ওপর ভিত্তি করে এখানে স্থানীয় সন ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতিতে লয় পেয়েছে।

www.pathagar.com

আবার হিজরী সন ছাড়াও নবী [সা] ও ইসলামের সংশ্লিষ্টতায় উপমহাদেশে বহু সন প্রবর্তনের নজির রয়েছে। আমরা ক্রমান্বয়ে হিজরী সনের প্রবর্তন থেকে শুরু করে এর প্রভাবে উপমহাদেশে বিভিন্ন সন এবং আমাদের প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে বাংলা সন প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিতে ইসলামী সংস্কৃতির গভীর প্রভাব নিরূপণের প্রয়াস চালাব।

হিজরী সন

হযরত মুহাম্মাদ [সা] কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ পাকের নির্দেশে ৬২২ ঈসায়ী সনের ২৪ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সোমবার মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাবারীর মতে, মদীনায় উপস্থিত হবার দিন থেকেই হযরত মুহাম্মাদ [সা] নতুন সন গণনার নির্দেশ দেন। সেদিন থেকেই হিজরী সন গণনার প্রথম সূচনা। মদীনায় অবস্থানকালে নজরানের খ্রিস্টানদের সাথে নবী [সা]-এর যে সন্ধি হয় তাতে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নির্দেশেই হিজরতের পঞ্চম দিন হিসেবে প্রথম নির্দিষ্ট দিন তারিখ উল্লেখ করা হয়। হিজরী সন প্রবর্তনের পর যে মাসগুলোর নাম ব্যবহার করা হয় এ নামগুলো আগে থেকেই জারি ছিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম, ইবনে সাদ, ইবনে ইসহাক প্রমুখের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য জানা যায়। এরপর হযরত আবু বকর [রা]-এর সময় ইয়ামেনের গভর্নর ইয়ালার বিন উমাইয়া সর্বপ্রথম হিজরী তারিখ ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর [রা]-এর সময় আবু মূসা আল আশ'আরী খলীফা উমর [রা]-কে এই বলে পত্র লেখেন যে, 'আপনি আমাদের কাছে তারিখবিহীন পত্র পাঠিয়েছেন।' আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, হিজরী ষোল সনে হযরত উমর [রা]-এর কাছে একটি দলীল পেশ করা হয় যাতে শুধু শাবান মাস উল্লেখ ছিল। হযরত উমর প্রশ্ন করেন– 'এর দ্বারা কি করে বোঝা যাবে যে, এ শাবান মাস চলিত বছরের না গত বছরের? বিষয়টি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এরপর উমর ফারুক [রা] কালবিলম্ব না করে মজলিশে শূরা [পরামর্শ সভা] আহ্বান করে সন প্রবর্তনের বিষয়ে পরামর্শ করেন। খুজিস্তানের অধিবাসী জ্যোতির্বিদ হরমুজান বর্ষ, মাস ও দিন গণনার একটি পন্থা উদ্ভাবন করে মজলিশে শূরায় পেশ করেন। সন শুরুর বিষয়ে হযরত আলী [রা] হিজরতের ঘটনায় মহানবীর চরম সাফল্যের উল্লেখ করে হিজরতের স্মারকে সন গণনার প্রস্তাব দেন। সমবেত সদস্যগণ এক বাক্যে সমর্থন জানালে হিজরী সন নামে সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। মহানবী [সা] রবিউল আউয়াল মাসে হিজরত করলেও আরবী মাস গণনার নিয়মানুযায়ী হিজরতের দু'মাস আটদিন আগে থেকে অর্থাৎ ১ মহররম থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। ঈসায়ী সনে এদিন ছিল ১৬ জুলাই ৬২২ শুক্রবার। সুতরাং হিজরী সন হিজরতের তারিখ থেকে নয় বরং হিজরতের বছর থেকে গণনা শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী দ্রুত ইসলামের প্রচার প্রসারের সাথে সাথে সনটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের বিভিন্ন পর্ব, উৎসব এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান হিজরী মাসের হিসাবে হওয়ায় মুসলমানগণ এ সনকে পবিত্র জ্ঞানে

www.pathagar.com

অনুসরণ করে থাকে। এছাড়া প্রকৃতির নানা বিষয় চান্দ্র মাসের হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় বিশ্বের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও চান্দ্রমাসভিত্তিক হিজরী সন চর্চা ও ব্যবহার করে থাকেন। সপ্তম শতাব্দীতেই ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইসলামের আগমন হওয়ায় সে সময় থেকেই হিজরী সনটি এখানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে উপ-মহাদেশে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম শাসনামলে হিজরী সন ছিল রাষ্ট্রীয় সন। এ অবস্থা ইংরেজ আগমনের পরও ১৮৩৫ পর্যন্ত বজায় ছিল। এবার আমরা উপমহাদেশে হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর স্মারকে এবং হিজরী সনের ওপর ভিত্তি করে আর যেসব সন গড়ে ওঠেছে সেগুলোর ওপর আলোকপাত করব।

বাংলা সন

মোগল সম্রাট আকবরের সময় তারই নির্দেশে মহাপণ্ডিত আমীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজী এ সন প্রবর্তন করেন। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে ও অন্যান্য অঞ্চলের খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে তিনি চান্দ্রমাসভিত্তিক হিজরী সনের পরিবর্তে সৌরমাসভিত্তিক ফসলী সন চালু করেন। তিনি সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের বছর অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরী [১৫৫৬ ঈসায়ী] চান্দ্র সনকে স্থির সংখ্যা ধরে এর পরবর্তী অংশ সৌর সনে রূপান্তর করে বাংলা সন প্রবর্তন করেন। ফলে ৯৬৩ হিজরী ৯৬৩ বাংলা বলে গণ্য করা হয়। এভাবে হিজরী সন শুরুর সময় অর্থাৎ ৬২২ ঈসায়ী সনের ১৬ জুলাই ১ হিজরী ১ বাংলা তারিখ রূপে গণ্য হয়। তবে ৯৬৩ হিজরী পর্যন্ত বাংলা সন হিজরী সনের অবিকল রূপে চান্দ্রমাসও চান্দ্র গণনায় গণ্য করা হয়। ৯৬৩ হিজরীকে ৯৬৩ বাংলা গণ্য করে এ সময় থেকে সৌরবর্ষে রূপান্তর করা হয় ও মাসের নাম বাংলায় রাখা হয়। অধিকাংশ মাসের নাম শকাব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়। শকাব্দে 'মার্গশীর্ষ' নামক মাসটিকে বাংলায় অগ্রহায়ণ নামে গ্রহণ করা হয়। এভাবে হিজরী সন থেকে বাংলা সনের সৃষ্টি হয়। ফলে হিজরী সন বাংলা সনের মাতৃত্বের মর্যাদা পায়। উপমহাদেশের প্রধান দুই ধর্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছে এ জন্য বাংলা সন একটি পবিত্র সনের মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশের মানুষ ১লা বৈশাখে মিলাদ মাহফিল করে হালখাতা করে। ঐ সময় থেকেই বাংলাদেশের জমির খাজনা বাংলা সনের হিসাবেই পরিশোধ হয়ে আসছে। ঈসায়ী সনের [ভুল নাম ইংরেজী সন] শত ডামাডোলের মাঝেও বাংলা সন তার ঐতিহ্য হারায়নি। আজও জমির খাজনা বাংলা সনের হিসাবেই পরিশোধ করতে হয়।

হিজরী সনের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট সনগুলোর মধ্যে বাংলা সনই উপমহাদেশে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভাষাভাষি ও জাতিগোষ্ঠীগত দিক থেকে এটিই উপ-মহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ব্যবহৃত সন।

কোল্লম আব্দ

ভারতের মালাবার প্রদেশের কোল্লম [কিলোন, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য] একটি প্রাচীন সমুদ্র বন্দর। সুপ্রীনকাল থেকে মিসর, আরব, চীন ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে এর রয়েছে যোগাযোগ। বিশ্ববাসীর মুক্তিদূত হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ [সা] যখন আরব দেশে

www.pathagar.com

আবির্ভূত হন তখন বাণিজ্য ব্যাপদেশে আরবদের যাতায়াত ও যোগাযোগের ফলে তার আগমন এবং নবুওয়াতী দাওয়াতের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের মালাবার অঞ্চলের রাজা 'চেরুমান পেরুমাল' নবী [সা]-এর সত্য দীনের সন্ধান পেয়ে দেশ ছেড়ে মক্কায় হিজরত করেছিলেন এবং তিনি ইসলাম ধর্ম কবুল করেছিলেন। মালাবারের জনগণের অত্যন্ত প্রিয়এ রাজা রাজ্য ত্যাগ করে মক্কা গমনের পেছনে নবী [সা]-এর চন্দ্র বিদারণের ঘটনার অলৌকিকতার স্মৃতি জড়িত। আর সে কারণেই রাজা 'চেরুমান পেরুমাল'-এর হিজরত বা প্রস্থান দিবসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি সন প্রবর্তিত হয়। এ সন স্থানীয় ভাষায় 'কোল্লম আন্ডু' নামে পরিচিত। মালাবার রাজ যে বন্দরের মাধ্যমে আরব দেশে যাত্রা করেন এর নাম 'কোল্লম'। এ বন্দর থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে তিনি মক্কায় পৌছেন এবং আর ফিরে আসেননি। কোল্লম অর্থও 'পশ্চিম' এবং 'আন্ডু' অর্থ বর্ষ। এ দুয়ে মিলে প্রবর্তিত নতুন সনের নাম হয়েছে 'কোল্লম আন্ডু' বা 'পশ্চিম গমনের বর্ষ'। প্রখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত গৌরী শঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা 'কোল্লম সংবৎ' নামক সনের আলোচনায় এ বিষয়ে 'তুহফাতুল মুজাহিদীন' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে চেরুমান পেরুমালের রাজ্য ত্যাগ, মক্কায় উপস্থিতি ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তার স্মারকে এ সনের প্রবর্তনের বিষয় আলোচনা করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী [র] তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল ইসলাম'-এ এখানকার এক রাজা একরাতে চন্দ্র বিদারণের ঘটনা স্বচক্ষে দেখার কথা ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন । নবী করীম [সা]-এর হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয় এবং চন্দ্র বিদারণের সংশ্লিষ্টতায় একজন বিধর্মী বিদেশী রাজার সিংহাসন ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে হিজরত করে মক্কায় উপস্থিতির মাধ্যমে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন সে ইতিহাসের স্মারকে একটি সন চালু হওয়ায় নিঃসন্দেহে বিষয়টি সমকালীন সর্বমহলে যে অত্যন্ত গুরুত্ব বহনকারী বিষয় ছিল তা বুঝা গেছে। মালাবারের মুসলমানদের ঈমানী চেতনার পরিচয় এভাবে যুগ যুগ ধরে তাদের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

রাসূল মুহাম্মাদ সংবৎ

"গুজরাটের চালুক্য অর্জুন দেবের সময়ের 'বেরাওল' নামক স্থানের [কাথিয়াবাড়] এক শিলালেখ-মধ্যে "রসূল মহম্মদ সংবৎ [হিজরী সন] ৬৬২, বিক্রম সংবৎ ১৩২০, বলভী-সংবৎ ৯৪৫ এবং সিংহ-সংবৎ ১৫১ আষাঢ়, কৃষ্ণা ১৩ রবিবার লিখিত আছে" বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে হিজরী সনটি স্থানীয় ভাষায় 'রসুল মুহম্মদ সংবৎ' নাম ধারণের বিষয়টি জানা গেল যা হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত।

শাহুর সন

এ সনকে 'সূর সন' এবং 'আরবী সন'ও বলা হয়। আরবী ভাষায় মাস বোঝাতে 'শাহরুন' শব্দের প্রয়োগ থেকে এর নামকরণ 'শাহুর' হয়েছে বলে ধরা হয়। এটি

৬—

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে হিজরী সনের একটি বিবর্তিত রূপ। দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের সময় [১৩২৫-১৩৫১ ঈসায়ী] ৭৪৫ হিজরী সনের ১ মুহররম [ঈসায়ী ১৩৪৪ সনের ১৫ মে, বিক্রম সংবৎ ১৪০১, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বিতীয়া] থেকে এর শুরু হয়। এর মাসের নামগুলো হিজরী মাসের নাম ঠিক রাখা হলেও সৌরমাস রূপে এগুলো গণ্য হত। ফলে এর বছর গণনা করা হত সৌর বছরে। 'রবি' ও 'খরীফ' উভয়বিধ ফসল খাজনারূপে আদায়ের সুবিধার্থে দক্ষিণ ভারতে এ সনের প্রথম প্রচলন হয়। হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের স্মারক হিজরী সনের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল এ সনের ওপর।

একটি মজার ও ব্যাতিক্রমী বিষয় হল, এ সনের বর্ষ সংখ্যা দ্বারা লেখা হত না বরং আরবী সংখ্যাসূচক শব্দ দ্বারা লেখা হত। মারাঠা রাজ্যে এ সনের প্রচলন ছিল। মারাঠী পত্রিকার ডেটলাইনে এ সনের উল্লেখ দেখা যায়। মারাঠী ভাষা ও লিপিতে উচ্চারণে পার্থক্য হবার পরও এর মূলধারা টিকে রয়েছে, যেমন ১=অহদ [অহদে, ইহদে], ২=অস্না [ইসন্নে], ৩=সালাসাহ [সল্লাস], ৪=অরবা, ৫=খমসা [খম্মস], ৬=সিত্তা [সিন? সিত্ত], ৭=সবা [সব্বা], ৮=সমানিআ [সম্মান], ৯=তসআ [তিস্‌সা], ১০=অশর, ১১=অহদ অশর, ১২=অস্না [ইসন্নে] অশর, ১৩=[সলাসহ [সল্লাস] অশর, ১৪=অরবা অশর, ২০=অশরীন, ৩০=সলাসীন [সল্লাসীন], ৪০=অরবঈন্, ৫০=খম্‌সীন্, ৬০=সিত্তীন [সিত্তেন], ৭০=সবীন [সব্বেন], ৮০=সমানীন, সম্মানীন, ৯০=তিসঈন [তিসৈন], ১০০=মায়া [ময়া], ২০০=মঅতীন [ময়াতৈন], ৩০০=সলাসমায়া [সল্লাসময়া], ৪০০=অরবাময়া, ১০০০= অল্‌ফ [অলফ], ১০,০০০-অশর্ অলফ্ ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে ১২১৩ লেখার জন্য সল্লাসো অশরো সলাসমায়া ও অলফা এবং ১৩১৯ লেখার জন্য তিসা অশর সল্লাসে ময়া ব অল্লফ এরূপে লেখা হত।

মজার বিষয় হলো আমাদের বাংলাদেশেও শাহুর সনের ছিটেফোটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে মহররম মাসের ১০ তারিখকে বলা হয় আশুরা। এ আশুরা শব্দটি আরবী আশর বা অশর শব্দেরই অর্থ। কেননা 'আশুরা' শব্দটির অর্থ হলো দশমিক। এভাবে মহররম মাসের ১০ তারিখ 'আশুরা' নামে সকল মহলে পরিচিত। ফলে শাহুর সনের ১০কে যে অশর বলা হয়েছে তাও একই সংস্কৃতিজাত। সনটি আরবী ইসলামী ঐতিহ্য চমক সৃষ্টিকারী। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব কত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল এ সনটি তারই প্রমাণ বহন করে।

ফসলী সন

সম্রাট আকবরের সময় ফসলের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে এ সন প্রবর্তন করেন। হিজরী সনের মাসগুলোকে সৌর বা চান্দ্র সৌর অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত চান্দ্র ব্যবস্থায়। এ সন কার্যকরী করায় এটি সৌরবর্ষের সমকালীন হয়ে যায়। এটিও শাহুর সনের ন্যায় হিজরী সনের প্রকারান্তর মাত্র। পাঞ্জাব এবং সংযুক্ত প্রদেশে প্রথম এর ব্যবহার শুরু হয়।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ, দক্ষিণ ভারতে [শাহজাহানের আমলে] বিস্তৃতি ঘটে। বোম্বে প্রদেশে এটির প্রারম্ভ মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্যের উপস্থিতিকালে গণনা করায় দুই বছরের ব্যবধান গড়ে ওঠে। অবশ্য এর মাসগুলোর নাম হিজরী মাসের নামেই ছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে এর প্রারম্ভ কর্কট সংক্রান্তি বা শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভ দিন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে এটি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ হওয়ায় একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য গড়ে ওঠে। মোট কথা এটিও হিজরী সন প্রভাবিত একটি সন।

বিলায়তী সন

উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত হিজরী সন থেকে উদ্ভূত এটিও একটি ফসলী সন। এর সংখ্যার সাথে ৫৯২-৯৩ যোগ দিলে বাংলা সনের ন্যায় ঈসায়ী সন পাওয়া যায়। ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনকে আরবী ভাষায় বলা হয় বিলায়ত এবং বাংলা ভাষায় এ শব্দটি বিলাত নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। এই বিলায়ত বা বিলাত থেকে ইংরেজদের মাধ্যমে উপ-মহাদেশে যে সনটি আসে সেই খৃস্টীয় সন বা ঈসায়ী সনটিকে ইংরেজদের দ্বারা উপ-মহাদেশে প্রবর্তিত হওয়ায় যেমন এটিকে ইংরেজী সন বলা হয়ে থাকে যা আসলে ভুল তেমনি বিলাতের লোকদের দ্বারা সনটি উপ-মহাদেশে প্রবর্তিত হবার কারনে এটিকে বিলাতী বা বিলায়তী সন নামেও ডাকা হয়ে থাকে। মূলত হিজরী সন থেকে রূপান্তরিত সৌর ফসলী সন ও বাংলা সনের ন্যায় এটিও ঈসায়ী সনের সমন্বয়ের একটি রূপ। ঈসায়ী সনটি বিলাত থেকে আসায় এবং স্থানীয় সনের সাথে এর সমন্বয়ের সময় নামটি বিলায়তী সন নামে পরিচিত হয়। সৌর আশ্বিনের প্রারম্ভ বা কন্যা সংক্রান্তির দিন থেকে এর বছর আরম্ভ হয়। হিজরী সন থেকে উদ্ভূত হওয়া বা এর সাথে সমন্বয় করে এর শুরু ধরায় এটিও হিজরী সনের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত সন।

আমলী সন

এটিও হিজরী সন থেকে উদ্ভূত বিলায়তী সনের মতই একটি ফসলী সন। বিলায়তী সনের সাথে এর পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, এর বছরারম্ভ হত ভাদ্র মাসেরশুক্লা দ্বাদশীতে। উড়িষ্যার সরকারী কাচারীতে এবং বণিকদের মধ্যে এটির প্রচলন ছিল। হিজরী সন থেকে উদ্ভূত হলেও এটি উড়িষ্যার স্থানীয় সংস্কৃতিতে মিশে গিয়েছিল।

তারিখ এ এলাহী বা এলাহী সন

সম্রাট আকবর 'দীন ই ইলাহী' নামক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে ইলাহী সন নামে একটি নতুন সনের প্রবর্তন করেন। সিংহাসন আরোহনের ৩০ বছর পর [৯৯২ হিজরী] এ সনটি প্রবর্তন করা হলেও সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের বছর ৯৬৩ হিজরীকে এ সনের ১ম বৎসর ধরে 'তারিখ ই ইলাহী' নামের এ নতুন সন প্রবর্তন করা হয়। তবে সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ ২রা রবিউস সানি ৯৬৩ হিজরীকে বছর শুরুর দিন ধরা হয়নি। বরং

www.pathagar.com

এর ২৫ দিন বাদে ২৮ রবিউস সানি অর্থাৎ ইরানী বছরের প্রথম মাসে 'ফরবর দীন' এর আরম্ভ থেকে এটির গণনা শুরু হয়। এ সনটির বছর ছিল সৌর কিন্তু মাস এবং তারিখের নাম রাখা হয়েছিল ইরানী। এটিও সংখ্যা দ্বারা তারিখ জ্ঞাপন না করে শাহুর সনের ন্যায় ১ থেকে ৩২ পর্যন্ত সংখ্যার জ্ঞাপক বা বাচক শব্দ বা নাম দ্বারা তারিখ প্রতিপাদিত হত। যেমন–

১=অহুর্ম্মজ্দ, ২=বহমন, ৩=উর্দ্দিবহিস্ত, ৪=শহরেবর, ৫=স্পন্দারমদ, ৬=খুর্দ্দাদ, ৭=মুরদাদ [অমরদাদ], ৮=দেপাদর, ৯=আজর [আদর], ১০=আবাং [আবান], ১১=খুর্শেদ, ১২=মাহ, ১৩=তীর, ১৪=গোশ, ১৫=দেপমেহর, ১৬=মেহর, ১৭=সরোশ, ১৮=রশ্নুহ, ১৯=ফরবরদীন, ২০=বেহরাম, ২১=রাম, ২২=গোবাদ, ২৩=দেপদীন, ২৪=দীন, ২৫=অর্দ্দ [অশীশ্বঙ্গ], ২৬=আস্তাদ, ২৭=আস্নান্, ২৮=জমিআদ, ২৯=মেহরেস্পন্দ, ৩০=অনেরাং, ৩১=রোজ, ৩২=শব। শেষের দু'টি নাম ছাড়া বাকী নামগুলো ইরানীদের তারিখের নাম বা সংখ্যা নির্দেশক শব্দ।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর ১৬২৮ ঈসাব্দ পর্যন্ত মোট ৭২ বছর এ সনটি জারী ছিল। সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করে এটি রহিত করেন এবং পুনরায় হিজরী সন কার্যকর করেন। জাহাঙ্গীরের আমল পর্যন্ত এর ব্যবহারের প্রমাণ দলীল ও মুদ্রায় লক্ষ্য করা যায়।

মগি সন

এটিও হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তনের মতই। পার্থক্য এই যে, এটি বাংলা সন প্রবর্তনের ৪৫ বছর পরে ধরা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এবং আরাকানে এ সনের প্রচলন ছিল। ফসলী সন হিসেবে বাংলা সন চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৪৫ বছর পর প্রবর্তিত হওয়ায় এটি ঐ সময় থেকেই গণনা করা হয়। বাংলা সনের মাসের নামধামসহ চট্টগ্রামে সমকালে মগ রাজার শাসন কায়েম থাকায় স্থানীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে এটি মগি সন নাম ধারণ করে। ১৬৬৬ সনে চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও এ সন স্থানীয়ভাবে চালু ছিল। এখনও এর কিঞ্চিৎ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

মুহাম্মদী সন বা মৌলুদী সাল

ইংরেজ শাসনামলেও ভারতবর্ষে একজন স্বাধীন সুলতানরূপে রাজ্য শাসন করেছেন সুলতান টিপু [১৭৫০-১৭৯৯]। ১৭৮২ সালের ৭ ডিসেম্বর তার আব্বা হায়দার আলী খান ইন্তেকাল করার পর ১৭৮২ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি মহীশূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর উসমানীয় সুলতানের নিকট থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে তিনি সুলতান উপাধি ধারণ করেন। তিনি খলীফার সনদ পাওয়ার পর নিজ নামে মুদ্রা জারী করেন। এ মুদ্রায় তিনি ১২১৫ মওলুদী সাল উল্লেখ করেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ [সা]-

www.pathagar.com

এর জন্ম লাভের বছর থেকে এ মুহাম্মদী সন বা মৌলুদী সাল নামে নতুন সন প্রবর্তন করেন । ফলে বুঝা যায় তাঁর মৌলুদী সাল প্রবর্তনের বৎসর হলো ৫৭০+১২১৫=১৭৮৫ সাল। মহানবী [সা] এর জন্ম তারিখ থেকে কোন সন প্রবর্তনের ইতিহাস এটিই প্রথম।

হিজরী শাসছি সন

উপমহাদেশে জন্মলাভকারী ধিকৃত কাদিয়ানী সম্প্রসায় [আহমদী জামাত নামে এরা নিজেদের পরিচয় দেয়] ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের মত চান্দ্রমাসভিত্তিক হিজরী সনকেও সৌরমাসে পরিবর্তন করে হিজরী শাসছি সন নামে সন প্রবর্তনের অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ১৯৩৯ সনে কাদিয়ানীদের নেতার নির্দেশে এ সন চালুর অপচেষ্টা চালানো হয়। হিজরী শামছী সন নামে তাদের প্রবর্তিত এ সনের মাসগুলোর নামকেও এরা বিকৃত করার প্রয়াস চালায়।

সন, সাল তারিখ ইত্যাদি শব্দগুলো আরবী, ফারসী ভাষা থেকে নেয়া। বাংলাভাষাভাষী সহ ফলে উপমহাদেশের সকল অধিবাসীরা এ অঞ্চলে ব্যবহৃত সনগুলোর উপর এ শব্দগুলোর ব্যাপক আধিপত্য থাকায় সন ব্যবস্থাপনায় ইসলামী ঐতিহ্যের পরিচয়ই বহন করে চলেছে। এটি হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর অনুসারীদের জন্য এক গৌরব দীপ্ত অহঙ্কার।■

www.pathagar.com

প্রহরার দিক-দিগন্ত : উপস্থাপকের প্রতি ॥
আ ব দু ল মু কী ত চৌ ধু রী

ইসলাম

ইসলাম 'নতুন' নয়, আদমেই যাত্রা শুরু তার
এ সংশ্লিষ্ট 'আধুনিক' শব্দটিও ভাবনা-চিন্তার;
উপস্থাপন চাই সতর্ক সঠিক সুতরাং-
না হলে তা হবে স্রেফ আত্মঘাতী শব্দ বুমেরাং।
আবহমান ইসলামের 'চিরন্তনী' প্রশ্নবিদ্ধ করে
ভিত্তিহীন চিত্রণে ঠেলে দেয়া ঘরে ও বাইরে,
সে হোক উদ্দেশ্যপূর্ণ কিংবা তা অজ্ঞতাভিত্তিক-
অবমূল্যায়ন ধারা বেগবান–ভুলের অধিক।

মহানবী [সা.]

একান্ত পার্থিব সব সাদৃশ্যে সাযুজ্যে তাঁর
মূলায়নে ব্যাখ্যা-ভাষ্য শব্দাবলী ঃ শ্রেষ্ঠত্ব বিচার
অনুপম রাসূলের জন্য তা যথাযথ নয়,
সীরাতের মর্যাদায় অবাঞ্ছিত উপাদান হয়।
যাবতীয় শিথিলতা অবশ্যই পরিহার চাই,
না হলে দুর্ভেদ্য এই দুর্গেরও নেই যে রেহাই,
উদ্দেশ্যিক জিজ্ঞাসায় হতে পারে অবমূল্যায়ন
সুতরাং সতর্কতা ও যথার্থ শব্দচয়ন।
মহানবী উপমায়, হোক তা তুঙ্গ 'পদবী'তে
মহিমা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়, হিতে বিপরীতে!

www.pathagar.com

জ্যোতির্ময় দিনমণি বহতা জীবন ॥ সু জা উ দ্দি ন কা য় সা র

ফুলের খুশবু ছড়ায়ে সৃষ্টির উত্তীর্ণ জন্ম তোমার হে অন্তর বিভা
কালের দর্পণে ফোটালে আলোর প্রপূর্ণ দীপ্তি পয়গাম্বরই ইসলাম
তোমারে স্মরি দিবস যামিনী পিয়াসি এই বিরহী অন্তরাত্মা
প্রাণ কাড়ে গহিন নিগূঢ়ে আল্লাহ নবীর ও সুভাশিষ প্রেমাত্মা
আমি যে অনুগত সে আবেশে সদা নত দ্যুতি নূরে সমর্পিত

খোদার দীদার লাভে অন্তর দর্শনে জাগে সুশোভন মহাজ্ঞান
কী যে অনুরাগ কী যে অনুনয় কী যে গৌরব সুমহান
আমার কবিতা রচে আল্লাহ রাসূল নিয়ে সত্য ও সুন্দর
হৃদয়ের সকল ভালোবাসা প্রেমাভিসিক্ত বান্দার অন্তর
অলৌকিক আস্তরণে পুণ্যের শুভ্র শিরীন ত্রিভুবনে তুমি এলাহি দ্বীন
সরওয়ারে কায়েনাত সাইয়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্নাবীয়ীন

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মহব্বত এলাহি

ভাবনা আমার রচিত রমনে লিখে যায় আল্লাহ নবীর বয়ানে
আমার শব্দ ছন্দ জীবনাতীত সাক্ষরে প্রোজ্জ্বলন্ত তোমার কল্যাণে
আমার কবিতার কুসুম কলি নূরের মিলনে তৃষ্ণার অধীর উচ্ছ্বাসে
চিন্তায় শয়নে স্বপনে দিব্য জিকিরে কাটে সময়ের অনন্ত উদ্ভাসে

জীবন পৃথিবীর কুয়াশা কাটায়ে অনুপম প্রতিপল উর্ধ্বাকাশে
বুঝি, পরশমনি নূরে মুহাম্মাদী আমার আত্মনিবেদনের প্রকাশে
জ্যোতি রুহানী আপনার প্রজ্ঞার নির্মাণ বয়ে যায় তামাম জাহানের স্বাসে
খোদা প্রেমিক বিমোহিত হৃদি সৌরভ দেখি বিশ্বাসে আশ্বাসে নিশ্বাসে
কতনা জান্নাতী ফুল ঝরে মুমিন অন্তরে জীবন মূলে হে কান্ডারী
মুহাম্মদ আল্লাহর রাহে তপস্যা ধ্যানী চিরঞ্জীব অমলিন প্রভা

আমি ভক্ত চির সাথীকুলে হে চিরায়ত পথের পাথেয় খাতিমুল আম্বিয়া

www.pathagar.com

কল্যাণ বৃক্ষের ছায়া ॥ নু রু ল ই স লা ম মা নি ক

যে শব্দে জেগে ওঠে
আবু বকরের বিশ্বাসী হৃদয়
সেই শব্দ আমাদেরও দরোজায় কড়া নাড়ে।

আমরা জাগিনা তবু-
বুজদীল নিদ্রামগ্ন পড়ে থাকি রাতের কফিনে।

হে রাসূল!
চৌদ্দশ' বছর ধরে আপনি কী দীপ্ত
হেঁটে যাচ্ছেন এই মানবিক পৃথিবীতে
স্মিত হাস্য, আল্লাহ্‌র কালাম হাতে,
প্রতিটি লোকালয় ধরে।

আমরা জাগিনা তবু,
আপনার পবিত্র পদশব্দে
জেগে ওঠে নক্ষত্র খচিত নীলাকাশ
জেগে ওঠে বৃক্ষ লতা, পাহাড়ের
বুক চিরে বয়ে যায় স্ফটিক স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা

আমরা জাগিনা তবু,
বুজদীল নিদ্রামগ্ন পড়ে থাকি
রাতের কফিনে।

আপনার পবিত্র পদশব্দে
ভাঙে না যে মানুষের ঘুম
সে তো নিশ্চিন্ত পড়ে আছে
জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে।

হে রাসূল!
আপনার আদর্শ চিরকাল শান্তিময়
বৃক্ষের ছায়া
পথভ্রান্ত মানুষের নাজাতের
একমাত্র ঠিকানা।

www.pathagar.com

আরশে মু'আল্লা থেকে জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত
যে বৃক্ষের শামিয়ানা
আমাদের সেই কল্যাণ বৃক্ষের সুনিবিড়
ছায়ায় আশ্রয় দিন,
আশ্রয় দিন, হে রাহমাতুল্লিল আলামীন!

নাত-ই রাসূল [সা] ॥ গাজী এনামুল হক

সাহারাতে উঠল মেতে
গুনগুনিয়ে অলিকুল
মা আমিনার কোল জুড়ে ঐ
দোলে মোহাম্মদ রাসূল ॥

সেই খুশিতে উঠল মেতে
বনের পাপিয়া বুলবুল
কামলে ওয়ালা কাওসার ওয়ালা
তোমার প্রেমে সব ব্যাকুল ॥

সারওয়ারে কায়েনাত তুমি
সরকারে দো-আলম তুমি
মরুর মাটি লুটিয়ে পড়ে
তোমারই পাক কদম চুমি ॥

শামসে দোহা বাদ্‌রে দোজা
তুমি যে জান্নাতী ফুল ॥

আলোকিত ভোর ॥ শরীফ আবদুল গোফরান

তুমি বলেছিলে, বিহঙ্গের সাথে
দূর কোন ঘনবসতির বনে খুঁজে নাও নির্জনতা
মানবতার লতাপাতায় বেঁধে নাও তোমায়
সেখানেই পাবে আলোকিত পবিত্র ভোর।
আমি হেঁটে হেঁটে ঝরাপাতার শব্দে
স্তব্ধপ্রায় হিম নিঃশ্বাসের মতো উঠা-নামা করছি
আলোকিত পৃথিবীর অন্তর্দৃষ্টির অলক্ষে
একবারও ক্লান্তিতে ভুলিনি তোমায়।

www.pathagar.com

দৃষ্টি যেখানে পড়েছে সেখানেই মেনেছি নির্দেশ
এত ভালবাসি বলে বিঁধে নাই বুকে
একটি শব্দের শলা, কাটে নাই দাগ।
আকাশ নক্ষত্র দূর কোন দ্বীপের অন্ধকার গুহায়
রক্ত জবায় কিংবা জোনাকির পাখায়
কোথায় খুঁজিনি তোমায়?
পৃথিবীর এই সভ্য সময়ে
কাসাকেও ভাবে সোনা, মূল্য নেই মেধার।
তবুও আমি আবছায়ায় উড়ে যাই অনন্ত
মেঘের আড়ালে, সোনালী ডানার চিলের মতো
শেষ গন্তব্যে পৌঁছতে চাই, ছুঁতে চাই তোমার সিংহদ্বার।
তোমার প্রেমে মালা গেঁথে যাবো অনন্তকাল
যদি কখনো অজান্তে জন্ম নেয় নব পঙ্‌ক্তি কোন
তা তোমার নামে করলাম অগ্রিম উৎসর্গ
হে রাসূল!
তবুও কি মিলবে না তোমার দিদার
অনন্ত কালেও পাবোনা তোমার পরশ!
আমি ঊষার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে
তোমাকে পাওয়ার পিপাসায়
জেগে আছি জড়ো করে সমগ্র সাধনা
অপেক্ষায় আছি কখন হবে
আলোকিত পবিত্র ভোর।

নবী নগর এক্সপ্রেস ॥ আ ল হা ফি জ

মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে যায়
মেয়েটি ভাবতে ভাবতে হাঁটে

ভরা জোসনায় বুঝি জোসনা হয়ে যায়

যেতে যেতে ভাবে আর
ভাবতে ভাবতে একা হেঁটে যায়
যায় আর দুরু দুরু বুক নিয়ে পেছনে তাকায়।

www.pathagar.com

এই বুঝি পরে গেলো বাঘের থাবায়
এই বুঝি লুট হলো গোপন আগুন
মানব মুখোশ পরা দোপায়া সে বাঘ
বাঘ নাকি আরো কোনো ভয়নক কীট
চিট করে হিট করে কেড়ে নেবে জোসনা ফাগুন।
কেড়ে নেবে স্বাধীনতা : প্রশান্ত ভ্রমণ।

না না কিছু নয় ভয়, আগুনের হলকাও নয়
নয় কোনো বাঘের কামড়
এইখানে পড়ে ঠাটা বুশের কহর
এইখানে মানুষ যেনো আলোর নহর।

এই গাড়ি মেয়েকেও বাড়ি নিয়ে যাবে
মানুষের এই গাড়ি প্রেমিকেরা পাবে।

তাঁর পরশে ॥ হে লা ল আ ন ও য়া র

রোদ ঝিলমিল জোসনা রাতে খোশবু নীরে নেয়ে
হাসলো যেন তামাম মুলুক আল হেলালের পেয়ে!
তাঁহার নূরে ছোঁয়ায়ে নিলে অবুজ আঁধার মন
সেই পরশে উঠবে হেসে বিশ্ববাসীগণ!
ভূলোক দ্যুলোক পুলক মনে সুখ সাগরে ভাসে
মানব দানব পাখপাখালি তাঁকেই ভালবাসে।
আল হেলালের নূরে জাগে তপ্ত মরুর লোক।
অবুঝ মনে উঠলো হেসে মিটলো হাজার শোক।
নতুন বাঁশি বাজলো আবার বাজলো নতুন সুর
আরব জাহান কোন্ ঘ্রাণে করছে যে ভুর ভুর!
চারদিকে শুধু মধু গুঞ্জন ফিসফাস কলোরব,
ঘরে ঘরে আজ নতুন সাজে আগমনী উৎসব।
কেউবা ঊর্ধে তাকিয়ে দেখে পূর্ণ চাঁদের রূপ
তারা ঝিলমিল জোসনা পরশে দুনিয়া হয়েছে চুপ।
খেজুর শাখায় আবাবিল বসে এলান দিয়েছে জোরে
আঁধার নাশিতে এসেছে এ নূর বিশ্ববাসীর দ্বারে।

www.pathagar.com

কেঁপেছে আরশ নবীর পরশে সেজেছে রঙিন সাজে
আরশের বেনু ধরাতে নেমে উঠিল আবার বেজে।
গানের পাখিরা বাঁধিল পুঁথি ধরিল সুরে পাঠ
আরব সাগর উথালপাতাল করছে ছটফট!
আগমনী দূত সালাম জানাই সকলে দরূদ পড়ে
খোদার হাবীব এসেছে ধরায়– সবাই ওঠে নড়ে।
কুল আলমের পরম প্রিয় জানাই সালাম তাঁর
হে রাসূল খোদার হাবীব আমার করো গো পার।
আসমান থেকে পুণ্য রবি ধরায় আসিল নেমে
মুক্তির ছোঁয়া পেয়েছে মানুষ নবীর পয়গামে ॥

নবীর শহর ॥ দে লো য়া র হো সে ন

আলোর শহর নবীর শহর নবীর নূরে আলো,
সেই আলোতে ডুব দিলে যায় মনের সকল কালো।
আলোর শহর নবীর শহর আলো নবীর নূরে,
ইচ্ছে করে পাখির মতো যাই মদীনায় উড়ে।

আলোর শহর নবীর শহর নবীর কদম চুমি,
যেথায় ঘুমোয় দ্বীনের নবী পবিত্র সেই ভূমি।
আলোর শহর নবীর শহর ঐ মদীনা ডাকে,
নবীর গুণ-গানে বিভোর পাখিরা ফুল-শাখে।

আলোর শহর নবীর শহর নবীর স্মৃতি মাখা,
জ্ঞানের শহর রূপের শহর প্রশান্তিতে ঢাকা।
আলোর শহর নবীর শহর আলোয় ভুবন ভরা,
আকাশ, বাতাস, গ্রহ-তারা সেই আলোতে ধরা।

আলোর শহর নবীর শহর আলোয় ঝিকিমিকি,
সেই আলোতে দ্বীনের কথা নবীর কথা লিখি।
আলোর শহর নবীর শহর পুণ্য মাটির ছায়,
দরূদ-সালাম পৌঁছে দিতে চলরে মদীনায়।

www.pathagar.com

মানুষ ॥ রে দ ও য়া নু ল হ ক

মানুষ মানুষ কোথায় মানুষ
দুনিয়াটা ফক্কা
মানুষ ছিলো একজনই সে
জন্ম তাহার মক্কা।

মানুষ হয়ে মানুষ হবার
শিক্ষা তিনি দিলেন
আঁধার থেকে আলোয় ফেরার
দীক্ষা তিনি দিলেন
শুধু কেবল কাফির যারা
তারাই পেলো অক্কা।
মানুষ মানুষ কোথায় মানুষ
দুনিয়াটা ফক্কা।
এখন মানুষ মানুষ নিয়ে
খেলছে পাঞ্জা-ছক্কা।

চিঠি ॥ আ ফ সা র নি জা ম

মুহাম্মদের নামে
পাঠিয়ে দিলাম দরুদ সালাম
জোছনা মাখা খামে

আরো লেখা আছে-
তিনি আছেন বুকের ভেতর
ঠিক হৃদয়ের কাছে

চিঠির জবাব এলে
ছেড়ে দেবো বন্দী পাখি
উড়বে ডানা মেলে।

www.pathagar.com

ফররুখের কবিতায় রাসূল [সা]

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

শুধু আবর জগতে নয়, বিশ্বে হযরত মুহাম্মাদ [সা] যে মানব মুক্তির বাণী নিয়ে আবির্ভূত হন তাকে বিস্ময়কর বললে কম বলা হয়। কেবল আল্লাহ প্রেরিত বাণী দুনিয়াব্যাপী প্রচার করে নয়, তার বাস্তবতার রূপায়ণ তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে তিনি যে উদাহরণ সৃষ্টি করেন, মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন দ্বিতীয় নজির নেই। সে জন্য যারা তাঁর মতাদর্শকে গ্রহণ করে মুসলিম হতে পারেননি তারাও তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। তাঁর ঘোরতর সমালোচকও তাঁর অপার সাফল্যের মহিমা কীর্তন করতে কৃপণতার আশ্রয় নেননি।

নজরুল ইসলাম যে হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফার [সা] প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন–

'মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্ আরবী!
গাহিতে নান্দী গো যার নিঃস্ব হল বিশ্ব-কবি।'

কথাটি আদৌ অতি প্রশংসা নয়। শুরু হয়েছিল কাব বিন যুহাইরের [রা] বানত যুআদ দিয়ে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখছেন–

"কাব মসজিদের ভেতর আসিয়া দেখিলেন, এক সৌম্য মূর্তি মহাপুরুষ শিষ্যগণকে ধর্মোপদেশ দিতেছেন।

www.pathagar.com

দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন ইনি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ [সা]। কাব অগ্রসর হইয়া বললেন, 'হে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, যদি আমি অনুতপ্ত কাবকে আপনার নিকট আনিয়া দিই তবে আপনি কি তাকে ক্ষমা করবেন?" মহাপুরুষ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' তখন কাব বললেন, 'আমি কাব।' কাবের নাম শুনে কতিপয় ভক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হযরত তাদেরকে নিরস্ত করে কাবকে বললেন, 'তুমি কি সেই কবি যে আমাকে মামুর বলিয়াছ?' কাব বলিলেন, 'হযরত আপনি মাবুন [বিশ্বস্ত]। কোনও নির্বোধ মামুন স্থানে মামুর লিখিয়া থাকিবে।' কাবের উত্তরে হযরত সন্তুষ্ট হইলেন।
তখন কাব হযরতের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া কালিমা : [দীক্ষাবচন] পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হইলেন। তৎপর স্বরচিত এই কবিতাটি পাঠ করিতে লাগিলেন-

- নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল এমন এক জ্যোতি: যাহা হইতে আলোক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। তিনি আল্লাহর তরবারিসমূহের মধ্যে এক কোষমুক্ত তীক্ষ্ম তরবারি সদৃশ।
- আমাকে সংবাদ দেয়া হইয়াছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের নিকট ক্ষমা আশা করা যায়।
- অনন্তর আল্লাহর রাসূলের নিকট অনুযোগকারী হইয়া আমি আসিয়াছি, কেননা আল্লাহর রাসূলের নিকট ওজর গ্রাহ্য হইয়া থাকে।
- আমাকে ক্ষমা করুন, সেই আল্লাহ আপনাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন যিনি আপনাকে কুরআন অতিরিক্ত অনুগ্রহরূপে দান করিয়াছেন। তাহাতে উপদেশ ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে।
- নিন্দুকগণের বাক্যে আপনি আমাকে নিগৃহীত করিবেন না; যেহেতু যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা হইয়াছে; আমি কিন্তু অপরাধ করি নাই।
- নিশ্চয় আমি এমন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছি এবং এরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যে, যদি হস্তী সেই স্থানে দাঁড়াইত ও শুনিত,
- তবে নিশ্চয় সে কম্পমান হইত, যদি না, রাসূল হইতে আল্লাহর আদেশে কোন অভয় প্রদত্ত হইত।
- এতদূর পর্যন্ত যে, আমি আমার দক্ষিণ হস্ত সেই প্রতিশোধ গ্রহণকারীর করতলে রাখিলাম, যাঁর বাক্যই বাক্য। আমি তাঁহার অবাধ্যতাকরণ করি নাই।

শহীদুল্লাহ লিখেছেন-

> 'ভক্তগণ কাবের মুননিত কবিতাটি শুনিতে লাগিলেন। ... এবং কাব্যপাঠ শেষ হইলে রাসূল [সা] নিজ অঙ্গ হইতে চাদর উন্মোচন করিয়া কাবকে প্রদান করিলেন।'

এ থেকেই যে বিশ্বে রাসূলের [সা] প্রশস্তি শুরু হয়েছিল তা নয়। রাসূল [সা]-এর জন্মের পূর্ব থেকেই তাঁর আগমনবার্তা কবিদের হৃদয়েও পৌছে। জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমীন তাঁর 'বিশ্ব সাহিত্যে বিশ্বনবী' গ্রন্থে লিখেছেন-

www.pathagar.com

'মহানবীর আগমনের পরে তো বটেই, তাঁর আবির্ভাবের শত শত বছর পূর্বেও রচিত হয়েছিল কবিতা তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুত নবী। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। বিজ্ঞমহল সে সম্বন্ধে ধারণা রাখতেন এবং এই সর্বকাল শ্রেষ্ঠ মহামানবের প্রতীক্ষয় থাকতেন।'

এমনই একজন বিজ্ঞ কবি আসআদ ইবনে কায়ও আল হিময়ারী তাঁর এক কবিতায় লেখেন–

যে আসেনি এখনো আমি তাঁর জেনে গেছি নাম
সে যে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
হে প্রভু, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার রাসূল
আসবেন তিনি ধরাতলে জানি নিশ্চিত, নির্ভুল।
হায়! আমার আয়ু যদি হয় সীমাহীন
যদি বেঁচে থাকি তিনি আসবেন যেদিন,
তবে দাঁড়াবোই তাঁর পাশে, বাড়াবো এ হাত–
বন্ধু সাহাবী হবো থাকতে প্রভাত।
ভাই হয়ে পাশে পাশে রব রাতদিন
অমন বিভায় ধরা রাঙবে যেদিন।
[অনু : আসাদ বিন হাফিজ]

বনী লাহাব গোত্রের এক কবি, পেশায় যিনি ছিলেন গণক। তিনি রাসূল [সা] সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে লেখেন-

মহাগ্রন্থ আল কুরআনসহ
আজিমুশ্বান নবীর [সা] আবির্ভাব হবে।
তাঁকে দেয়া হবে ঈমান ও কুফরের
সত্য ও অসত্যের মধ্যে
পার্থক্যকারী মিজান আর সঠিক পথের সন্ধান।
তিনি এর দ্বারা প্রতিমার অর্চনা বন্ধ করে দেবেন
তিনি প্রেরিত হবেন দারুল হিকম মক্কাতে
তাঁর দলিল প্রমাণ হবে
সূর্যের জ্যোতির মত উজ্জ্বল।
[ঐ]

খাদিজার [রা] আত্মীয় রাসূলকে [সা] দেখে তাঁকে মহানবী [সা] বলে শনাক্ত করেন এবং লেখেন–

পাদ্রী কুম ইবনে সা'য়িদা যা বলেছিলেন
তা অসত্য হওয়ার নয়–

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা] অচিরে তাঁর কওমের নেতা হবেন।
তিনি জব্দ করবেন তাঁর দুশমনকে।
দেশ থেকে দেশান্তরে তাঁর নূর তাঁর জ্যোতি
বিস্তৃত হবে,
তাঁর জ্যোতির বদলা থেকে পৃথিবী রক্ষা পাবে
ফেতনা ফাসাদ থেকে।
আর অলৌকিক আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে
পৃথিবী পরিচালিত হবে হেদায়াতের পথে।

[অনু : রেজাউল করীম ইসলামাবাদী]

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমীনের 'বিশ্বসাহিত্যে বিশ্বনবী' পুস্তকে রাসূল [সা]-এর আম্মাজান তাঁর পুত্রের জন্মের প্রাক্কালে অলৌকিক বিষয় অবগত হয়ে নিম্নোক্ত কাব্যপংক্তি উচ্চারণ করেন–

হে বিস্তৃত বংশের সন্তান!
তোমার প্রতি আল্লাহর বরকত দান করুন,
যে বংশের প্রতি প্রভুর ক্ষমা ও নিয়ামত বর্ষিত হয়
যে বংশ ভ্রমণের প্রত্যুষে সম্পদের অংশ ফিদয়া দেয়
আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা যদি হয়-
এক শত অক্ষত উট বিলিয়ে দেবো।
তুমি জগৎস্বামীর কাছে প্রেরিত হচ্ছো।
তোমাকে হেল ও হারামের কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে।
আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন
তিনি রক্ষা করেন তোমাকে প্রতিমা পূজা থেকে।

[অনু : আবদুল ওয়াহিদ]

যা হোক রাসূলের [সা] জন্ম-পূর্ব সময় থেকে তাঁর আবির্ভাব পরবর্তীকালে তাঁর আত্মীয়স্বজন, ভক্ত সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে উপলক্ষ্য করে অনেক কবিতা লিখেছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন চাচা আবু তালিব, আবু বকর [রা], আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব [রা], রাসূল-পত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা [রা], হযরত উমর [রা], জামাতা হযরত আলী [রা], কন্যা হযরত ফাতিমা [রা] প্রমুখ। কবিদের মধ্যে ছিলেন হাসান বিন সাবিত [রা], কা'ব বিন যুহাইর [রা], আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আবুল আলা আল মাআরবী, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য আরবি কবি আশয়ী, আল কামিত, ওজীউদ্দীন আবদুর রহমান আশ শায়বানী। কিন্তু কা'ব বিন যুহাইর [রা]-এর পরে যে আরবি কবির রাসূল-প্রশস্তিবিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিল তিনি ইমাম মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল হাসান বুসিরী [১২১২-১২৯৬ খ্রি]। তাঁর 'কাসিদায়ে বুরদা' এক কিংবদন্তির উপাখ্যান সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রন্থ রচনার যে পরিচয় বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন সেটি এমনি–

আরবি সাহিত্যে এই গীতি-কবিতা অতি প্রসিদ্ধ। ইসলাম জগতে শান্তি- স্বস্তায়ন, আনন্দ-উৎসব এবং রাজ্যাভিযানকালে এই কবিতা পঠিত হয়। ভক্তগণ ভাবোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে তাঁহাদের নবীর [সা] এই জীবনগাঁথা নিয়মিতভাবে প্রত্যহ আবৃত্তি করেন। দরবেশগণ ভক্তিবিজড়িত স্বরে এই কবিতা গান করেন। আরবি ভাষায় ইহার ত্রিশতাধিক টিকা আছে। ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে লাতিন, ইংরেজি, ফরাসি, ও জার্মান ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতার রচয়িতা শয়খ ইমাম সালেহ আবু আবদিল্লাহ মুহম্মদ শরফদ্দীন বিন সাঈদ বিন হসন বুসীরী। তিনি বার্বার জাতীয় ছিলেন এবং মিসর দেশে ৬০৮ হি: [১২১২ খ্রি:] অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান মিসরের বুসিরী শহর হতে তিনি বুসিরী নামে খ্যাত হন। এই কবিতা রচনার সহিত কিছু অলৌকিকতা আছে। কবি তাহার রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

'এক সময় তিনি অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে তাঁহার বাম অঙ্গ একেবারে অসাড় ও বিকল হইয়া যায়। তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া, আল্লাহতায়ালার কাছে তাঁর জন্য আরোগ্য প্রার্থনা করার নিমিত্ত হযরত মুহাম্মদের [সা] প্রশংসাসূচক এই কবিতা রচনা করেন। হযরতের পবিত্র সমাধিস্থলে গমন করিয়া এই কবিতা পাঠ করিবেন, তিনি এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এমন সময় রাতে স্বপ্নে তাঁহার নিকট অবির্ভূত হন। হযরতের আশীর্বাদে তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করেন। প্রাতে তিনি নিজেকে সবল ও সুস্থ দেখিয়া কবিতা নিয়া হযরতের রওজা পাকের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এক ফকির তাঁহাকে সালাম করিয়া বলিলেন, 'হে শরফুদ্দীন, আপনি হযরতের প্রশংসার যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করুন।' কবি বলিলেন, আমি হযরতের প্রশংসাসূচক বহু কবিতা রচনা করিয়াছি। আপনি কোন কবিতার বিষয় বলিতেছেন? ফকির বলিলেন, 'যে কবিতার আরম্ভ এরূপ, 'তুমি কি যূসলমস্থ প্রতিবেশীগণের স্মরণে।' কবি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'কেহই এই কবিতার বিষয় অবগত নহে। আপনি কিরূপে জানিলেন?' ফকির বলিলেন, 'গত রাত্রিতে আপনি যখন এই কবিতা পয়গম্বর সাহেবের সম্মুখে পড়িতেছিলেন, তখন আমি শুনিতেছিলাম।' কবি ফকিরকে কবিতাটি দিলেন। ক্রমে লোকমুখে কবিতাটি প্রচারিত হইলে রাজমন্ত্রী কবিতাটি হস্তগত করেন।'

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কবিতাটি গদ্যে অনুবাদ করেন। যেমন তিনি কাব বিন মুহাম্মদ এর 'বানত সুআদ' এর অনুবাদ করেন। শহীদুল্লাহ্ লেখেন কবিতাটি 'বসীত্ব ছন্দে' রচিত। তিনি লিখেছেন–

ইহার প্রথম চারি পংক্তি এই-

অ মিন তয-/ ক্কুরি যী-/ রানিন বিযী/ সলমী/

www.pathagar.com

ময্ জত দম্/ আন জরা-/ মিন স্মুকলতিম/ বিদমী/
আন্ হব বতির/ রীহু মিন/ তিলকাই কা-/ যিমতিন্/
আও আওমযল্/ বরকু ফী য়্/ যুলমাই মিন/ ইযমী॥

কিন্তু দু:খের বিষয় নজরুল ইসলামের মত কবিত্ব শক্তিতে বলীয়ান না হওয়ার কারণে তিনি ঐ আরবি ছন্দে অনুবাদ করার সাহস পাননি। তবু ছন্দে অনুবাদ করতে ব্যর্থ হলেও তিনি গদ্যে যে অনুবাদ করেছেন তাতে কবিতাটির মর্মার্থ আমরা জানতে পেরেছি। সে জন্য শহীদুল্লাহর গদ্য অনুবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম।

- তিনি আলস্নাহ্র দিকে লোকদেরকে আহ্বান করিয়াছেন। অনন্তর যে ব্যক্তি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, সে ধর্ম-রজ্জুকে এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছে, যে তাহা কখনও ছিন্ন হইবে না।
- তিনি অন্যান্য নবীগণকে আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে পরাস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞান ও সম্মানে তাঁহার কাছেও পৌঁছতে পারেননি।
- আল্লাহর পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁহার সমুদ্র হইতে এক অঞ্জলির কিংবা তাহার প্রচুর বৃষ্টিধারা হইতে এক চুমুকের প্রার্থী।
- তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় বিন্দুরূপে কিংবা তাঁহার বুদ্ধির তুলনায় স্বরচিহ্ন রূপে নিজ নিজ স্থানে অবস্থানকারী।
- তিনি অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্তর প্রাণের সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে বন্ধুরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন।
- সৌন্দর্যে তাঁহার কোন দ্বিতীয় ছিল না। তিনি সৌন্দর্যের অবিভাজ্য পরমাণু স্বরূপ ছিলেন।
- নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের উৎকর্ষ এমন অসীম যে কোন বাগ্মী এক মুখে তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।
- যদি তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া মহিমা বিষয়ে তাহা মর্যাদার অনুরূপ হইত, তবে তাঁহার নাম গ্রহণমাত্র জীর্ণ অস্থি পুনরুজ্জীবিত হইত।
- তাঁহার তত্ত্ব অবধারণে সংসার অক্ষম। অনন্তর নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সকলের মধ্যে এমন কেহ দৃষ্ট হয় না, তাহাতে অপারগ নহে।
- যেমন সূর্য দূর হইতে চোখে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং নিকটে চক্ষু ঝলসায়া দেয়, তিনি তদ্রূপ।
- তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানের শেষ সীমা এই যে তিনি মানব অথচ আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।
- সম্মানিত পয়গম্বরগণ যে সব অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই জ্যোতি হইতে তাহাদিগেতে সংক্রমিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য বশীরের কাব্য শহীদুল্লাহ কাব্যছন্দে অনুবাদে ব্যর্থ হলেও কবি রুহুল আমীন খান এটিকে কাব্যছন্দে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন। মূল কবিতার সমান সঙ্গীত-সুষমা এতে হয়ত পূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়নি, তবু দুধের শাধ ঘোলে মেটানোর মত মূল

www.pathagar.com

কবিতার চমৎকারিত্ব এতে কিছুটা ছায়াপাত করেছে বলে তাঁর অনুবাদের কিয়দাংশ এখানে উদ্ধৃত হল–

অন্ত আদি সব উপাদান
পবিত্র যাঁর পূর্ণ নূরে
আবির্ভাবে সেই নায়কের
লাগলে চমক বিশ্বজুড়ে।
উঠলো কেঁপে ইরাক ভূমি
রইল না আর বাকি বুঝার
মঞ্চে হাজির ন্যায়ের রাজা
সময় খতম অগ্নি পূজার।
ধরলো ফাটল খসরু রাজার
বালাখাবার উচ্চশিরে
লাগালো বিবাদ সৈন্যদলে
এলো না আর শান্তি ফিরে।
সেই বেদনার দীর্ঘশ্বাসে
নিভলো পূজার বহ্নিশিখা
শুকিয়ে গেলো ফোরাত নদীর
মলিন ধারা চলন্তিকা।
সাওয়া হ্রদের অম্বুরাশি
শুষ্ক হল সেই বেদনায়
জলকে চল পিয়াসু দল
ফিরে গেল ভগ্ন হিয়ায়।
অগ্নি যেনো মলিন হলো
সলিল পেল রূপ আগুনের
সেই বিষাদে সর্বব্যাপী
বইলো তুফান ইনকিলাবের।
জানিয়ে দিল জ্বিনেরা তাঁর
আবির্ভাবের খোশ খবরি
ছড়িয়ে গেল সেই বারতা
ত্বরিৎ বেগে ভুবন ভরি।

আরবিতে শুধু নয় ফারসি কাব্য সাহিত্যের সব শ্রেষ্ঠ কবিরাই রাসূল [সা]-এর উপর প্রশস্তিধর্মী বহু কবিতা লিখেছেন। যাঁদের মধ্যে আছেন ফেরদৌসী, সাদী, খৈয়াম, রুমী, হাফিজ, আত্তার প্রমুখ।

বলা বাহুল্য যদিও রাসূল [সা]-এর গুণকীর্তনে এশিয়া, আফ্রিকার কবিদের অংশভাগ বেশি। তবু এ সীমার বেষ্টনী ছেদ করে তাঁর মহিমা পাশ্চাত্যের প্রাচীরে গিয়ে আঘাত হেনেছে। এবং ফ্রান্স, রুশ জার্মান, ইতালির কাব্য সাহিত্যের বেশ কিছু কবি তাঁর মহিমাকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। রুশ সাহিত্যের টলস্টয় ও পুশকিন যেমন ইসলামের সাথে রাসূল [সা] এর প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন তেমনি জার্মান মহাকবি গ্যেটে দেখিয়েছেন জার্মান সাহিত্যে। ইংরেজি সাহিত্যে Paradise lost লিখতে গিয়ে মিলটন এবং Revolt of Islam লিখতে গিয়ে শেলী ইসলামের সাথে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে অদৃশ্য রসূলবন্দনায় শরিক হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। খ্রিস্টান জগতের সঙ্গে ইসলামের অযৌক্তিক ঈর্ষাকাতর বৈরিতা থাকলেও তাদের হৃদয়ান্তরালে ইসলামের মানবতাবাদের এবং সাম্যবাদের চেতনা যে ভেষজের ওষুধের মত কাজ করেছিল বিজ্ঞ মনীষীরা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু যে বিষয় এই প্রবন্ধের মূল সে সম্বন্ধে আমি এখনও কোন বাক্য উচ্চারণ করিনি। আমরা এখন সে দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে চাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোটা বিশ্বে কমিউনিজম দারুণ প্রতাপে বিস্তৃত হতে শুরু করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দর্শনে মেধাবী বহু শিক্ষিত তরুণ আকৃষ্ট হন। বিশ্ব সাহিত্য এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ইসলাম পৌত্তলিকতা বিরোধী সংগ্রামে জয়ী হয়েও তার সম্পূর্ণ বিজয় উৎসব পালনে পরিণত করার আগে বস্তুবাদী দর্শন তার সামনে হিমালয় পর্বতের

www.pathagar.com

বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়। আল্লাহ-পন্থী সাম্যবাদী দর্শনের সঙ্গে সংঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় নিরাল্লাহ্‌বাদী কমিউনিজমের দর্শন। উভয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল। বিশ্বে সাম্যবাদী পুঁজিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইসলাম যেহেতু আল্লাহবাদী চেতনার সাহায্যে নেমেছিল তাই কূটনীতির অস্ত্র প্রয়োগ করতে আল্লাহবিরোধী বা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কমিউনিজম ভিন্নরূপে ইসলামের বিরুদ্ধে এক কৌশলী যুদ্ধ শুরু করে। এর আওতায় পড়ে যায় উপমহাদেশের মুসলমানরা। তারা শুধু অস্তিত্ব রক্ষায় নিরীশ্বরবাদী সমাজতান্ত্রিক দর্শন নয়, পৌত্তলিক এবং অর্ধপৌত্তলিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হয়। ইসলাম যে তাদের শক্তিঅস্ত্র এটা কেউ কেউ অনুভব করলেও উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হালী ও ইকবাল এটা যেমন অনুভব করেছিলেন তেমনি বাংলা সাহিত্যে এটা অনুভব করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর মানসিক অঙ্কে বুঝেছিলেন, 'হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি!' তিনি এটাও জেনেছিলেন ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ [সা] অভিন্ন সত্তা। তাই তিনি ইসলাম বন্দনার সঙ্গে রাসূল [সা] এর বন্দনা শুরু করেন।

মধ্যযুগে পুঁথি সাহিত্যে রসূল-বন্দনা ছিল। কবি যয়নুদ্দীনের 'রসূল বিজয়', সৈয়দ সুলতানের 'শবে মেরাজ', 'ওফাতে রসূল' এবং নবী বংশ তার স্বাক্ষর। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল ইসলাম যে মুহম্মদ [সা] বন্দনা, মোস্তফা বন্দনা শুরু করেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। নজরুল-পূর্ব আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে নবী মুহম্মদ বন্দনা শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে মীর মশাররফ হোসেন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, শেখ ফজলল করীম, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ দাদ আলী প্রমুখ প্রতিভা-উস্কানো ভূমিকা রেখেছিলেন কিন্তু সে ভূমিকা ছিল কামান, ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, জঙ্গি বিমানের বোমার তুলনায় রাইফেল্‌। নজরুল ইসলামই ইসলামের পতাকা হাতে এসে দাঁড়ালেন আধুনিক যুদ্ধের অস্ত্র ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। তাঁর দেখাদেখি ঘুমন্ত অন্যান্য মুসলিম কবি গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, জসীমউদ্‌দীন, আবদুল কাদির প্রমুখ জেগে উঠলেন। এই ঐতিহ্যের পথ ধরেই ফররুখ আহমদের আবির্ভাব ঘটে। নজরুল ইসলামের অনুসরণে তিনি অনেকগুলো 'নাত' বা রাসূল-প্রশস্তিমূলক গান লিখেছিলেন। যেমন–

১. প্রাণের চেয়ে তুমি আপন- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!
২. তুমি যে রূহ মখলুকাতের- 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহু!
৩. শ্রেষ্ঠ তুমি সৃষ্টি খোদার, রাহমাতুল্লিল আলামিন;
৪. বিশ্বনবীর স্মরণে আজ উতল হৃদয়, মন-মদিনা;
৫. নূরের রবি তুমি আমার নবী কামলিওয়ালা;
৬. জাহাঁ রওশানস্তআজ জামানে মুহাম্মদ।
৭. হে আখেরি নবী তোমার;
৮. শেষ হলে কাজ এই দুনিয়ায়, জানাও নবী আলবিদা;
৯. তোমার ধ্যানে আশিক হৃদয় রয় যে নবী মুস্তফা।
১০. তোমার প্রাণের খোশ্‌বু আসে স্মৃতির ঘন বন থেকে।

www.pathagar.com

১১. 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা,
১২. রাসূল তুমি আল্লাহ পাকের মুহাম্মদু রাসুলুল্লাহ।

কিন্তু যে রাসূল-বন্দনা লিখে ফররুখ প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেন সেটি একটি তিন শ' লাইনের কবিতা 'সিরাজাম মুনীরা'। সম্ভবত এই নামে একটি সম্পূর্ণ কাব্য রচনা তার মূল পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ কবিতায়, যদিও এটি নজরুল ইসলামের 'মরু ভাস্কর'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফররুখ তাঁর ইসলামের ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাস জ্ঞানের এক আলোকোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এ কবিতায় ইসলামের জীবন-দর্শনের সঙ্গে রাসূল চরিত্র অপরূপ সৌন্দর্যে রূপায়িত হয়েছে। এখানে কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল–

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাত রঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হয়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালি আলোয় শ্বাপ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
স্থির বিদ্যুৎ আভাতরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।
হে অচেনা পাখি কোন আকাশের গভীরতা হতে এসেছ উঠি?
তোমার পক্ষ সঞ্চারে ভাষা-ভাবের কুসুমে উঠিছে ফুটি;
তোমার জরিন জরির ফিতায় নিখিল মানস করো জরিপ
কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ।

একথা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে রাসূল [সা]-এর আবির্ভাব শুধু আরব বিশ্বের জন্য হয়নি গোটা বিশ্বের জন্য হয়েছিল। তার জন্য শুধু প্রতীক্ষারত ছিল না মক্কা বা মদিনা, গোটা দুনিয়া ছিল তার জন্য প্রতীক্ষারত। কেননা তখন সারা জাহানে পাশবিকতা, পাষণ্ডতা, অমানবিকতা এমন একটা রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে সে অন্ধকার রাসূল-সূর্যের আলো ছাড়া অন্য কিছুতে দূর করা সম্ভব ছিল না। এ অবস্থার বর্ণনা 'মোস্তফা চরিত্র'-এ আকরম খাঁ এইভাবে দিয়েছেন। তিনি 'শেষ নবী আরবে আসিলেন যেন?' এই শীর্ষ নামের ভূমিকায় লিখেছেন–

'অন্ধকার যখন পূর্ণ পরিণত হইয়া পাপের সকল বিভীষিকা লইয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিল- যখন শয়তানের তাণ্ডব লীলায় জগতের প্রত্যেক মহাদেশ অতি জঘন্যভাবে কলঙ্কিত ও কলুষিত হইতেছিল... সেই সময় খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মানবের এই শোচনীয় অধ:পতন এবং ধর্মের এই মর্মন্তুদ গস্নানি দর্শন করিয়া স্বর্গের সিংহাসনে আল্লাহর আরশ প্রেমের অভিনব পুলকে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। ... বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে, কল্যাণের জীবনের... পুণ্য পিযূষধারা প্রবাহিত করার জন্য সঙ্কেত করিতেছিল।

এই ভাবের বন্যায় ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য সেই করুণাময়ের ন্যায়দৃষ্টি আরবের ওপরই নিপতিত হইল। কারণ জগতের ভাবী ত্রাণকর্তা, যুক্তিদাতা ও শক্তিকর্তার জন্য আরবই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান ছিল। আরব ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাঁহার অবির্ভাব হইলে এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারিত না।'

www.pathagar.com

এই অতি ভয়ঙ্কর অবস্থার চিত্র নজরুল তাঁর 'মরু ভাস্কর'-এ এইভাবে এঁকেছেন–

এমনি আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয় রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসালীন।
পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার আশীবিষ ফণাতলে
ধরণীর আশা যেন ক্ষীণজ্যোতি মানিকের যত জ্বলে।
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে বরণ, নখর-দক্ষ ক্ষত
কাঁদিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু!...
এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন 'জজিরাতুল আরবে'।

এই অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি চাচ্ছিল। এমন সময়ে রাসূল [সা]-এর আবির্ভাব হয়। এবং শুধু আরব বিশ্ব নয়, বিশ্ব মানবের মুক্তি সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফররুখ তাই লিখলেন–

তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখন হত না লুট,
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পত্রপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলত না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো যা নিখিল।

ফররুখও নবী জীবনী লেখকের মত দুর্যোগ-বন্দী আরবের রূপ অনুপম ভাষায় এঁকেছেন–

মনে জাগে সেই ঘনতর বিষ, বিশ্ব আরব বাতাস মেঘ
অত্যাচারীর হাতে পীড়িতের সে কি দুর্ভোগ কি উদ্বেগ।
মূক পশু সম মার খেয়ে মরে খরিদা গোলাম বাঁদির দল
শিশু হত্যার মৌসুমী যেন, পাপে কেঁপে ওঠে জলস্থল।
শারাব শোনিতে মাতাল মানুষ মানবতাহীন নর্দমায়
পুরুষ মাথায় শুভ্র ললাটে কদর্য রুচি পশুর প্রায়।
নাস্তিকতায় বহুত্ববাদে, ব্যভিচার ছানি পড়েছে চোখে
কাবাগৃহ তারা সাজায়ে পুতুলে অন্ধের মত কপাল ঠোকে,
পথে কেঁদে ফেরে এতিম শিশুরা সর্বহারার বিরাট দল,
জালেমের হাতে মার খেয়ে খেয়ে বৃথা মোছে তারা নয়ন জল।

এই নর্দমা নিমজ্জিত কর্দম পথে লিপ্ত মানব জাতিকে পাপের গহ্বর থেকে টেনে তুলতে প্রয়োজন ছিল রাসূল [সা]-এর মত মহানবীর। আর ফররুখ অসাধারণ দক্ষতায় ছন্দে ও ভাষায় সেই বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন তাঁর
'সিরাজাম মুনীরা'য়। দু:খের ব্যাপার নজরুলের উত্তরাধীকারী হিসেবে যে ঐতিহ্যের রূপায়ণ ও দায়িত্ব পালনে ফররুখ অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন সে পথে বিচরণের আকাঙ্ক্ষিত পথিকদের তেমন উদ্ভব আজও ঘটেনি। ■

www.pathagar.com

সাহিত্য-চর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলায় আমরা যাকে সাহিত্য বলি, আরবীতে তা "আল-আদাব"। তবে "আদাব" শব্দটি "সাহিত্য" থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। সাহিত্য বলতে যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ-অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায় এমন শিল্পোৎকর্ষ চমৎকার কথামালা বুঝায়, তাহলে 'আদাব' দ্বারাও তা বুঝায়। তবে 'আদাব-এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু ভাবও রয়েছে। আর তা হলো– শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নৈতিকতা ইত্যাদি। জাহিলী যুগের আরবী সাহিত্যে 'আদাব' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। তেমনিভাবে আল-কুরআনেও শব্দটি নেই। তবে এ অর্থের ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহর [সা] হাদিসে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, তাঁর অনুপম কথামালা, বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন, উন্নতমানের আচার-আচরণ, আদব-অভ্যাস, চাল-চলন ইত্যাদি দেখে সাহাবীরা অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, আপনি এসব কোথা থেকে লাভ করেছেন? জবাবে তিনি বলেন :

'আমার রব, আমার প্রভু আমাকে এ আদব শিখিয়েছেন। সুতরাং তিনি আমাকে সুন্দরভাবেই শিখিয়েছেন।' এখানে শব্দটি শিক্ষাদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর [সা] আরেকটি বাণীতে এসেছে :

'পৃথিবীতে এই কুরআন হলো আল্লাহর শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমাবেশ স্থল। সুতরাং এ সমাবেশ স্থল থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।'

হযরত আলীর [রা] একটি বাণীতে এভাবে এসেছে :

'আমাদের বনু উমাইয়্যা ভাইয়েরা হলেন খাদ্য-খাবারের দিকে আহ্বানকারী।' 'আদাবাতুন' এর বহুবচন যার অর্থ খাদ্য-খাবার সজ্জিত দস্তরখানের দিকে আহ্বানকারী।

শব্দটি রাসূলুল্লাহ [সা] ও সাহাবীদের যুগে পরিচিত ছিল। তবে আধুনিক যুগে প্রায় দেড়শ' বছর পর্যন্ত শব্দটির অর্থের বিবর্তন ঘটতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, উন্নত নৈতিকতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আধুনিককালেও শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহার হয়। সাহিত্যের প্রতিশব্দ হিসেবে "আদাব" এখন সর্বজন স্বীকৃত পরিভাষা।

সাহিত্য চর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ইসলাম পূর্ব আরবের সাহিত্য ও সাহিত্য চর্চার অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। সাহিত্যকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। গদ্য ও পদ্য। ছন্দ ও অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত নয় এমন শিল্প-মানসম্পন্ন কথাকে গদ্য বলে। আর যাতে ছন্দ ও অন্ত্যমিল থাকে তাকে পদ্য বলে। জাহিলী যুগের আরবরা রাজনৈতিক ও ব্যসায়িক কাজ-কর্মে লেখার ব্যবহার করেছে। আল-জাহির বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ লিখে রাখতো। আর এই লিখিত চুক্তিসমূহকে তারা 'মুহারিকু' বলতো।[৪] কবি আল-হারিছ ইবনে হিল্লিযা [হি. পৃ. ২৪/খ্রি. ৫৮০]-এর মু'আল্লাকায় এই 'আল-মাহরিক'-এর উল্লেখ দেখা যায়।[৫] তবে কোনভাবেই তারা এই গণ্ডির বাইরে নির্ভেজাল সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে আসেনি। সেই লেখা ছিল অতি সাধারণ ও সাদামাটা মানের। তাতে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণ হতো। তা পূরণ হবার পর তাদের লেখাও শেষ হয়ে যেত।[৬] তবে তাদের জন্য যতটুকু দাবি করা যায় তা হলো তাদের যথেষ্ট 'আমছাল' [প্রবাদ-প্রবচন] আছে। তারা এর যথেষ্ট প্রয়োগ করেছে। আর এর পাশাপাশি তাদের ছিল খুতবা [বক্তৃতা-ভাষণ] দানের রীতি। এ কারণে তাদের অনেক খুতবা ছিল। জাহিলী আরবের আমছালের একটি অংশ অবিকৃত অবস্থায় গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। আর তাদের খুতবা, তাদের অল্পকিছু ছাড়া প্রায় সবই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সাহিত্যের অপর শাখাটি পদ্য। পদ্য বা কাব্যের ক্ষেত্রে খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী।

অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষা ও বাগ্মিতায় জাহিলী আরব যে অতি উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার চিত্র পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের পরিচয় দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেন :

'আর এমন কিছু লোক যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করবে।

www.pathagar.com

আর সে সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে লোক।'

আল-কুরআনের আরও বহু আয়াতে তাদের ঝগড়া-বিতর্ক ও বাকপটুতার চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন :

'যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা শুনুন।'

'অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়।'

'তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হলো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।'

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের পরিচয় দিয়েছেন বর্ণনা, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল গ্রন্থ বলে। এতে সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করে সুরন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। এ কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে "আল ফুরকান" আল্লাহ এর ভাষাকে স্পষ্ট আরবী বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই আল কুরআনের মতো এত উন্নতমানের ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর গ্রন্থ যে জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল, নিশ্চয় তারা এর ভাষার সমঝদার ছিল এবং তাদের ভাষা ও বর্ণনা ক্ষমতাও উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গিয়েছিল। একথা আল-জাহির [মৃ. ২৫৫/৮৬৯] বলেছেন। কথাশিল্প ও বাগ্মিতায় তাদের যে প্রচন্ড দখল ছিল, তার আরো একটি প্রমাণ এই যে, আল-কুরআনের মুকাবিলা করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে।[১২] আর এটাও তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বাগ্মিতা ও বর্ণনা ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। তেমনিভাবে শব্দ ও অর্থের মান ও গুরুত্বের পার্থক্য নিরূপন এবং শব্দের ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা কতটুকু তা যে তারা বুঝতো, বিভিন্ন বর্ণনায় তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, আল-ওয়ালীদ ইবনে আল-মুগীরা ইসলামের একজন প্রবল শত্রু ছিল। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মুখে আল-কুরআনের একটি আয়াতের তিলাওয়াত শুনে বলেছিল।[১৩]

'আমি মুহাম্মাদের নিকট কিছু কথা শুনেছি। তা না মানুষের কথা, না জিনের। সে কথার আছে চমৎকার এক স্বাদ, আর তাতে আছে এমনই প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য, মনে হয় যেন এক ধরনের যাদু। তার উপরিভাগ যেমন ফলদায়ক, নিম্নভাগেও তেমনি প্রচুর পানীয়।'

আল-ওয়ালীদের এ মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় অলঙ্কারমন্ডিত বিশুদ্ধ ভাষায় তারা যেমন সমঝদার ছিল তেমনি সে ভাষায় তারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ও অভিব্যক্তিতেও সক্ষম ছিল।

বানু তামীমের একটি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ও বক্তা 'আমর ইবন আল-আহ্তাম্মের ভাষণ শুনে তাঁর বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে রাসূল [সা] মন্তব্য করেন ।[১৪]

'নিশ্চয় কিছু কিছু বয়ান ও বাগ্মিতায় যাদু আছে।'

www.pathagar.com

মোটকথা, প্রত্যেক জাতির কোন না কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত গুণ থাকে। যখন সেই জাতির কথা কোথাও আলোচনা হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মানুষের মন চলে যায়। আরবদের সম্পর্কে যখন কোন আলোচনা হয় তখন সর্বপ্রথম তাদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা মানুষের মনে জাগে তা হলো তাদের ভাষার জোর ও বাগ্মিতা শক্তি। প্রাচীন আরব জাতি অন্য আরব জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি 'আল-আজম' শব্দটি ব্যবহার করতো। এর দ্বারা অনারবদেরকে বোবা অথবা মনের ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে অক্ষম বলে চিহ্নিত করতো।[১৫] এ থেকে অনুমান করা যায়, তাদের নিকট বাগ্মিতার স্থান কি ছিল এবং তা নিয়ে তাদের ছিল কি পরিমাণ গর্ব ও অহংকার।

ইসলাম পূর্ব আমলের আরবরা ছিল একটি কাব্য-রসিক জাতি। তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাদের নিকট কবির স্থান ছিল সবার উপরে। তারা কবি ও নবীকে একই কাতারের মানুষ বলে মনে করতো। তাইতো তারা রাসূলুল্লাহকে [সা] কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল। ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী [মৃ. ৪৫৬/১০৬৪] জাহিলী আরবে কবির স্থান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :[১৬]

'আরবের কোন গোত্রে যখন কোন কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন তখন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এসে সেই গোত্রকে অভিনন্দন জানাতো। নানা রকম খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো মেয়েরা সমবেত হয়ে বাদ্য বাজাতো। পুরুষ ও শিশু-কিশোররা এসে আনন্দ প্রকাশ করতো। এর কারণ, কবি তাদের মান-মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং নাম ও খ্যাতির প্রচারক।'

প্রাচীন আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, জাহিলী আরবে যেন কাব্য চর্চার প্লাবন বয়ে চলেছে। অসংখ্য কবির নাম পাওয়া যায় যা গুনেও শেষ করা যাবে না। ইবনু কুতায়বা (মৃ.২৭৬/৮৮৯) বলেছেন : [১৭]

'কবিরা– যারা কবিতার জন্য তাদের সমাজে ও গোত্রে জাহিলী ও ইসলামী আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাদের সংখ্যা এতো বেশি যে কেউ তা শুমার করতে পারবে না।'

তিনি আরও বলেছেন :

রাসূলুল্লাহর [সা] খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক [রা] বলেন :

'রাসূলুল্লাহ [সা] যখন আমাদের এখানে [মদিনা] আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা বলা হতো।'

আরবদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির এমনি এক পর্যায়ে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে এবং আল কুরআন অবতীর্ণ হয়। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, তখন আরবী সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় শাখার ব্যাপক চর্চা হচ্ছিল। গদ্যের কোন লিখিত রূপ না থাকলেও

www.pathagar.com

মৌখিক গদ্য তথা খুতবা [বক্তৃতা-ভাষণ] যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং গোটা আরবে এর ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। জাহিলী যুগের যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলাম নতুনত্ব আনে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কবিতা ও খুতবা। এ দু'টি জাহিলী যুগেরই শিল্প। ইসলাম তা বহাল রেখে তার আরও উন্নতি ও ব্যাপ্তি ঘটায়। এ যুগে দাওয়াতী কার্যক্রম, বিজয় অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিতে মুসলমানদের খুতবার বেশি প্রয়োজন থাকায় উন্নতির ক্ষেত্রে খুতবা কবিতাকে ডিঙ্গিয়ে যায়। খুতবা তাদের নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ খুতবার প্রতি মানুষ বিরূপ হয়ে উঠতে পারে আল-কুরআনে তেমন কোন কথা আসেনি, যেমন এসেছে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে।[১৮]

জাহিলী যুগের লোকদের অতিমাত্রায় কবিতার প্রয়োজন থাকায় কবিকে খতীবের [বক্তা] ওপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিত। কিন্তু ইসলামী যুগে দাওয়াতী কাজের জন্য, ব্যক্তি-সাহসকে জাগিয়ে তোলার জন্য, বিভিন্ন দল ও মতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং শত্রুকে ভয় দেখানো ও বিতাড়নের জন্য খুতবার বেশি প্রয়োজন হওয়ায় তাদের নিকট কবির চেয়ে খতীবের মর্যাদা বেড়ে যায়।[১৮] সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, জাহিলী যুগের তুলনায় ইসলামী খুতবার শুধু উৎকর্ষই হয়নি, বরং তা নতুন পথও পেয়ে যায়। ইসলাম খুতবার গুরুত্ব বাড়ানোর সাথে সাথে বিষয়বস্তু ও রীতি পদ্ধতিতেও নতুনত্ব আনে।

এর সাথে এ সত্য স্বীকৃত যে, সকল চিন্তা ও ধর্মীয় আন্দোলন সব সময় খুতবার কাছে ঋণীই থেকে গেছে। বক্তাসুলভ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী দাঈ [আহ্বানকারী] চিন্তা ও ধর্মের জগতে মাথার মুকুট হয়ে রয়েছেন। সকল নবী-রাসূল এবং সততা ও সত্যের দিকে সকল আহ্বানকারী নিজ নিজ মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিতকরণে এবং সত্যের আওয়াজকে তাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছানোর জন্য সর্বদাই খুতবা ও বয়ানের প্রয়োগ করেছেন।

ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশমূলক সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক, তথা জুম'আ, ঈদ ও হজ্জের খুতবা ছাড়াও এ যুগে অন্য যে সকল খুতবা আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে জিহাদের খুতবা, বাহাছ-মুনাজারার খুতবা, বিজয়ের খুতবা এবং শোকজ্ঞাপক খুতবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক খুতবা, প্রতিনিধি মিশনের খুতবা ছাড়াও আরও একপ্রকার অতি গুরুত্বপূর্ণ খুতবার আত্মপ্রকাশ ঘটে এ যুগে, যাকে খিলাফত ও বিলায়ত-এর খুতবা নামে অভিহিত করা হয়। এটি হলো খলীফা নির্বাচনের পর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর প্রথম নীতি-নির্ধারণী ভাষণ। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তার ভাষণও এর অন্ত র্ভুক্ত।

ইসলামী যুগের খতীবদের [বক্তা] সংখ্যা এতো বেশি যে, খুতবার ইতিহাসের অন্য কোন যুগের আধিক্যের সাথে তুলনীয় নয়। এ সকল খতীবের ইমাম হলেন সায়্যিদুল মুতাকাল্লিমীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]। কিয়ামতের দিনও তিনি হবেন আম্বিয়ায়ে

www.pathagar.com

কিরামের খতীব।[২০] তাঁর পরের স্থানে হলেন খতীবদের বিরাট একটি দল। তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন 'আলী ইবন আবী তালিব [রা]। তারপর আবু বকর, 'উমার ও উসমানের [রা] নামগুলো আসে। আবুল হাসা আল-মাদাইনী বলেন : [২১]

'আবু বকর খতীব ছিলেন, 'উমার খতীব ছিলেন এবং 'উসমানও খতীব ছিলেন, 'আলী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খতীব।' এভাবে এ যুগে অসংখ্য তুখোড় খতীবের নাম ও তাদের খুতবা আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলনসমূহে দেখা যায়। পুরুষ খতীবদের পাশাপাশি অসংখ্য মহিলা খতীবের নামও পাওয়া যায়। যেমন উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা [রা], উম্মুল খায়র আল-বারকিয়্যা, আয-যাকারা' বিনত 'হাদী, ইকরাশা বিনত আল-আতরাশ [রা] ও আরও অনেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাহিলী যুগে কোন লিখিত গদ্য ছিল না। ইসলামী যুগে শিক্ষার প্রসার হওয়ায় এবং প্রয়োজনের তাগিদে পত্র-সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। এ পত্র-সাহিত্যের সূচনা করেন রাসূল [সা], পরবর্তীকালে খলীফাগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাবাহিনীর কমান্ডারগণ নানা ধরনের পত্রের আদান-প্রদান করেছেন, এসব পত্রেরও একটা সাহিত্যমান ও সাহিত্য মূল্য আছে।

কবিতা ছিল জাহিলী আরববাসীর ভূষণ। সে যুগে আরবী কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ইসলামী যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ [সা] নিজে কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা শুনেছেন, কবিদেরকে উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ [সা] ইনতিকালের পর তাঁর সুযোগ্য খলীফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। এ যুগেও কবিতা চর্চায় তেমন ভাটা পড়েনি। খুলাফায়ে রাশিদীন সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রাসূলুল্লাহর [সা] সাহাবীরা তো মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির আসর বসাতেন।[২২] ইসলামী যুগে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে উভয় পক্ষে অসংখ্য কবি অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা ও শত্রুর উদ্দেশে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকে কবি ছিলেন, সাইদ ইবন আল-মুসায়্যিব বলেন : [২৩]

'আবু বকর [রা] কবি ছিলেন। উমার [রা] কবি ছিলেন। আর 'আলী [রা] ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।' সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে হযরত আবুবকরকে [রা] একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কবি নাবিগা আয-যুব-ইয়ানীকে জাহিলী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন এবং বলতেন : তাঁর কবিতা, শিল্পকুশলতা ও ছন্দ মাধুর্য সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বেশি সাবলীল।[২৪]

দ্বিতীয় খলীফা 'উমার [রা] সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি আছে, কোন প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং তিনি নিজেও কোন সময় সেসব কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন। তিনি বসরার শাসনকর্তা আবু মূসা আস-আশ'আরীকে [রা]

www.pathagar.com

নির্দেশ দেন : 'তুমি তোমার ওখানকার লোকদেরকে কবিতা শেখার নির্দেশ দাও। কারণ, কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। 'তিনি আরও বলতেন :[২৫] তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীর চালনা শেখাও। তাদেরকে ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দাও। আর তাদেরকে সুন্দর সুন্দর কবিতা বলে শোনাও। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃ. হি. ২৩২) বলেন, 'তিনি যে কোন ধরনের ঘটনা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হলেই সে সম্পর্কে কবিতার দু'একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিতেন।'[২৬] আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে তাঁকে সে যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচক গণ্য করা হয়েছে। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি রুচির ভিত্তিতে নয়, বরং যুক্তির ভিত্তিতে সমালোচনা করেছেন, কবি যুহায়রকে তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন। শুধু এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সংগে তার কারণও বলে দিয়েছেন। যুহায়র সম্পর্কে তিনি বলতেন :[২৭] তিনি এক কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে ফেলতেন না। জংগী ও আশোভন কথাও এড়িয়ে চলতেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন। তাঁর কবিতায় কোন অতিরঞ্জন নেই। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।' তিনি এবং তাঁর সংগী-সাথীরা সমবেত হয়ে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতেন।[২৮]

'উমার [রা] কুরআনের আয়াতের অর্থ বুঝতে কবিতার শরণাপন্ন হতেন। একবার তিনি মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে সূরা আন-না হলের ৪৭তম আয়াত- পাঠ করেন। তারপর উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের নিকট আয়াতে উল্লেখিত শব্দটির অর্থ জানতে চান। সাহাবায়ে কিরাম সকলে চুপ থাকলেন। তখন হুযায়ন গোত্রের এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা আমাদের উপভাষা। আর এর অর্থ অল্প-অল্প নেওয়া। 'উমার [রা] বৃদ্ধের নিকট জানতে চাইলেন, আরবরা কি তাদের কবিতা থেকে অর্থ জানতে পারে? অর্থাৎ আরব কবিরা কি তাদের কবিতায় এ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ আমাদের কবি আবু কাবীর আল-হুযালী তার উষ্ট্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি শ্লোকে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর বৃদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান। 'উমার [রা] তখন বলেন : 'তোমরা তোমাদের দীওয়ান সংরক্ষণ করে রাখো, তাহলে তোমরা আর গোমরাহ্ হবে না।'[২৯]

ইসলামের চতুর্থ খলীফা 'আলী [রা] ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। সে যুগের আরব কবিদের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। 'দিওয়ানে 'আলী' নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থটি আজও তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক। কেবলমাত্র সাহিত্যিক-সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্বের কারণে তিনি জাহিলী যুগের ভোগবাদী কবি ইমরুল কায়সকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন।[৩০]

www.pathagar.com

একবার যিয়াদ তাঁর এক ছেলেকে 'আমীর মু'আবিয়ার [রা] নিকট পাঠালেন। মু'আবিয়া তার জ্ঞান-গরীমা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। দেখলেন, ছেলেটির সব বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। সবশেষে তিনি তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বলেন। এবার ছেলেটি অক্ষমতা প্রকাশ করলো। তখন মু'আবিয়া [রা] যিয়াদকে লিখলেন : তুমি তোমার ছেলেকে কবিতা শেখাওনি কেন? কবিতা শিখলে সে অবাধ্য থাকলে বাধ্য হবে, কৃপণ থাকলে দাতা হবে এবং ভীরু থাকলে সাহসী হয়ে যুদ্ধ যাবে।'[৩১]

রাসূলুল্লাহর [সা] খলীফাগণ ছাড়াও অন্যান্য সাহাবীরা কবিতা চর্চা করতেন। নিজেরা কবিতা শিখতেন এবং অন্যদেরকে শেখার নির্দেশ দিতেন। হযরত 'আইশা [রা] বলেন : 'তোমরা তোমাদের সন্তনাদেরকে কবিতা শিক্ষা দেবে। এতে তাদের ভাষার আড়ষ্টতা দূর হয়ে সহজ সাবলীল হবে।'[৩২] এমন কি রাসূলুল্লাহর [সা] সাহাবীদের এমন কাউকেও পাওয়া মুশকিল যিনি কোন কবিতা রচনা করেননি, অথবা কখনো কবিতা আবৃত্তি করেননি।'[৩৩] হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস বলতেন, পবিত্র কুরআন পাঠ করে যদি কোথাও বুঝতে না পার তাহলে তার অর্থ আরবদের কবিতার মাঝে সন্ধান কর।[৩৪]

এভাবে সে যুগের আরবী কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। মূলত সাহাবায়ে কিরামের মূল আদর্শ ছিল আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহর [সা] সুন্নাহ। এ দু'টির ভিত্তিতে যেমন তাঁরা জীবন পরিচালনা করেছেন, তেমনিভাবে এ দু'টির আলোকে তারা সাহিত্য চর্চাও করেছেন। তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে সাহিত্য চর্চার ব্যাপারে কোথাও তাঁদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না। বরং ব্যাপকভাবে তাঁরা এ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। ■

তথ্যসূত্র

১. আহমাদ শায়িব, উসূল আন-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ৪
২. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়া, (আদব)
৩. প্রাগুক্ত
৪. আল-জাহিজ, কিতাবুল হায়ওয়ান, ১/৬৯
৫. দিওয়ানু শি'র আল-হারিছ ইবন হিল্লীয়া, পৃ. ২৩-৫৮
৬. মাসাদির আশ-শি'র আল-জাহিলী, পৃ. ২৩-৫৮
৭. আল কুরআন, ২ : ২০৪
৮. প্রাগুক্ত, ৬৩ : ৪
৯. প্রাগুক্ত, ৩৩ : ১৯
১০. প্রাগুক্ত, ৪৩ : ৫৮
১১. আল-জাহিজ, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৮
১২. আল-কুরআন, ১০ : ৩৮; ১১ : ১৩; ১৭ : ৮৮
১৩. আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, ৪/৬৪৯; ড. শাওকী দায়ফ, আল-বালাগা : তাতাওর ওয়া তারীক, পৃ. ৯; মুহাম্মদ 'আলী আস-সাবুনী, আত-তিবয়ান ফী 'উলুম আল-কুরআন, ১০২, ১০৩
১৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৫৩, ৩৪৯; আবু ইসহাক আল-হাসারী, সাহরুল আদাব, ১/৫

www.pathagar.com

১৫. আল-বায়ান ৪/২৭; ড. জহুর আহমাদ আজহার, ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ৯৮
১৬. ইবন রাশীক, কিতাবুল উমদা, ৭/৭৮
১৭. ইবনু কুতায়বা, আশ-শি'রু ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ৩
১৮. আল-কুরআন, ২৬ : ২২৪
১৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ২/৯৮; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-আরবিয়্যাহ, ১/১৮৭
২০. মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৩৭-১৩৮
২১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৩৫৩
২২. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, ২/৪৫
২৩. ইবন 'আবদি রাব্বিহি, আল-ইকদ আল-ফারীদ, ৫/২৮৩
২৪. ড. 'আবদুল মুনইম খাফাজী, মুকাদ্দিমা : নাক্দ আশ-শির, পৃ. ২৩
২৫. আল-'উমদা, ১/১০; হুসন আস-সাহাবা, ১০/২২
২৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, ৫/২৮১
২৭. ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত আশ-শু'আরা'; আল-বাকিল্লানী, ই'জাস আল-কুরআন, পৃ. ১৩৪
২৮. মুকাদ্দিমা : নাকদ আশ-শি'র, পৃ. ২৩
২৯. ইবন মানসুর, লিসান আল-'আরাব-২/১৯৯২; তাজ আল-'আরূস, ৬/১০৬
৩০. মুকাদ্দিমা : নাক্দ আশ-শি'র, পৃ. ২৩
৩১. আল-ইকদ আল-ফারীদ, ৫/২৭৪
৩২. প্রাগুক্ত ৫/২৭৪, ৬/৭
৩৩. প্রাগুক্ত ৫/২৮৩; জুরজী যায়দান-১/১৯২
৩৪. জুরজী যায়দান-১৯২

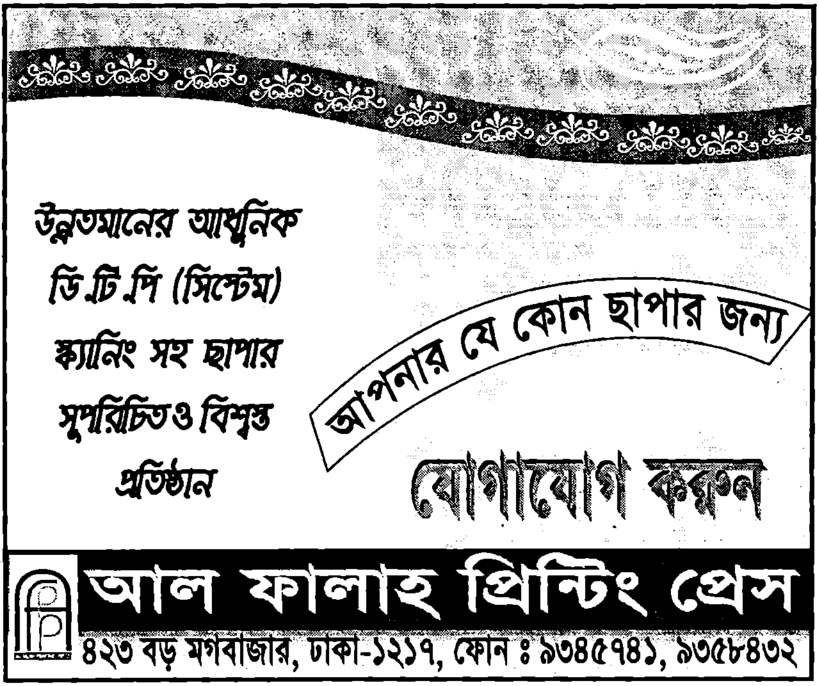

www.pathagar.com

"উদিল আরবে নতুন সূর্য মানব-মুকুট-মণি"

শফি চাকলাদার

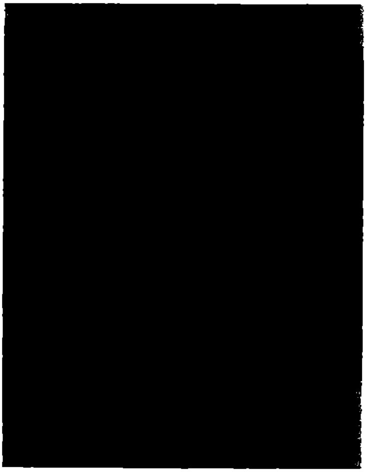

নবী করিম [সা]-এর জীবনী রচনা করার প্রবল ইচ্ছা আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছিল। কাব্যে। শুরুও করেছিলেন। কিন্তু শেষ করতে পারেননি। অনেকটাই করতে পেরেছিলেন। যেটুকু দিয়ে গেছেন বাংলা সাহিত্যের জন্য তা হয়ে থাকবে চির অম্লান। 'মারংরু-ভাস্কর' কবির সেই কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'অবতরণিকা' প্রকাশ পায় ১৩৩৭ এর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সওগাত'-এ। এই গ্রন্থের 'স্বপ্ন' কবিতাটির শেষ ৩৬ লাইন 'জয়তী'তে প্রকাশ পায়। অন্যান্য কবিতাগুলোর প্রকাশকাল জানা না গেলেও নজরুল সুস্থ অবস্থায় এই বিখ্যাত গ্রন্থটির প্রকাশ করে যেতে পারেননি। কারণ অসুস্থতা তাঁকে হঠাৎ করেই কাব্য জগৎ থেকে সরিয়ে নেয়। তাই তাঁর প্রিয় নবী [সা]-এর জীবনী লেখা শুরু করলেও শেষ করা হয়ে ওঠেনি। এই সময়ের মধ্যে যেটুকুই কবি যেভাবে ছন্দ-মহিমায়, শব্দ-চয়ন, বিষয় বর্ণনায় ঐতিহ্য-ধারা তুলে ধরেছেন তা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের জন্য অনবদ্য। অতুলনীয় এবং অসাধারণ। নবী করিম [সা]-এর ওপর যে জীবনী কবি কাব্যে তুলে ধরতে কলম ধরেন- 'মরু-ভাস্কর' নামেই তা পাঠকদের হাতে পৌঁছে।

www.pathagar.com

আর এই 'মরু-ভাস্কর' যখন প্রকাশ পায় ১৩৫৭ সালে তার অন্তত দশ বছর আগে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। 'মরু-ভাস্কর' আর পূর্ণতা পায়নি। আর বাংলা সাহিত্য হারালো নবী করিম [সা]-এর উপর একটি পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ যা হয়ে থাকত চিরকালের জন্য নবী করিম [সা]-এর ওপর শ্রেষ্ঠতম নিবেদন। তথাপি যতটুকু নজরুল তাঁর প্রিয় নবীর [সা] জীবনী কাব্য-কবিতায় দিয়ে গেলেন তা এখনো অমলিন হয়েই আছে। নজরুলের এই অসমাপ্ত নবী [সা] জীবন বিষয়ভিত্তিক চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চারটি সর্গে। প্রথম সর্গ জন্মবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় শৈশব-কাল, তৃতীয় কৈশোর এবং চতুর্থ শাদী মোবারক। আমার এই প্রবন্ধে থাকছে প্রথম সর্গ নিয়ে আলোকপাত। এই প্রথম সর্গে নবী [সা] জীবনের জন্মক্ষণ জন্ম-পূর্ব সময়কে সাতটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন নজরুল। অবতরণিকা [৮৪ লাইন], অনাগত [১৩৪ লাইন], অভ্যুদয় [৬৬ লাইন], স্বপ্ন [৮০ লাইন], আল্লো আঁধারি [৬৬ লাইন], দাদা [৭৪ লাইন] এবং পরভৃত [৯৬ লাইন] নিয়ে শৈশবকালের জন্মক্ষণ, ঐ সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। নবী করিম [সা]-এর আগমনের পূর্বের ঐ স্থানের পরিবেশ, মক্কার সামাজিক অবস্থা, মরুপ্রাকৃতিক অবস্থা, হযরত আমিনার এর গর্ভে যে সন্তানটি আসছে তা নিয়ে কৌতূহল। শিশুর নামকরণ। বিবি হালিমার কথাসহ আবদুল্লাহ, মোত্তালিব নিয়ে পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থার বর্ণনা এসেছে এক এক করে। প্রথম কবিতা 'অবতরণিকা' উঠে এল প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে আজান ধ্বনি-

জেগে ওঠ্ তুই রে ভোরের পাখি/ নিশি-প্রভাতের কবি।
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া/ উদিল আরব-রবি।
ওরে ওঠ তুই নতুন করিয়া/ বেঁধে তোল তোর বীণ্।
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে/ আজান মুয়াজ্জিন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে/ গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম।
ঐ শোন শোন 'সালাতের' ধ্বনি/ 'খায়রুম-মিনান্নৌম'।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন প্রহরটিতে ঐ অঞ্চলে কেমন সাড়া পড়েছিল-

পাহাড়, পর্বত, মরু, গাছ-গাছালি সমস্ত কিছুর মধ্যেই যেন কবি তাঁর প্রিয় নবী [সা]-এর আগমন ধ্বনি শুনতে পেলেন-

বয়ে যায় ঢল, ধরে নাকো জল আজি 'জমজম' কূপে।
'সাহারা' আজিকে উথলিয়া ওঠে অতীত সাগর রূপে।'
পুরাতন রবি উঠিল না আর সেদিন লজ্জা পেয়ে
নবীন রবির আলোকে সেদিন বিশ্ব উঠিল ছেয়ে। [অবতরণিকা]

'মুহাম্মাদ [সা] অবশেষে ধরার ধূলিতে এলেন। নজরুল এই খুশির বার্তাকে শুধু ধরে রাখলেনই না, ছড়িয়ে দিলেন কটি শব্দকে একত্রিত করে সুন্দর ছন্দোময় বাক্য তৈরি করে। বাংলার পদ্মফুলকে উপমা করলেন আরবের মরুভূমে নিয়ে গেলেন-

ধরার পঙ্কে ফুটিল গো আজ কোটি দল কোকনদ
গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব-মধুপ 'আসিল মোহাম্মদ।' [অবতরণিকা]

www.pathagar.com

মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করলেন বিশ্ব নিখিলের জন্য আমি এমন উপহার রেখেছি যার আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে দিক-দিগন্ত। সকল কলুষতা দূর হয়ে যাবে। আদম [আ]-এর বংশে জন্ম নেবেন এমনি একজন মানুষ। ধন্য হবে পৃথিবী–

ধরার সকল ভয়েরে ইথারি পুণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তবে বন্ধু মহিমময়।
মোর সাথে হল ধন্য পৃথিবী'- মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল 'সাল্লাল্লাহু আলায়হিসালস্নাম।' [অনাগত]

'অনাগত' পর্বতে প্রিয় নবী [সা]-এর আগমন পূর্বের অবস্থাটা কিরূপ ছিল তাঁর বর্ণনা আরো পাওয়া যায়। সাগর, আকাশ, বাতাস, মরুভূমি সবই যেন কারো আগমন প্রতীক্ষায়। উৎপীড়িতরা, দাস-দাসীরা, আরব-জাহান অপেক্ষা করছে কারো প্রতীক্ষায়- সে প্রতীক্ষা কার জন্য?

সে বিশ্ব নবী [সা], প্রিয় নবীর [সা] অপেক্ষার পূর্বক্ষণটি নজরুল আঁকলেন এভাবে–

খুঁজিছে রক্ষ বক্ষ পাতালে, খোঁজে মুণি ঋষি ধেয়ানে তায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আপনার মাঝে খোঁজে ধরা তারে সাগরে কাননে মরু-সীমায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে তাহারে, সুখে, আনন্দে, নব সৃষ্টির ঘন ব্যথায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চিরদাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবী কোথায়!

নবী করিম [সা]এর জন্ম ক্ষণটির বর্ণনা কবি ফুটিয়েছেন চমৎকার উপমা টেনে। প্রিয় নবীর [সা] প্রিয় উম্মত নজরুল আবেগে আপ্লুত। জন্মলগ্নটি কল্পনা করে আঁকলেন কাব্য-তুলির স্পর্শে সুন্দরতম বর্ণনা। 'অভ্যুদয়' পর্ব থেকে–

ফুল ফসলের মেলা বসাবার বর্ষা নামার আগে,
কালো হয়ে কেন আসে মেঘ, কেন বজ্রের ধাঁধা লাগে?
এই কি নিয়ম? এই কি নিয়তি? নিখিল-জননী জানে,
সৃষ্টির আগে এই সে অসহ-প্রসব-ব্যথার মানে!

'রবিউল আউয়াল'এর যে দিনটিতে যে ক্ষণটিতে প্রিয় নবী [সা] ধরায় এলেন, তারই ছবি তুলে ধরলেন কাব্য কবিতার চরণে চরণে কবি। শব্দ চয়ন কাব্যিক সুষমা নিয়ে যেমন সুন্দর তাঁর বর্ণাটি তৈরি হল তেমনি আরো অসাধারণ হয়ে ধরা দিল 'স্বপ্ন' পর্বে–

রবিউল আউয়াল চাঁদ-শুক্লা নবমীর তিথিতে

www.pathagar.com

ধেয়ানের অতিথি এল সেই প্রভাতে এই ক্ষিতিতে।
মসীহের পঞ্চশত সপ্ততি এক বর্ষ পরে,
সোমবার জ্যেষ্ঠ প্রথম ধরার মানব-ত্রাণের তরে।
আসিলেন বন্ধু খোদার মহান উদার শ্রেষ্ঠ নবী,
মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্-আরাবি।

প্রিয় নবীর [সা] পিতা আবদুল্লাহ্ প্রিয় নবীর [সা] জন্মের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। পিতৃহীনপুত্র। শোকের সে দৃশ্য সমস্ত পরিবার পরিজনকে যেভাবে ব্যথিত, শোকাভিভূত করে তুলেছিল সেই দৃশ্য সত্যি মর্মে আঘাত হানে। সে দৃশ্য কবির পরশে এভাবে ফুটে উঠেছে–

'আলো আঁধারি' পর্বে–
শুনে হাসি পায় এত শোকে, হায়! বিশ্বের পিতা যার
'হাবিব' বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার।
খোদার লীলা সে চির রহস্যময়–
বন্ধুর পথ এত বন্ধুর হয়!
আবির্ভাবের পূর্বে পিতৃহীন হয়ে বারবার
ঘোষিল সে যেন, আমি ভাই সাথী পিতাহীন সবাকার।

এরপর নবীর [সা] জন্ম হল। আনন্দের মাত্রা যেন তখন তুঙ্গে। পরিবার তথা সারা বিশ্বের আনন্দ যেন ছড়িয়ে পড়ল। শত স্বপ্নের পাখি এসে আকাশে জড় হলো সে আনন্দে শরিক হতে। চাঁদের জ্যোছনা মেখে মেখে ঐ গৃহে; গৃহের আশপাশে এসে বসতে লাগল। ফেরেশতারা সব এসে জড় হয়েছে নীল আকাশ তলে। দাদা মুত্তালিবের স্বপ্ন বুঝি আজ বাস্তবতা পেল। মেঘের পর মেঘ ছায়া করে আছে মাথায় ওপরের আকাশটায়। এতসবের মধ্যে যেন দাদা মুত্তালিবের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলে। পৌত্রকে তখনি কোলে করে ছুটলেন কাবা ঘর পানে। 'দাদা' পর্বে এ দৃশ্যটি যেন তাই প্রকাশ পায়–

পৌত্রে ধরিয়া বক্ষে তখনি আসিলেন কাবা-ঘরে,
বেদী 'পরে রাখি' শিশুরে করেন প্রার্থনা শিশু তরে।
'আরশে' থাকিয়া হাসিলেন খোদা নিখিলের শুভ মাণি'
আসিল যে মহামানব যাচিছে কল্যাণ তারি লাগি।

কুসংস্কার তখন আরব দেশে ছিল। পিতৃহীন কোন শিশুকে কোন ধাত্রী মা কোলে নেয় না। কারণও ছিল। কারণ যে সন্তানের পিতা নেই সে সন্তানকে আদর যত্ন করে বড় করলে তো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। তখন পুরস্কৃত করার রীতি কুসংস্কার ছিল। হালিমা যে অঞ্চলে বাস করতেন সে অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। অনাহার থেকে রক্ষা পেতে চলে এলেন মক্কায়। 'পরভৃত' পর্বে যেন কবি সে কথাই বলে দিলেন–

আসিল মক্কা, যদি পায় হতে কোনো সে শিশুর ধাত্রী মা;

www.pathagar.com

খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, 'আমিনা কোল জুড়ি' চাঁদ-পূর্ণিমা,
কোনো সে ধাত্রী পায় নাই এই শিশুরে হেরিয়া পিতৃহীন–
ভাবিল কে দেবে পুরস্কার এর পালিবে যে ওরে রাত্রিদিন?

বিবি হালিমা [রা] চলে এলেন তাঁর দুর্ভিক্ষ-পীরিত অঞ্চল ছেড়ে। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ চলছিল। নজরুল সে দৃশ্য আঁকলেন 'পরভৃত' পর্বে–

যে বছর হল মক্কা নগরে মোহাম্মদের অভ্যুদয়;
দুর্ভিক্ষের অনল সেদিন ছড়ায়ে আরব জঠময়।
উর্দ্ধে আকাশ অগ্নি-কটাহ, নিম্নে ক্ষুধার ঘোর অনল,
রৌদ্র শুষ্ক হইল নিঝর; তরুলতা শাখা ফুল-কমল।
মক্কা নগরে ছুটিয়া আসিল বেদুইন যত ক্ষুধা- আতুর
ছাড়ি প্রান্তর, পল্লীর বাট খর্জুর বন দূর মরুর।
বেদুইনদের গোষ্ঠীর মাঝে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী বনি- সায়াদ,
সেই গোষ্ঠীর 'হালিমা' জননী দুর্ভিক্ষেতে গণি প্রমাদ।'

অবশেষে হালিমা শিশুকে দেখে আবদার জানালেন তিনি শিশুটির ধাত্রী মা হতে চান। হালিমার আবদার কবুল হলে শিশুটিকে নিয়ে হালিমা তাঁর কুটিরে নিয়ে এলেন।–

আসিল হালিমা কুটিরে আপন সুদূর শ্যামল প্রান্তরে,
সাথে এল গান শুনাতে শুনাতে বুলবুল পথ-প্রান্তরে।
পাহাড়তলীর শ্যাম প্রান্তর হল আরো আরো শ্যামায়মান
উর্ধ্বে কাজল মেঘ-ঘন ছায়া, সানুদেশে শ্যামা দোয়েল গান।

প্রিয় নবীর [সা] শুধু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব থেকে ধাত্রী মা বিবি হালিমার গৃহে গমন পর্যন্ত কিছু কিছু আলোকপাত করলাম। নজরুল কলমে প্রিয় নবীর [সা] যে কোন বর্ণনা হয়ে উঠেছে সর্বোৎকৃষ্ট। আর কোন কবির কলমে এমন সুন্দর করে আসেনি নবী-জীবনের বর্ণনা। এমন উপমারাজি এমন শব্দ চয়ন এমন বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেন আরো নিবিড় করে পাওয়া যায়। নবীজীর [সা] আগমনের পূর্বলগ্নে আরবের প্রাকৃতিক, সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এরপর জন্মক্ষণটির সুন্দর উপমায় সাজানো বর্ণনা এবং এরপর জন্ম থেকে হালিমা গৃহে গমন পর্যন্ত রাসূল [সা] যেভাবে নজরুলের উপস্থাপনায় পাই তেমন তো আর কোন কবির কলমে পাই না। প্রিয় নবী [সা] তো সবার। সকলেই তাঁকে নানান বিশেষণে হৃদয়ে স্থান করে নেয়। কিন্তু নজরুল যেমন করে নবীজীকে [সা] বিশেষণ-উপমায় সাজিয়ে হৃদয়ের কোণে গেঁথে রাখলেন তার তুলনা আর হয় না। ■

www.pathagar.com

আইয়ামে সভ্যতা ॥ মা হ বু বু ল হ ক

জানি তোমার কানে কথাগুলো পৌঁছবে না

আর একটা পট-পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত
তোমার কাছে কথাগুলো কেউ পৌঁছাবে না।

কোনো ক্লান্ত পশু যেমন জাবর কাটে
লেটেস্ট তথ্য নিয়ে আমিও তেমন...

জাবর কাটা পশু যেমন তার ভাবনাগুলো
কারো কাছে পৌঁছাতে পারে না,
আমিও তেমনি তোমার কাছে–
একালের দুর্ঘটনার তথ্য পৌঁছাতে পারছি না

তুমি জাগবে না, তুমি আসবে না,
সে সব তো আমরা জানি,
তবু কালিদাসের মেঘদূতের মতো
দুঃসহ সময়ের দুঃস্বপ্নগুলো নিয়ে
তোমার কাছে পাড়ি জমাতে ইচ্ছে করে।

জানো? তোমার প্রিয় পৃথিবীটা এখন
মালিক ও চাকর-এ ভাগ হয়ে গেছে
চাকর কিংবা ভৃত্যরা আবার
কৃতদাসে পরিণত হয়ে গেছে।

ভোগের উন্মাদনায় মা ও মেয়েরা এখন
লুণ্ঠিত পণ্যের সমান

তোমার দেয়া স্বাধীনতা, সাম্য, মানবতাবোধ
ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে ওরা পুঁতে ফেলছে
ঠিক যেমন পুঁতে ফেলতো শিশু কন্যাকে

জানো? তবু এ যুগের নাম আইয়ামে সভ্যতা।

www.pathagar.com

রাসূলপ্রেম ॥ সা মু য়ে ল ম ল্লি ক

বাংলার বদ্বীপে উইপোকার ঢিবির মতো গড়ে উঠেছে সহস্র ধর্মদ্বীপ সাদা-কালো রঙিন
ধর্মভিত্তিক, ধর্মের জরিতে সাজানো, লাল সালু কাপড়ে আদ্যোপ্রান্ত মোড়ানো।
তিমি মাছের মতো এক দ্বীপ গড়ে উঠেছে রাজনীতি বিহীন ইসলামী সৌন্দর্যহীন
তারা চলে রাস্তার ধারে ভিখিরি মজলুম বেশে মাথায় বোচকা চেপে আলখেল্লা জড়ানো
হঠাৎ সাদাসিধে খাদ্য পেলে চিংড়ী জালের মতো দিয়ে বসে ঘের
আফ্রিকীয় কৃষ্ণাঙ্গরা যেভাবে বেঁধে নিয়ে কোমরে গামছা পিপঁড়ের মতো
একদা হেঁটে যেতো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বাক্স-পেটরা মাথায় নিয়ে সাদাদের
লক্ষ কোটি সওয়ার হাসিলের বয়ান রাবী বিহীন হাদিসের বয়ান চলে অনবরত।
রহস্য ঘেরা এক ধর্মদ্বীপের অধিবাসীরা মাজার বানায়, পূজা দেয় সেজদা করে
নূরের তৈরী আর মাটির তৈরি নিয়ে বাহাসে মশগুল থাকে। দিনরাত্রি শুধু
ফ্যাসাদের নিঃশেষ
কাতলা গোছের কিছু নেতারা পদ্মার কূলের মতো ভাঙ্গে আর গড়ে। দ্বীপের মধ্যে
দ্বীপ গড়ে
খণ্ডিত চুম্বকের মেরুর মতো নয়া নেতার জন্ম হয়। পূর্ণ হয় দলপতি হওয়ার খায়েশ।
ফতোয়ায় ভাস্মান এক দ্বীপে অফিসের আদালাতে দেয়াল উঠানে গলির বাঁকে
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত লেখকেরা ফতোয়া লিখে লিখে– কাফেরের, তওবা আর হারামের
মারফতি গায়েনেরা মেতে ওঠে মঞ্চে মিডিয়ায়। রাসূল প্রেম আড্ডা প্রাঙ্গণে
বুঁদ হয়ে থাকে
হজ্জ্ব, জুম্মা আর মিলাদ আদায়েই আত্মা হৃদয় তুষ্ট কোন দীপবাসীদের!

অন্ধের হাতি দেখার মতোই দেখে চলেছে, হে রাসূল! তোমাকে এদেশ দেখে চলেছে
কুরআন হীন, সুন্নাহ বিহীন।

www.pathagar.com

আলোকিত কর আমায় ॥ হা রু ন ই ব নে শা হা দা ত

অন্ধকার মৃত্যুর আরেক নাম
হিম শীতল হৃদয় কাঁপানো ভয়
তাই আমি তার কাছে থেকে পালাতে চাই।

আলো দূর করে সব ভয়
দেয় পথের সন্ধান জাগায় জীবন
তাই তো আমি খুঁজে ফিরি
আলোকিত মানুষ। আমি জানি
আলোকিত মানুষের স্পর্শ
ছাড়া কোন জীবন আলোকিত হয় না,
একটি আলোই পারে শুধু
এক দুই তিন করে হাজার লক্ষ কোটি
আলো জ্বালতে।

হে রাসূল আমার অন্ধকার হৃদয়
ব্যাকুল হয়ে তাই তো তোমাকে খোঁজে
তোমার হেরার জ্যোতিতে আলোকিত কর আমায়।

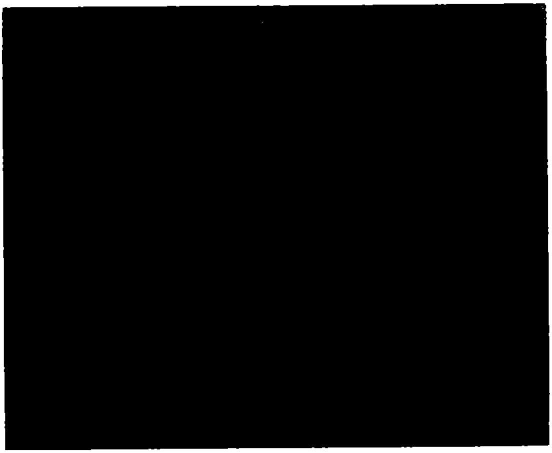

www.pathagar.com

অদৃশ্য কুদরতের ছায়া ॥ কা ম রু ল ই স লা ম হু মা য়ু ন

হে রাসূলে আরাবী, হে উম্মী নবী!
আরবের ঊষর মরুতে জন্ম নিয়ে ঝর্ণাধারার সুশীতল
প্রশান্তি এনে দেয়া হে মহান মানব!
আজ বিশ্বময় আবার মানবতার মরুকরণ অত্যন্ত ব্যাপক-বিস্তৃত;
গভীরভাবে ক্ষত-বিক্ষত প্রকৃত মানুষের হৃদয়বৃত্তি।

দজলা-ফোরাতসহ অসংখ্য নদীর পানি যেভাবে
রক্ত-গোলানো ভয়াল রূপে আবির্ভূত–
যেভাবে প্রতিদিন আদম সন্তানের রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দেয়া হচ্ছে
ইরাকে ফিলিস্তীনে আফগানে ভারতে কাশ্মীরে–
আর তথাকথিত শিল্পের লাখ লাখ টন বর্জ্য ফেলে
শ্যামলিম পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষাকায়ী সাগর-মহাসাগর, নদী-জলধারার
কল্যাণের স্রোতকে কৃষ্ণ-কলুষিত, বিষাক্ত-ক্রুর-ভয়ানক
করে তুলছে; কার্বন গ্যাসের বিপুল বিচ্ছুরণ, গ্রীনহাউস অ্যাফেক্ট–
ওজন স্তরের সর্বনাশা অবক্ষয়ে অবক্ষয়িত হয়ে পৃথিবীময়
জাহান্নামের উত্তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

বিশ্ব-মোড়লের তখ্‌তে আসীন শয়তানের চেলারা
এসব বন্ধ করা তো দূরে থাক– সে কথা কেউ তুললে উল্টো
গর্জনে ফেটে পড়ে– যেন জ্বলজ্যান্ত আজাজিল!
লোলুপ লুটেরা শোষকেরা সারা বিশ্ব থেকে শুষে নিচ্ছে
মানুষের স্বদেশের বিপুল রিসোর্স;
সম্পদ আর শক্তি ক্ষমতার পাহাড় গড়ে আজ দেশে দেশে
চড়াও হচ্ছে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র নিয়ে,
যুদ্ধ বিমান, নৌবহর আর ইয়াজুজ-মাজুজের দঙ্গল নিয়ে,
আজ তাই মহান আল্লাহর সুশীতল রহমতের বারি চাই
হে রাসূল! তোমার উম্মতেরা দিকে দিকে জেগে উঠেছে
ত্যাগের প্রোজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে তারা–
তাদের মদদ করো, মদদ করো
আল্লাহর অদৃশ্য কুদরতের ছায়াতলে।

www.pathagar.com

শোয়েব নবীর দেশে

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

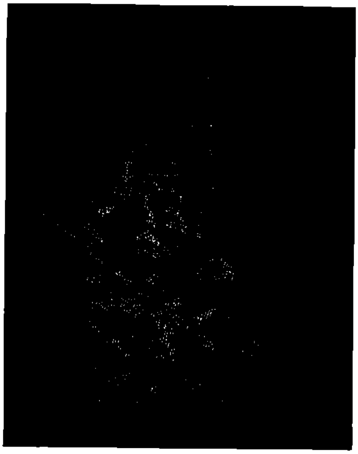

১৯৯৬ সাল। এ বছরটি আমার জন্য ব্যাপক সফরের সুযোগ নিয়ে হাজির হয়। এ সময় আমি জাজিরাতুল আরবের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করার একটা মওকা পেয়ে যাই।

লোহিত সাগর তীরের উঁচুভূমি জেদ্দা। মানব বসতির একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে জেদ্দার ব্যাপারে কীংবদন্তী আছে। জেদ্দি থেকে জেদ্দা। জেদ্দি মানে দাদী। মানব জাতির জেদ্দী বা দাদী হাওয়া আ. জান্নাত থেকে মাটির দুনিয়ায় এখানেই প্রথম পা রেখেছিলেন। জেদ্দায় দাদী হাওয়ার কবর রয়েছে। এটাই প্রচলিত বিশ্বাস।

জেদ্দা থেকে শুরু করে হেজাজ ও আসির ভূখণ্ডের বৈচিত্র্যময় জমি ক্রমশ আরো উঁচু হতে হতে আবহায় গিয়ে সুদা পর্বতে ঠেকেছে। সেখানে সুদার চূড়া প্রায় এগারো হাজার ফুট উঁচু। এরপর সুদা পর্বতের পশ্চাতভূমি জিজান। জিজানের মাটি ফের লোহিত সাগরের বেলাভূমি ছুঁয়েছে। জিজানের অদূরে 'আসহাবুল উখদুদ'-এর এলাকা নাজরান। আবরাহার হাতীর হাজার মাইলের পদযাত্রাও শুরু হয়েছিল এ নাজরান থেকেই।

www.pathagar.com

পশ্চিমাঞ্চলের লোহিত তীরের জেদ্দা থেকে মক্কা, হাদ্দা, তায়েফ, আল বাহা, বেল জুরাইসী। এ পথ চলে গেছে পর্বত বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে ক্রমশ দক্ষিণের দিকে। দক্ষিণ আরবের খামিস, আবহা ও জিজান। লোহিতের এক তীর থেকে আরেক কিনার জুড়ে পার্বত্য এই অঞ্চল ভৌগলিকভাবে তিহামা নামে পরিচিত। আর প্রশাসনিকভাবে এই অঞ্চলের দুই অংশ হেজাজ ও আসির নামে শনাক্ত হয়েছে।

আসির অঞ্চলের আবহা সৌদি আরবের সবচে ঠাণ্ডা এলাকা। শীতের সময় আবহায় বরফ পড়ে। আর তার প্রতিবেশী জিজানের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। জিজান হলো সৌদি আরবের গরম কড়াই। মাঝখানে তিন মাইল উঁচু সুদা পর্বত। সুদা পর্বতের এক পাশে আবহাতে মানুষ শীতে কাঁপছে। অন্য পাশে জিজানে চরম গরমে মানুষ ছটফট করছে। রসিক সৌদিরা সুদা পর্বতকে বলেন 'মুখায়েফ'। মুখায়েফ মানে এয়ার কণ্ডিশনার। এয়ার কণ্ডিশনারের সামনের দিকে বরফ জমানো ঠাণ্ডা। আর পিছন থেকে বেরোয় কামারের হাঁপর তাতানো গরম বাতাস।

লোহিতের তীর ধরে জেদ্দার আরেক বাহু নিম্নমুখী হয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে রাবেগ, মাস্তুরা, ইয়ামবু, দুবা, আল বেদ, মাকনা হয়ে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত। মাঝখানে সাগর তীরের রয়েল সিটি ইয়াম্‌বু থেকে একটি নতুন প্রশস্ত সড়ক বদর ও মদীনা হয়ে চলে গেছে খায়বর, আল-উলা, মাদায়েন সালেহ আর তায়মার পথ বেয়ে তাবুক পর্যন্ত। পুরনো ও নতুন এই দুই পথ বেষ্টন করেছে প্রাচীন ইতিহাসের স্বর্ণখনি মিদিয়ান বা মাদায়েন এলাকাকে। এ এলাকার রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এ এলাকার মাটিতে মিশে আছে হযরত সালেহ [আ], শোয়েব [আ] ও মূসা [অ]-এর স্মৃতির সৌরভ।

সৌদি আরবের মধ্যবর্তী নযদ অঞ্চলে রিয়াদ, আল কাসিম ও বনু তা'য়ী বা হাইল প্রদেশ। রিয়াদ নগরীর অভিবাসী আমি। রিয়াদের আশ পাশের এলাকা আল-কোয়াইয়া, আরওয়া, দোয়াদমী, সাজের, শাকরা, আল-খারজ, আর-রুমেহ্, আল ওয়াইনা, ইয়ামামা। এ সব এলাকায় এ সময় আমার সফর ছিল সবচে নিবিড়।

সৌদি আরবের সবচে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের এলাকা হিসেবে পরিচিত আল কাসিম। আল কাসিম প্রদেশের প্রধান শহর বুরাইদাহ ও উনাইজা। আল কাসিমের শহরগুলোতে শরীয়া পরিপালনে সবচে বেশী কড়াকড়ি। সেখানে ধূমপানের কোন সামগ্রীও বিক্রি হয় না।

রিয়াদের পুবে আরব সাগরের তীরবর্তী ইস্টার্ণ প্রভিন্স বা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ। এই মরু এলাকা তেলের সাগরে ভাসছে। এই প্রদেশের প্রাচীন কেন্দ্রভূমি আল-আহসা বা আল-হাসা। এ প্রদেশের হফুফ, আবকিক, আল-খোবার, দাহরান, দাম্মাম, কাতিফ, সিহাত, আল-আওজাম, রাহিমা, রাস তানুরা। আরব সাগর তীরের সাত হাজার বছরের পুরনো কাতিফের পাশে নতুন রয়েল সিটি জুবেইল। নতুন ও পুরানের বিস্ময়কর গলাগলি।

লোহিত সাগর তীরের ইয়াম্‌বু আর আরব সাগর পাড়ের জুবেইল। এই দু'টি শহরের পত্তন হয়েছে সৌদি সরকারের বিশেষ রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে। সৌদি ভূগোলের

www.pathagar.com

দুই পাড়ের দুই নগরী। তারপরও এই দুই রয়েল সিটিকে বলা হয় 'টুইন সিটি'। নামে 'টুইন' হলেও দুই সাগর পারের ইয়ামবু ও জুবেইল-এর লবণমাখা প্রকৃতির স্বাদ ও গন্ধ ভিন্ন রকম।

সৌদি আরব একটি দেশ নয়। বহু বৈচিত্রে ভরা এ এক মহাদেশ। এ মহাদেশের একটির পর একটি অঞ্চল সফর করে ক্লান্তি মেনে সামনে তাকাই। ১৯৯৬ সালে সারা বছর গাড়ির চাকার ওপর কাটানোর পরও আমার অনুভূতি ছিল : আরো কত কি যে রয়ে গেল বাকি!

তাবুকের হাতছানি

১৯৯৭ সালের শুরুতে দুই মাস গাঙ্গেয় বদ্বীপের জারুল আর দেবদারুর বনে কাটিয়ে এসেছি। এপ্রিল মাসে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় কাটে এবং কিছু সময় জেদ্দায়। আর মে মাসের প্রায় সবটা সময় কেটে গেছে বাদশাহ আবদুল আযীযের পুরনো রাজধানী নযদ প্রদেশের রিয়াদে। এর মধ্যে তাগিদ এলো তাবুক থেকে।

গত ক'বছরে সৌদি মানচিত্রের প্রায় সবটা শরীর জুড়ে গাঙ্গেয় বদ্বীপবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'উপনিবেশ' গড়ে উঠেছে। তাবুক তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। ডাঃ সরদার নূরুল ইসলাম তাবুকের অভিবাসী বাংলাদেশীদের প্রিয় মুখ। বহু বছর তাবুকে থেকে তিনি সেখানে একটা নিজস্ব রাজত্ব গড়ে নিয়েছেন। মাস কয়েক আগে তার সাথে রিয়াদে দেখা। তিনি অনুযোগ করে বললেন, সব জায়গা চষে বেড়াচ্ছেন, তাবুকে আসছেন না কেন?

বলেছিলাম, তাবুক হলো আসহাবুল আইকা ও মাদায়েন ইবনে ইবরাহিম-এর জনপদ। শোয়েব নবীর দেশ। মূসা নবীর আশ্রয়। মুহাম্মদ সা.-এর কদম-ছোঁয়া প্রশান্ত জমিন। আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইনের শেষ শয্যা। সুযোগ পাওয়া মাত্র সেখানে অবশ্যই যাব।

এর পর কয়েকবার প্রস্তুতি নিয়েও নানা কারণে তাবুক যাওয়া হয়নি। এবার হজ্জের সময় তাবুকের ক'জন প্রবাসী বাংলাদেশীর সাথে মীনার প্রান্তরে দেখা। তাঁরাও বিশেষভাবে বললেন তাবুক সফরের জন্য। ইবরাহিম আ.-এর আরেক বংশধর ইসমাইল [আ]-এর চার হাজার বছরের পুরনো কুরবানীর স্মৃতি বিজড়িত মীনা। সেখানে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার এবারের সফর শুরু হবে শোয়েব নবীর দেশ তাবুক থেকে।

ইতোমধ্যে ডাঃ নূরুল ইসলাম ফোন করে এত্তেলা দিলেন : ছয় জুন আপনাকে তাবুকে হাজির থাকতে হবে। আমিও কোন ওজরখায়ীর জন্য তৈরি ছিলাম না। রাজী হয়ে গেলাম।

বললাম, 'তাবুকে আসবো। তবে শর্ত হলো, ঐতিহাসিক সব নিদর্শন দেখার ব্যবস্থা করতে হবে। 'মাগায়েরে শোয়েব' আর মূসা নবীর 'ইসনে আশারা আইন' না দেখে আমি তাবুক থেকে ফিরব না।'

সরদারজী আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনার সফরের সময় আমি হাসপাতালে ছুটি নেব।' আমার ভিতর বিদ্যুৎ-স্পর্শ টের পেলাম।

www.pathagar.com

রিয়াদ ও তাবুকের মাঝখানে আল কাসিম ও বনু তা'য়ী বা হাইল। তাবুক থেকে ফেরার পথে হাতেম তা'য়ীর দেশ হাইল সফর করলে কেমন হয়? হাইলে তেমন কাউকে চিনি না। আল কাসিমের আবদুল মালেক ভাই একজন হাইল বিশারদ। তাঁকে ফোন করলাম। তিনি হাইলে আমার সফর কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিলেন। আল কাসিমের উনাইজা থেকে হাইলের দূরত্ব সাড়ে তিনশ কি.মি.। সেখান থেকে রিমোট টিপে তিনি হাইলের সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখলেন।

উট থেকে উড়োজাহাজ

সৌদি আরবে গত দেড় বছরে আমি দু'একবার উড়োজাহাজে চড়েছি। তাও নেহায়েত ঠেকায় পড়ে। এক বন্দরে উঠলাম। উড়ে গিয়ে আরেক স্টেশনে নামলাম। মাঝখানে কিছু দেখার সুযোগ নেই। এর নাম আকাশ ভ্রমণ। সড়ক যাত্রার মজা আলাদা। গাড়ির কাচ গলিয়ে সড়কের দুই পাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং জনপদের মানুষদের জীবনধারার মধ্যে দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেয়া যায়। পথে পথে সরাইখানাগুলিতে কি সব চমৎকার যাত্রা বিরতি। এতে এক সফরে বহু সফরের আমেজ পাওয়া যায়। নানা এলাকার বাসিন্দাদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া যায়।

গত বছর জিজান সফরকালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে বন্ধুরা উড়োজাহাজে করে আমার রিয়াদ ফিরার ব্যবস্থা করেন। সে উড়ালের কারণে পথে কিছু দেখার সুযোগ পাইনি। তখন আমার মনে হয়েছিল, এমন সফরের কোন মানে হয় না।

'রোড টু মক্কা'র তখন ও এখন

এ প্রসঙ্গে 'রোড টু মক্কা'র লেখক মুহাম্মদ আসাদের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। মুহাম্মদ আসাদের পূর্ব নাম লিউপোল্ড লুইস। ১৯০০ সালে অস্ট্রিয়ার ইহুদী রাব্বী পরিবারে তাঁর জন্ম। ফ্রাংকফুর্টার সাইটুম নামক বিশ্ব বিখ্যাত খবরের কাগজের সংবাদদাতারূপে তিনি জেরুজালেমে আসেন। আরব ভূমিতে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ভিতর দিয়ে ইসলামের সাথে তাঁর আত্মার লেনদেন হয়। ১৯২৬ সালে সস্ত্রীক ইসলামে 'প্রত্যাবর্তন' করেন।

নওমুসলিম প্রাজ্ঞ আসাদ সৌদি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীযের বন্ধুত্ব লাভ করেন। বাদশাহ তাঁর এই বিশিষ্ট মেহমানের মরু-সফরের জন্য একটি মোটর গাড়ী তোহফা দিয়েছিলেন। কিন্তু আসাদ তাঁর এই সফরগুলিতে উটকেই বাহন হিসাবে পছন্দ করেন। তাঁর সাথিও ছিলেন জায়েদ নামক এক মরু বেদুইন। দুস্তর মরুভূমিতে এ ছিল আসাদের জীবনের ক্লান্তি জয় করা এক দীর্ঘ সফর। এই সফরে তিনি অনেক বিপদের মুকাবিলা করেন। বহুবার ঝুঁকির সম্মুখীন হন। তারপরও মোটর গাড়ীর তুলনায় উটই ছিল মরুভূমিতে তাঁর প্রিয় বাহন।

মুহাম্মদ আসাদ এই রূহানী সফরের মাধ্যমে আরব জীবনধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। সনাতন আরব মুসলিম সমাজের ভিতর তিনি মন ও ইন্দ্রিয়ের সহজাত সঙ্গতি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন। তাঁর দেখা সেই সঙ্গতির নাম 'হৃদয়ের নিশ্চয়তা' এবং

www.pathagar.com

'আত্ম-অবিশ্বাস থেকে মুক্তির আশ্বাস'। আসাদ বুঝেছেন, ইউরোপ এ মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে অনেক আগেই নিঃস্ব হয়েছে। আসাদ তাঁর আরব মরুর সেই চমৎকার আবিষ্কারের বিবরণ ১৯৫২ সালে তুলে ধরেন 'রোড টু মক্কা' নামক সফরনামার মাধ্যমে। সৌদি আরবের আত্মাকে গভীরভাবে পর্যক্ষেবণের অসাধারণ সামর্থ্য ছিল আসাদের। এমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ক'জন আছেন?

আসাদের সময় থেকে এখনো একশ বছর পার হয়নি। এরি মধ্যে আরব অনেক বদলে গেছে। উটের কারাভাঁ এখন আর মরু পথের এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে পাড়ি দেয় না। এককালের মরু জাহাজ এখন শুধু চারণ ভূমিতে দেখা যায়। কিংবা কোন অভিজাত ডাইনিং টেবিলে ধূমায়িত রোস্ট হয়ে হাজির হয়! বেদুইনদের উটে চলা প্রাচীন পথগুলো এখন আধুনিক মহাসড়ক হয়েছে। উটের কাফেলার ছন্দবদ্ধ ঘন্টা-ধ্বনীর পরিবর্তে যান্ত্রিক শকটের একটানা ধাতব শব্দ সেখানে তার কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। এ পরিবর্তন আমিও মেনে নিয়েছি। তবে আমি এখনো আকাশের তুলনায় জমিনের যাত্রাকে বেশী গুরুত্ব দেই।

বাসের টিকেট ফেরত

রিয়াদ থেকে তাবুকের দূরত্ব আঠারোশ কিলোমিটার। জাকির আমার জন্য সৌদি এ্যারাবিয়ান পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর [সাপটকো] বাসের টিকেট কিনে আনলেন। আমার ধারণা ছিল ৫ জুন সকাল দশটায় রওনা হয়ে রাত দুপুর নাগাদ তাবুক পৌঁছাবো। কিন্তু অভিজ্ঞ বন্ধুরা বলছিলেন এ পথে নানা ঝামেলার কথা। এতদূর পথ বাসে যাওয়া ঠিক না। সড়ক পথে রিয়াদ থেকে তাবুকের যাত্রীও খুব কম। সপ্তাহে মাত্র তিন দিন বাস যায়।

আমি তাঁদের কথা আমলে নেইনি। দূর পাল্লার বাস-যাত্রা আমার জন্য নতুন নয়। এই তো সেদিন আমি প্রায় দেড় হাজার কি.মি. দূরে খামিস মুশায়েত গেলাম বাসে চড়ে। আদ জাতির এলাকা রুব আল খালি বা আহকাফ-এর দুর্লংঘ মরু প্রান্তর স্পর্শ করে আলেফ লায়লার স্বপ্নপুরী লায়লা আফলাজ পার হয়ে নাজরানের পাশ দিয়ে আমি গিয়ে হাজির হয়েছি সুদা পর্বতের পাদদেশে। সকাল ৮টায় রিয়াদ থেকে রওনা হয়ে রাত দশটায় আমার বাস খামিসে পৌঁছে যায়। চৌদ্দ ঘন্টা সফর শেষে খামিসের বাস স্ট্যান্ড থেকে সোজা গিয়ে আরো তিরিশ কি.মি. দূরে আবহার প্রবাসী বাংলাদেশীদের একটি সমাবেশে যোগ দেই। তাবুক পৌঁছাতে না হয় আরো ঘন্টা দু'য়েক বেশী সময় লাগবে। কিন্তু চার তারিখ রাতে সরদার নূরুল ইসলাম ফোন করে জানালেন, আমার বাস তাবুক পৌঁছাতে সময় নেবে কম পে আঠারো ঘন্টা। সব কিছু ঠিক থাকলে বাস তাবুকে পৌঁছবে ভোর চারটায়। কোন কারণে এ দূর-পথে বিঘ্ন ঘটলে ছয় জুন ভোর সাড়ে পাঁচটায় তাবুকের অনুষ্ঠানে আমি হাজির হতে পারবো না। এই ঝুঁকি এড়াতে আকাশপথে তাবুক পৌঁছার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন।

www.pathagar.com

আমার রিয়াদের বন্ধুরা মুখ টিপে হাসলেন। আসমানের চাইতে সড়ক বেশী পছন্দ করা অদ্ভুত লোকটি পরাস্ত হওয়ায় তারা খুশী। আগে তাদের পরামর্শ আমি কানে তুলিনি। এখন সাপ্টকোর টিকিট ফেরত দিয়ে সাউদিয়ার টিকিট যোগাড় করলাম।

তাবুকের জন্য কাঁচাগোল্লা

পাঁচ জুন দুপুরে শাহজাহান ভাইর বাসায় খিচুড়ি-ইলিশের আয়োজন ছিল। সেখানে কামাল ভাই, হানিফ ভাই, শরীফ ভাই, হারুন ভাইদের মাহফিল থেকে বিদায় নিয়ে বিকাল চারটায় বাদশাহ আবদুল আযীয বিমান বন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

গাড়ী চালক সাভারের আবদুল আউয়াল। মাদ্রাসা পাশ। শিক হবার ইচ্ছা ছিল। এখন রিয়াদে 'কফিল', 'ইকামা', 'তানাজ্জুল' প্রভৃতি শব্দমালার প্রেমে আটকা পড়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। বেজায় সুখী মানুষ। দেশে কয়েকটি পরিবার তাঁর আয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

পথে হাইয়্যাল উজারাতের বিখ্যাত বাংলাদেশী মিষ্টির দোকান 'অলিম্পিয়া'য় থামলাম। সেখান থেকে তাবুকের বন্ধুদের জন্য কয়েক কে জি কাঁচাগোল্লা ও সন্দেশ কিনলাম। সরদার ভাই জানিয়েছেন তাবুকে বাংলাদেশী মিষ্টির দোকান এখনো চালু হয়নি। এই ভয়াবহ শূন্যতার কারণে বাংলাদেশী ভাইদের রসনা দেশী মিষ্টির অভাবে বহু দিন অতৃপ্ত।

'ওরাকা' ও 'আকামা'র গল্প

সৌদি আরবে এক শহর থেকে আরেক শহরে সফরের কিছু কায়দা-কানুন আছে। বাস স্ট্যান্ডে বা বিমান বন্দরে সৌদি নাগরিকদের দেখাতে হয় আই ডি কার্ড। আর প্রবাসীদের রয়েছে 'ইকামা' বা রেসিডেন্ট পারমিট। সাথে ট্রাভেল পারমিট বা 'ওরাকা'ও থাকতে হয়। বাসযাত্রী কিংবা আকাশ যাত্রীদের জন্য টিকেট কাটা থেকে শুরু করে এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে একই নিয়ম। বাসযাত্রীদেরকে পথে নানা জায়গায় থামিয়ে 'ইকামা' পরীক্ষা করা হয়। উড়োজাহাজের যাত্রীরা এই একটি ঝামেলা থেকে মুক্ত।

'ইকামা' শব্দটি অনেকেই উচ্চারণ করেন 'আকামা'। এই 'আকামা' ছাড়া সৌদি আরবে সব 'কাম' অচল। ঘর থেকে বেরুনোর আগে প্রথমে যে জিনিসটির কথা প্রবাসীকে ভাবতে হয় তার নাম 'আকামা'। অনেকে দরোজায় লিখে রাখেন : আকামা নিয়েছি তো!

কে এম ইবরাহিমের কথা মনে করে আমার এখনো হাসি পায়। আমি সৌদি আরবে পৌছার পর দিন আল-রাজী ব্যাংকের সদর দফতরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ। কথায় কথায় কেরালার ইবরাহিম আমাকে ইকামা সাথে রাখার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'ইউ মে এফোর্ড টু ফরগেট টু ওয়েয়্যার ইউর ট্রাউজার। বাট নেভার ফরগেট টু টেক ইউর আকামা উইথ ইউ।' বাইরে যাবার সময় তুমি প্যান্ট পরার কথা ভুলে যেতে পারো। কিন্তু আকামা নিতে কখনো ভুল করো না। সেদিন ইবরাহিমের টেবিলে বসে আকামা সম্পর্কে আরো কিছু প্রচলিত গল্প শুনে এ বস্তুটির গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝেছিলাম।

www.pathagar.com

সোঁদা মাটির গন্ধ

বিমান বন্দরের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নির্দিষ্ট আরোহণ গেটের কাছে ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে জাফর ইকবালের 'পৃ' বইটির পাতা উল্টাচ্ছি। কিছুটা অবাক হয়েই লক্ষ্য করলাম, তাবুকগামী এ ফ্লাইটের বেশীর ভাগ যাত্রী বাংলা জবানে তাদের নানা আঞ্চলিক লফ্‌জ-এর মিশাল দিয়ে বিমান বন্দরের এই অংশটিকে দেহাতি প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর করে তুলেছেন। আমি যেন এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কোন গ্রামীণ বাজারের কোলাহলমুখর সান্ধ্য আড্ডায় বসে আছি।

রিয়াদের পারঘাটায় জমা হওয়া এই যাত্রীদের প্রায় সবাই সদ্য স্বদেশ ফেরত। তাদের গায়ে গ্রাম বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ লেপ্টে আছে। এই ট্রানজিট ফ্লাইটে তারা তাবুক যাবেন। এরপর মাদায়েনের প্রত্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন 'মাজরা', 'সুক' কিংবা 'বালাদিয়া'র বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বেন। এই সহযাত্রীদের কলরব শুনতে শুনতে আমার মনপাখিটা ক্ষণিকের জন্য দেশের মাটিতে উড়াল দিল।

শস্যের ডগায় কার স্পর্শ ?

সন্ধ্যা ছ'টা দশ মিনিটে সাউদিয়ার ট্রাইস্টার বিমানটি রানওয়েতে সাঁতার কাটতে শুরু করলো। প্রথমে আরবী ও পরে ইংরেজীতে যাত্রার ঘোষণা প্রচার করা হলো। সেই সাথে সফরের দোয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা উড়তে শুরু করলাম।

জানালার পাশে বসে মাঝে-মধ্যেই আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে পেঁজা তুলা বা বরফের পাহাড়ের মতো মেঘের বক-শাদা গম্বুজের দিকে। এ মুহূর্তে আমি যেন কোন রহস্যের ভুবনে ঘুরে ফিরছি। ঘণ্টাখানেক পর নিচের দিকে উঁচু পর্বতের সারি দেখে আন্দায করলাম, আমরা হাইল অতিক্রম করছি। এরপর গিরি-কন্দর-এর ফাঁকে ফাঁকে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। গোলাকার চাকতির মতো অসংখ্য ভূমিখণ্ড। ফুটবল খেলার সবুজ মাঠের মতো। অনেক উঁচু থেকে দেখা একেকটি ভূমিখণ্ড আয়তনে অনেক বড়।

হাইল থেকে তাবুক পর্যন্ত বিস্তৃত এ সকল 'মাজরা' বা কৃষি খামার। সৌদি আরবের বিস্তীর্ণ শস্য ভাণ্ডারের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি। মরুভূমিতে জেগে ওঠা নতুন নতুন ফসলের মাঠে প্রায় প্রতিটি শস্যের ডগায় পল্লী বাংলার কৃষক সন্তানেরা তাঁদের অপরিমেয় মেধা ও যোগ্যতার এবং অনুপম সৃজনশীলতার সাক্ষর রেখে চলেছেন।

স্বাধীন প্রকৃতি ঘড়ি মানে না

উড়োজাহাজের প্রপেলারের সাথে সাথে আমার ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। সাতটা থেকে সোয়া সাতটা। তারপর সাড়ে সাতটার মঞ্জিল অতিক্রম করে চলেছে। রিয়াদে এখন রাত নেমেছে। কিন্তু এই আকাশে সন্ধ্যা নামতে এখনো দেরী। হালকা সোনালী সূর্যটা আমাদের সাথে পশ্চিম দিকে ছুটতে ছুটতে বিদায় নেয়ার মওকা পাচ্ছে না। সূর্যের আলোক-সম্পাতে মেঘের কোলে সৌন্দর্যের বর্ণালী সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্ণালীতে নাকি মিশে আছে ইমাম হোসেনের কারবালার রক্ত!

www.pathagar.com

তেইশ লাখ বর্গকিলোমিটার আয়তনের সৌদি মানচিত্রের জন্য টাইম জোন একটাই। জেদ্দা টাইম জোনের অভিন্ন নির্দেশনাই সৌদি আরবের সব এলাকার সময়-ঘড়িকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু এই আইন মানতে স্বাধীন প্রকৃতি রাযী না। ফলে সৌদি আরবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় দুই ঘণ্টা পর্যন্ত পার্থক্য দেখা দেয়।

টানা পৌনে দুই ঘণ্টা উড়ে চলার পর আমাদের বিমান তাবুকের মাটিতে পা ছোঁয়ালো। আটটার সময় তাবুকে নেমে মনে হলো এই মাত্র এখানে সন্ধ্যা নেমেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি আমাকে রিসিভ করার জন্য বিমান বন্দরে কেউ নেই। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। তাবুকের বন্ধুরা আমাকে এভাবে একা ছেড়ে দেয়ার তো কথা নয়।

কিছুক্ষণ পর একটি সাদা ক্রেসিডা গাড়ি থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলেন ডাঃ সরদার নূরুল ইসলাম। পাশের মসজিদে মাগরিবের নামাজ শেষ করেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। তাবুকে এখন মাগরিবের আযান হয় সাতটা পঁয়ত্রিশে। নামাজের জামাত দাঁড়ায় আজানের দশ মিনিট পর পৌনে আটটায়। রিয়াদে এটা এশার নামাজের সময়।

গ্যারিসন সিটি তাবুক

সরদার ভাই তার বাসার দিকে যেতে যেতে আধুনিক তাবুক সম্পর্কে কথা বলছিলেন। দেড় হাজার বছর আগে তাবুক সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল মুহাম্মাদ [সা]-এর অভিযানের কারণে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এখনকার তাবুককে আবার সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। তাবুক এখন একটি গ্যারিসন সিটি বা সামরিক শহর। তাবুকের মাত্র দু'শ কিলোমিটারের মধ্যে মিসর, ইসরাইল ও জর্দানের বর্ডার। এ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তাবুকের কৌশলগত গুরুত্ব খুব বেশী। তাবুক শহরের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও দোকান-পাট গড়ে উঠেছে গ্যারিসন সিটির বাসিন্দাদের চাহিদা সামনে রেখে।

সরদারজীর বাসায় তাঁর সদ্য বোল-ফোটা ছোট্ট মেয়ে তিন্নি সহ তিন ছেলে-মেয়ে আমাকে স্বাগত জানালো। ছোট্ট মেয়েটি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার নতুন 'আঁচ্চু'কে এমন নিবীড়ভাবে আপন করে নিল যেন কত দিনের অধিকার তার এই চাচ্চুর ওপর।

কচ্ছপের পিঠের মতো এক ঢালু প্রান্তরে

নাশতা-চায়ের পর সরদারজী আমাকে মুঈনুদ্দীন ভাইর হাওলা করে বললেন, তাবুকের ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার জন্য আপনাকে একজন অভিজ্ঞ রাহবারের সাথী করে দিলাম।

মুঈন ভাই তাবুক শহরে আছেন আঠারো বছর। বিমান বন্দর থেকে তিনিই গাড়ী চালিয়ে আমাকে এ বাসায় এনেছেন। এখন আবার তার সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

তাবুক শহরের কেন্দ্রস্থলে মসজিদ-ই-রাসূল। রাসূল [সা]-এর তাবুক অভিযানের স্মৃতি বিজড়িত এই মসজিদ। সরদার ভাইর বাসা থেকে সেখানে পৌছতে বেশী সময় লাগলো

৯—

www.pathagar.com

না। মুঈন ভাই মসজিদের পাশে গাড়ি পার্ক করলেন। এখনো এশার জামাত শুরু হতে দেরী। এই সময়ের মধ্যে আমরা আশ-পাশের কিছু এলাকা ঘুরে দেখতে গেলাম।

কচ্ছপের পিঠের মতো নিচ থেকে উপরের দিকে উঁচু হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ একটা প্রান্তর। আবার চূড়া থেকে এ ময়দান ঢালু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এই বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাসূল [সা] সাথিদের নিয়ে তাঁবু ফেলেছিলেন। এই প্রান্তর এখন তাবুক শহরের কেন্দ্রস্থল।

প্রান্তরের সবচে উঁচু এলাকাটিতে দাঁড়িয়ে বারবার চারপাশে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকালাম। ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রের সারি সারি ইমারতরাজির ফাঁক দিয়ে আমি আমার কল্পনার চোখ চৌদ্দ'শ বছর আগের এ ময়দানের মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম। যতদূর চোখ যায় ক্রমশ নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ঝলোমলো বৈদ্যুতিক আলো। মুঈন ভাই বলছিলেন, দিনের বেলা ইমারত সারির ফাঁক দিয়ে এখান থেকে মাইলের পর মাইল খালি চোখে দেখা যায়।

তিরিশ হাজার সাহাবী সৈনিকের যুদ্ধ শিবির রচিত হয়েছিল ক"ছপের পিঠ সদশ এই প্রান্তরে। রাসূল [স]-এর যুদ্ধ শিবিরের মাঝখানটা ছিল দুর্গচূড়ার মতো উঁচু। এ চূড়া থেকে দিগন্ত বিস্তৃত দূর-বহুদূর পর্যন্ত শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল। ফলে দুশমনের অতর্কিত হামলার কোন সুযোগ ছিল না। মুসলমানদের সেনাপতির সমর-সামর্থ্যের কিঞ্চিত নিদর্শন দেখার সুযোগ পেয়ে আমার ভেতরটা আকুল হয়ে উঠলো।

রাসূল [সা]-এর সময়ের দুর্গ ও বাংকার

আমরা রাসূল সা.-এর তাবুক অভিযানের স্মৃতি বিজড়িত একটি দুর্গ দেখলাম। প্রায় দেড় হাজার বছর আগের এই প্রাচীন দুর্গটি বিভিন্ন সময় সংস্কার করা হয়েছে। নানা যুগের সে সব সংস্কারকের নাম-খচিত একটি ফলক রয়েছে দুর্গের প্রাচীরে।

দুর্গের পাশে রাসূল [সা]-এর সময়কার দু'টি ট্রেঞ্চ বা বাংকার। এখনো এ বাংকার দু'টি প্রকাণ্ড গর্তের মতো মনে হয়। আমি একটি বাংকারের কিছুটা নিচে নামলাম। ...নবীজীর তাবুক যুদ্ধের সাথিদের একটি দল এখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। ...বাংকারে ঢুকে মনে হলো যেন আমিও রাসূল [সা]-এর একজন সাথি হয়ে শত্রুর মুকাবিলায় এই বাংকারে ওঁত পেতে আছি।...

রাসূল [সা] ও তাঁর মহান সাথীদের পদধূলি জড়ানো তাবুকের প্রান্তর ঘুরে দেখতে দেখতে আমি নিজের ভিতর প্রবলভাবে আলোড়িত ও উদ্বেলিত হতে থাকলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের মেধাবী ছাত্র মুঈনের সাথে এখন আমার আলোচ্য বিষয় রসূল মুহাম্মদ [সা]-এর তাবুক অভিযান। মুঈন আমাকে নিরাশ করলেন না। তাবুক যুদ্ধের ইতিহাসের একেকটি পৃষ্ঠা আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো।

তাবুক অভিযানের গোড়ার কথা

রাসূল [সা] তাবুক অভিযানে আসেন নবম হিজরীর রজব মাসে। এর আগে প্রায় দুই বছর ধরে একটির পর একটি ঘটনা খুবই দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর থেকেই ইসলামের ইতিহাসে একটা বড় রকমের টার্নিং পয়েন্টের সূচনা হয়। এই চুক্তিকে কুরাইশরা দেখেছিল নিজেদের জন্য বড় বিজয় হিসাবে। সাহাবীদের অনেকে মনে করেছিলেন এ সন্ধির শর্ত মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। আর আল কুরআনে সে ঘটনাকেই উল্লেখ করা হয় 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় নামে।

এই সন্ধির পর থেকে ইসলামের শক্তি দ্রুত বেড়ে যায়। মাত্র দু'বছরের মধ্যে ইসলামের প্রভাবসীমা সম্প্রসারিত হয় চারদিকে। এ অবস্থায় হত-বিহবল কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধী ভঙ্গ করে। কিন্তু তারা মুসলমানদের ওপর একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি শেষ করার আগেই আট হিজরীতে মুহাম্মাদ [সা] মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেন। ফলে আরব জাতির কেন্দ্রভূমি মক্কায় মুসলমানদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুরাইশদের বিপথগামী শেষ দলটি হুনাইনের যুদ্ধে তাদের মক্কার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনার পর আরেকটি বছর শেষ হবার আগেই মরু আরবের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের পতাকার ছায়ায় আশ্রয় নেয়।

মদীনার দূত হত্যার ঘটনা

আরবের অভ্যন্তরে ইসলামের এই দ্রুত প্রসার যখন ঘটছে, রোমের খ্রীস্টান রাষ্ট্রশক্তি তখন নানা উস্কানিমূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে মহানবী [সা] নানা জায়গায় তাঁর প্রতিনিধিদল পাঠান। তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল সিরীয় সীমান্তের আশ-পাশের আরব গোত্রগুলোর কাছে। রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন এই এলাকার লোকেরা 'যাতুত্ তালাহ' বা যাতু আত্লাহ্ নামক স্থানে মুহাম্মদ [সা]-এর এই প্রতিনিধি দলের পনেরো জন সদস্যকে হত্যা করে।

একই সময় আরো একটি বড় অন্যায় করে খ্রীস্টানরা। বুসরার খ্রীস্টান গভর্নর শুরাহবীল ইবনে আমর ছিলেন রোম সম্রাট কাইসারের অনুগত একজন শাসক। তাঁর কাছে হযরত মুহাম্মদ সা. হারেস ইবনে উমাইরকে পাঠালেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। শুরাহবীল রাসূল [সা]-এর এই দূতকে হত্যা করে। এ ধরনের ঘটনা ছিল রীতি বিরুদ্ধ এবং খুবই ইঙ্গিতবহ।

মুতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা

এই অন্যায় ও বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকা মুসলমানদের জন্য নিরাপদ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে রাসূল [সা] আট হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনীকে সিরীয় সীমান্তের দিকে পাঠান। এ সেনাদল মা'আন-এ পৌঁছে জানতে পারেন শুরাহবীল ইবনে আমর এক লাখ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে আসছে। রোম সম্রাট কাইসারও একটি বড় সেনাদল

www.pathagar.com

নিয়ে হিম্‌স-এ উপস্থিত হন। কাইসার-এর ভাই থিয়োডরের নেতৃত্বে আরো এক লাখ সৈন্য যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে।

তিন লাখ শত্রু সৈন্য এগিয়ে আসছে তিন দিক থেকে। এসব খবর পাওয়ার পরও রাসূল [সা]-এর পাঠানো তিন হাজার মুজাহিদের ছোট্ট বাহিনী সামনে এগিয়ে যায়। মুতা নামক স্থানে তারা শুরাহ্‌বীলের এক লাখ সৈন্যের মুখোমুখি হয়। এ অসম যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সারা আরব ও সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো, মাত্র তিন হাজার ইমানদার সৈন্যের মুকাবিলায় খ্রীস্টানদের বিশাল বাহিনী কিভাবে অকার্যকর প্রমাণিত হলো।

চমকে দিলেন ফারওয়া

ইসলামের নবোত্থিত এই শক্তি সিরিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকার আধা স্বাধীন আরব গোত্রগুলোকে নিজেদের দিকে ফিরে তাকাবার হিম্মত এনে দেয়। রোমের পায়রবি বাদ দিয়ে তারা ইসলামের কাছে তাদের আনুগত্যের মস্তক অবনত করে।

এ ঘটনার প্রভাব সিরীয় সীমান্ত ছাড়িয়ে ইরাক সীমানায় ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য সম্রাটের প্রভাবাধীন ইরাকের সীমান্তবর্তী নয্‌দী গোত্রগুলোও পারস্যের অগ্নি উপাসকদের পরিবর্তে ইসলামের দিকে তাদের নযর ফিরায়। বনী সুলাইম, আশজা, গাত্‌ফান, যুব্‌ইয়ান ও ফাযারাহ্ গোত্রের লোকেরা এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে।

এ সময় আরেকটি ঘটনা ঘটলো। রোম সাম্রাজ্যের আরব সেনাদলের একজন সেনাপতি ফার্‌ওয়া ইবনে আমর আলজুযামী ইসলাম কবুল করলেন।

ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে রোম সম্রাট কাইসার ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। সম্রাটের নির্দেশে ফারওয়াকে বন্দী অবস্থায় কাইসারের দরবারে নেয়া হয়। কাইসার এই বন্দী নও মুসলিমকে শর্ত দিলেন, ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মুক্তি দিয়ে আগের মর্যাদায় বহাল করা হবে। আর মুসলমান থাকলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

ফারওয়া রোম সম্রাটের দরবারে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইসলামে সমর্পিত থাকার অটল সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে ফারওয়া ঈমানের এমন এক সাক্ষ্য পেশ করেন, যা আশেপাশের সব এলাকার লোকদেরকে বিস্ময়ে উদ্বেলিত করে তোলে।

এ ঘটনা থেকে কাইসারও বুঝতে পারেন 'দুশমন'-এর শক্তি তাঁর ধারণা-কল্পনার চাইতে অনেক বেশী। আর সে শক্তি আরবের মাটি থেকে উত্থিত হয়ে দ্রুত রোম সাম্রাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে।

পর্বত যখন মাথা জাগালো

মুতা যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কাইসার পরের বছর সিরিয়া সীমান্তে আবার সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেন। গাস্‌সানী ও অন্যান্য আরব সরদাররা তার অধীনে

www.pathagar.com

সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। এ প্রস্তুতি সম্পর্কে রাসূল [সা] নিয়মিত খবর পাচ্ছিলেন। এ তৎপরতার তাৎপর্যও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। তিনি অনুভব করেন, এ সময় সামান্যতম দুর্বলতা দেখালে গত প্রায় দুই যুগের সকল মেহনত ও কোরবানী বরবাদ হয়ে যাবে।

রাসূল [সা]-এর সামনে তখন কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল : এক. মুসলমানদের সামান্য দুর্বলতার আভাস পেলে হোনায়েনের য়িষ্ণু ও মুমূর্ষু জাহেলিয়াত আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। দুই. মদীনার মুনাফিকরা আবু আমের রাহেবের মধ্যস্থতায় গাসসানের খ্রীস্টান শাসক ও রোম সম্রাট কাইসারের সাথে তখন গোপন চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। তিন. ইরানীদের পরাজিত করার পর দূরের ও কাছের সব এলাকায় সে সময় কাইসারের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল। এ তিন দুশমনের সম্মিলিত হামলার মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় অকস্মাত পরাজয়ে রূপান্তরিত হতে দেখার জন্য ইসলামের সকল দুশমন অপেক্ষা করছিল। চার. দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম। ফসল পাকার সময় কাছে এসে গিয়েছিল। অর্থের অভাবে সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা ছিল কঠিন ব্যাপার।

এ সকল বিপদ ও বাধার সামনে পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন মুহাম্মাদ [সা]। আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে দুনিয়ার এক নম্বর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ প্রস্তুতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দিলেন।

অতীতের সকল অভিযানের আগে নবী [সা] তাঁর উদ্দেশ্য ও কৌশল গোপন রাখতেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউকে বলতেন না কোন্ দিকে যাবেন এবং কার সাথে মুকাবিলা করবেন। মদীনা থেকে বের হবার পরও গন্তব্যের দিকে সোজা না গিয়ে তিনি ভিন্ন পথ ধরতেন। কিন্তু এবার তাঁর কর্মপন্থা অন্য রকম। তিনি ঘোষণা করে দিলেন, এবারের অভিযান রোমের বিরুদ্ধে। এবারের অভিযাত্রা সিরিয়ার দিকে।

জাহেলদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। বিশ্বের এক নম্বর শক্তি রোম সাম্রাজ্য। সে শক্তির মুকাবিলা করতে নেমেছে মদীনার নবীন ইসলামী রাষ্ট্র। এ অভিযানের পরিণতি দেখার জন্য ইসলামের শত্রুরা নি:শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল। মুনাফিকরা ভাবছিল, যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের সাথে সাথে তারা মদীনায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবে।

জীবন নাচে মৃত্যুর মাঝে

মুসলমানদের সামনে তাবুক অভিযানের গুরুত্ব স্পষ্ট ছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, গত বাইশ বছরের সংগ্রাম আর অশেষ কুরবানীর মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের ব্যাপারে এখন চূড়ান্ত ফায়সালা হতে চলেছে। এ সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা সারা দুনিয়ায় এ আন্দোলনের বিজয়ের দরজা খুলে দেবে। আর সামান্য ভুল করলে আন্দোলনের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে। মুসলমানদের নেতা সকলের মধ্যে এ চেতনার বারুদ ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

একদিকে বিশ্বের এক নম্বর বৃহৎ শক্তি। তার বিপরীতে এক সদ্য জাগ্রত জাতির মহত্তম নেতৃত্ব। মুসলমানগণ তাদের নেতার নেতৃত্বে শাহাদাতের বাসনা নিয়ে সীসাঢালা প্রাচীর রচনা করেছে। যে কোন চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় তারা এক সাথে এগিয়ে যায়। যে কোন দুঃসাহসিক অভিযানে তারা নিঃশঙ্ক চিত্তে কদম মিলায়। আর কী আশ্চর্য! তাদের সকলের আকাংখা শাহাদাতের মৃত্যু। জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে তারা বেশী কাঙ্ক্ষিত মনে করে, যদি সে মৃত্যু হয় শাহাদাতের। সত্যের পথে স্যা দানের। "জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি, শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানী।"

জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে যে জাতি বেশী প্রার্থিত মনে করে তাকে রুখবে কে? এমন এক জাতি গড়ে উঠেছে মদীনায়। তার নেতৃত্বে রয়েছেন এক বিস্ময়কর নেতা। মুহাম্মাদ [সা]। এমন লীডারশীপ পৃথিবী আর কখনো দেখেনি।

তাবুক যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করতে হবে। এ জন্য মুসলমানগণ তাদের বৈষয়িক ত্যাগের প্রতিযোগিতায় নজীর স্থাপন করলেন। হযরত উসমান [রা] নয়শ উট, একশ ঘোড়া ও এক হাজার দীনার দান করলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ [রা] দিলেন চল্লিশ হাজার দিরহাম। হযরত উমর [রা] আল্লাহর পথে কুরবানীর এ প্রতিযোগিতায় আবু বকর [রা]-কে হারাতে চান। তিনি তাঁর সহায়-সম্পদের অর্ধেক এনে হাজির করেন। আর হযরত আবু বকর [রা] তাঁর পুরো ঘর উজাড় করে এনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেন।

গরীব সাহাবীগণ তাদের মেহনত-মজদুরীর কামাই সবটুকু এ কাজে উৎসর্গ করেন। তাদের মধ্যে একজন দরিদ্র আনসারী দিন মজুর সারাদিন পানি বহন করে যা মজুরী পেলেন তার অর্ধেক পরিবারের খোরাকীর জন্য রেখে বাকী অর্ধেক রাসূল [সা]-এর কাছে হাজির করলেন। রাসূল [সা] এ দিন মজুরের দান অন্য সব মূল্যবান দানের ওপর ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। আর মুসলিম মহিলাগণ নিজেদের গহনা খুলে তাবুক অভিযানের তহবিলে দান করেন।

চল চল তাবুক চল

চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের বাহিনী। চল চল তাবুক চল। চারদিকে সাজ সাজ রব। সকলেই তাবুক যুদ্ধে শরীক হতে চান। কিন্তু সকলের জন্য বাহন ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। যারা সওয়ারী পেলেন না তাঁরা অস্থির আবেগে কান্নাকাটি শুরু করেন। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

মুঈন বলছিলেন : তাবুক অভিযান ছিল মুমিন ও মুনাফিক আলাদা করারও একটি মানদণ্ড। ইসলামী আন্দোলনের এ যুগ-সন্ধিক্ষণে যারা দূরে সরে থাকবে তারা ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করবে কিভাবে? তাবুক সফরের সময় কাফেলা থেকে কেউ পিছিয়ে পড়লে সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের মহান সেনাপতিকে তা জানাতেন। নবীজী বলতেন :

"যেতে দাও। ওর মধ্যে ভালো কিছু থাকলে আল্লাহ তাকে ফের তোমাদের সাথে মিলিয়ে

www.pathagar.com

দেবেন। আর অন্য ব্যাপার হলে তো শোকর করো, আল্লাহ তার ভণ্ডামীপূর্ণ সাহচর্য থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।"

নবম হিজরীর রজব মাসের সেই ঐতিহাসিক অভিযান। সাহাবা-সৈনিকের অভিযাত্রা চলছে মদীনা থেকে সিরিয়ার পথে। এ কাফেলায় তিরিশ হাজার অভিযাত্রীর মধ্যে বাহন মাত্র দশ হাজার। এক-একটি উটের পিঠে কয়েকজন পালাক্রমে সওয়ার হন। একে তো প্রচণ্ড গরম, তার মধ্যে পানির প্রচণ্ড অভাব। মদীনা থেকে পর্বতসংকুল পথ ও দুস্তর মরু-প্রান্তর পারি দিয়ে আল উলা ও মাদায়েন সালেহ অতিক্রম করে রাসূল [সা]-এর কাফেলা তাবুকে এসে তাঁবু ফেললো।

বিনা যুদ্ধে তাবুক জয়

কাইসারের জন্য এ তো ছিল দু:স্বপ্নের মতো। তার সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই মদীনার নেতা তাবুকে তার দরজায় কড়া নাড়ছেন। মুসলিম বাহিনীর সাথে অতীত লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর ছিল না। মুতার যুদ্ধ তো মাত্র ক'দিন আগের ঘটনা। মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় রোম সাম্রাজ্যের এক লাখ সৈন্যের সে কি নাকানি-চুবানি। কাইসারের স্মৃতি থেকে সে করুণ দৃশ্য মুছে যায়নি।

মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে এখন স্বয়ং মুহাম্মাদ [সা]। এ নেতা এমন নেতা যাঁর চোখের ইশারায় জীবন উৎসর্গ করার জন্য তাঁর প্রতিটি অনুসারী অণুক্ষণ তৈরি থাকে। স্বয়ং সে নেতার নেতৃত্বে জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে দৃপ্তপদে এগিয়ে আসা তিরিশ হাজার সংকল্পবদ্ধ মুজাহিদের মুকাবিলায় লাখ-দু'লাখ সৈন্য দাঁড়াবে কিভাবে?

রোমীয় সৈন্যদের মাঝে ভীতির কাঁপন সৃষ্টি হলো। যুদ্ধ ছাড়াই তারা পরাজিত। এ অবস্থায় কাইসার সীমান্ত থেকে তার হতোদ্যম বাহিনী সরিয়ে নিলেন। কাইসারের পিছু হটার ফলে বিনা যুদ্ধে তাবুক অভিযান সফল হলো। রোম সাম্রাজ্যের ওপর মুসলমানদের এক বিরাট নৈতিক বিজয় সম্পন্ন হলো।

তাবুকের অর্জন : গোটা আরবের নিয়ন্ত্রণ

মুহাম্মাদ [সা] এবার আরো একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ না করে তাবুকেই বিশ দিন অবস্থান করলেন।

এর ফল হলো বিস্ময়কর! আশপাশের ছোট ছোট রাজ্যগুলো ইসলামী শাসনের অনুগত হলো। দুমাতুল জান্দালের খৃস্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিন্দী, আইলার খৃস্টান শাসক ইউহান্না ইবনে রুবাহ এবং এভাবে মাকনা, জারবা ও আযরুহের খৃস্টান শাসকগণ মদীনার ইসলামী শাসনের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। ফলে ইসলামী শাসনের সীমানা রোম সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবে থাকা সীমান্তবর্তী আরব গোত্রগুলোকে দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা হচ্ছিল সগোত্রীয় আরবদের বিরুদ্ধে। এখন রাসূল [সা]-এর তাবুক অভিযানের পর এ গোত্রগুলো রোমানদের মুকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। রোম সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগেই ইসলাম এভাবে সমগ্র আরবের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েমে সমর্থ হলো। এটা ছিল তাবুক অভিযানের বিরাট অর্জন।

তাবুক অভিযানের ফলে মুসলমানদের প্রকাশ্য দুশমনদের মনোবল চূর্ণবিচূর্ণ হলো। মুনাফিকরূপী আস্তিনের সাপদেরও সব আশার আলো নিভে গেল।...

তুলনা কোথায়?

তাবুকের প্রান্তর ঘুরে দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম পৃথিবীর নানা সময়ের অভিযাত্রী ও দিগ্বিজয়ীদের কথা। বিভিন্ন লঙ মার্চ ও তার ফলাফলের কথা। সেসবের তুলনায় মহানবীর তাবুক অভিযান। মদীনার অভিযাত্রী দলের লঙ মার্চ। তাদের ত্যাগ। তাদের আনুগত্য। আর তাদের অর্জন। এর সাথে ইতিহাস বিশ্রুত অন্য সব অভিযানের তুলনা কোথায়?

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর তাবুক অভিযান সম্পর্কে আমার পুঁথি-বিদ্যা কখনো এত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়নি। তাবুক অভিযান আর তার অভিযাত্রীদের কথা ভাবতে ভাবতে আমি মসজিদ-ই-রাসূল-এর দিকে মুঈন ভাইকে অনুসরণ করলাম।

মসজিদ-ই-রাসূলে কিছুক্ষণ

মসজিদ-ই-রাসূল-এ আমরা এশার নামাজ আদায় করলাম। এর পর মসজিদটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এ মসজিদ আগে আয়তনে ছোট ছিল। তখন এটি ছিল কাঠের তৈরি। হিজরী ১২৪৫ সালে একজন তুর্কী সামরিক কর্মকর্তা নিজ ব্যয়ে মসজিদটি পাথর দিয়ে নতুন করে নির্মাণ করেন। ১৯৫৯ সালে মাওলানা মওদূদীর তাবুক সফরের বিবরণ থেকে জানা যায়, তখনো পাথরের তৈরী সে মসজিদটি অপরিবর্তিত ছিল।

আধুনিক সৌদি আরবে সম্প্রতি মসজিদ স্থাপত্যে উন্নয়নের বিশেষ ছোঁয়া লেগেছে। সেই পরিবর্তনের ছাপ 'মসজিদ-ই-রাসূল'-এ লক্ষ্য করলাম। পুরনো মসজিদটির আঙ্গিক প্রায় অপরিবর্তিত রেখে সেটিকে এখনকার নব-নির্মাণের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। কুশলী স্থপতিদের নিপুণ দক্ষতায় এই মসজিদটি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক নিটোল সমন্বয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইনের কবর

মসজিদ-ই-রাসূল-এর কিছুটা দূরে একটি প্রাচীন কবর। এ কবরে শুয়ে আছেন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইন [রা]।

মক্কায় চাচার আশ্রয়ে লালিত-পালিত পিতৃহীন আবদুল্লাহ ইসলাম কবুল করেন। শুধু এ কারণে চাচা তাঁর সব সম্পত্তি কেড়ে নেয়। তাঁর পরনের কাপড় পর্যন্ত খুলে নেয়। এ অবস্থায় মায়ের দেয়া একটি কম্বল দু'টুকরা করে এক টুকরা লুঙ্গীর মতো পরে আরেক টুকরা গায়ে জড়িয়ে আবদুল্লাহ মদীনায় চলে যান। সেখানে তাঁর নতুন আশ্রয় হয় মসজিদে নববীতে। তিনি হন আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত। দুই টুকরা কম্বলের অধিকারী

www.pathagar.com

আবদুল্লাহর উপাধি হলো জুলবিজাদাইন। দুই টুকরাওয়ালা। নিঃস্বজনের বন্ধু রাসূল [সা] স্বয়ং তাঁর শিা ও অন্য সব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন।

তাবুক অভিযানকালে জুলবিজাদাইন রাসূল [সা]-এর উৎসাহী সাথি ছিলেন। তিনি আরজ করেন, নবীজী যেন তাবুক যুদ্ধে তাঁর শাহাদাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। রাসূল [সা] তাঁর এই প্রিয় সাথির জন্য দোয়া করলেন : 'আল্লাহ যেন দুশমনের তরবারীকে জুলবিজাদাইনের জন্য হারাম করে দেন।'

তাবুকে জুলবিজাদাইন জ্বরে আক্রান্ত হন। অল্প ক'দিন জ্বরে ভুগে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূল [সা] তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন। রাতে তাঁর লাশ তাবুকের মাটিতে দাফন করা হয়।

দুই টুকরা কম্বলওয়ালা আবদুল্লাহ দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছেন। তাঁর লাশ নিয়ে কবরে নামলেন তাবুক অভিযানের প্রধান সেনাপতি স্বয়ং মুহাম্মাদ [সা] আর তাঁর দুই প্রধান সাথি হযরত আবু বকর [রা] ও হযরত উমর [রা]। কবরের ওপর বাতি উঁচিয়ে ধরলেন হযরত বিলাল [রা]। আল্লাহর রাসূল [সা] তাঁর সাথীদেরকে সতর্ক করে বলছিলেন : 'তোমাদের ভাইয়ের সম্মানের প্রতি ল্য রাখ।' রাসূল [সা] নিজ হাতে আবদুল্লাহর কবরে পাথর রাখলেন। তারপর দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও আমি তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলাম। তুমিও তার ওপর সন্তুষ্ট থাক।'

আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইনের এ মর্যাদা দেখে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা]-এর ভেতরটা আকুল হয়ে উঠলো। তিনি বলছিলেন, 'হায়, এই কবরের বাসিন্দা এই আবদুল্লাহ না হয়ে যদি আমি আবদুল্লাহ হতে পারতাম!'

হযরত আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইনের নামে কাছেই একটি মসজিদ। মসজিদ-ই-জুলবিজাদাইন। চৌদ্দশ বছর পরও এই কবর আর এই মসজিদ তাবুকের মর্যাদার প্রতীক। ১৪১৪ হিজরীর ৩০ জিলহাজ্জ তারিখে এ মসজিদটি সর্বশেষ সংস্কার করা হয়েছে।

তাবুকের এক বুফিয়ার আড্ডায়

রাসূল [সা]-এর তাবুক অভিযানের স্মৃতি বিজড়িত এ সব জায়গা দেখে ফিরার পথে আমরা মুঈন ভাইর 'বুফিয়া'য় গেলাম। এই রেস্টুরেন্ট ছাড়া তাবুকে তাঁর একটি 'মাগসালা' বা লন্ড্রী আছে। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কাপড় ধোয়ার কাজেই এ লন্ড্রী ব্যস্ত।

মুঈন ভাইর বুফিয়ায় চা খেতে খেতে কিছু সৌদি তরুণের প্রাণবন্ত আড্ডা উপভোগ করছিলাম। তাদের সবার হাতে মোবাইল সেট। একটু পর পর ক্রিং ক্রিং শব্দ বেজে উঠছে। হাসিতে আড্ডায় বুফিয়াকে তারা সরগরম করে রেখেছে।

কৈশোর ও তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের মাঝে আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এ ধরনের আড্ডা এখন আর আমার উপভোগ করা হয় না। কিছুটা

www.pathagar.com

নস্টালজিক হলাম। আজাদ আর মঞ্জুদের সাথে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে গেলাম ঢাকার কাপ্তান বাজারের 'স্টার' আর 'সোসাইটি'র জমজমাট আড্ডায়। সদরঘাটের বাকল্যান্ড বাঁধের আসর। চায়ের পিপাসা মিটাতে যেখানে এক বয়সে রাত দু'টা-তিনটায় ছুটে গেছি।

'বিরল প্রজাতি'র এক যুবকের সাথে বুফিয়ায় বসে এক যুবকের সাথে পরিচয় হলো। বাড়ি পশ্চিমবঙ্গ। নাম আবদুর রহমান।

আমি বললাম : সৌদি আরবে কেরালা, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদসহ হিন্দুস্তানের নানা প্রদেশের বহু-বিচিত্র লোকের সাথে হামেশা সাাত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোকের দেখা পাই না। রিয়াদে দু'এক জন স্বর্ণকার পেয়েছি। তারা দিল্লী বা বোম্বে ঘুরে সৌদি আরবে এসেছেন। সৌদিতে পশ্চিম বঙ্গের কোন মুসলমান এই প্রথম দেখলাম। আপনি তো সৌদি আরবে এক বিরল প্রজাতির লোক।

কথায় কথায় আবদুর রহমানের ঘরের খবর জানা হলো। আবদুর রহমান পশ্চিম বঙ্গের এক সময়কার মোটামুটি অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান। তাদের তালুক-জমি ছিল। বাজারে দোকান-পাট ছিল। এখন এ যুবক তাবুকের এক মাজরা বা কৃষি খামারের কর্মী। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বাংলাদেশী অভিবাসীদের সাথে তিনি বেশী আত্মীয়তা বোধ করেন। সুখে-দুঃখে তাদের কাছে ছুটে আসেন। সেই সুবাদে মুঈন ভাই তাবুকে আবদুর রহমানের লোকাল গার্জিয়ান।

আবদুর রহমান পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত। অনেক দিন পর একজন শ্রোতা পেয়ে নিজেকে যেন ঢেলে দিতে চাইলেন। তার মতে ভারতের রাজনীতিতে মুসলমানরা ব্যবহার হন পাল্লার এ-ধারে বা ও-ধারে। সেখানকার রাজনীতির নীতি নির্ধারণে মুসলমানদের কার্যত কোন ভূমিকা নেই।

আবদুর রহমানের দৃষ্টিতে বিজেপি হলো ভারতে মুসলমানদের প্রকাশ্য দুশমন। বিজেপির লক্ষ্য মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট। কোন্ দিক থেকে তাদের হামলা আসবে তা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু জ্যোতিবসুর কম্যুনিস্ট পার্টি হলো ঘাসে লুকানো সাপ!

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বৈরিতা থেকে মুসলমানদের নিরাপত্তা দেয়ার নামে কম্যুনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে মুসলমানদের আত্মপরিচয় মুছে ফেলছে। কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা আত্মপরিচয় ভুলছে। রাজনীতিতে তারা প্রভাবহীন। আর অর্থনীতিতে তারা প্রতিদিনই ইঞ্চি ইঞ্চি করে পাতালের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। ক্ষোভ ঝরে আবদুর রহমানের কণ্ঠে।

আবদুর রহমান বললেন, উঠতি মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যে যাতে মাথা তুলতে না পারে সে জন্যও চলছে নানা ফন্দী। কোন একটি বাজারে একজন মুসলমানের ব্যবসায়ে প্রসার ঘটতে থাকলে ক'দিন পর দেখা যাবে দোকানটি আগুন লেগে পুড়ে গেছে। শিক্ষায় ও চাকুরীতে পিছিয়ে পড়ার কারণেও মুসলমানরা ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে।

www.pathagar.com

মনে হলো, 'বাড়ির কাছে আরশী নগর সেখা এক পড়শি বসত করে। আমি একদিনও না দেখিলাম তারে...!' অনেক কাছে বাস করেও আমি পশ্চিমবঙ্গের পড়শিদের ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না। আবদুর রহমানকে সে কথা বললাম। আর বললাম, কম্যুনিস্ট শাসনে ধর্মের কারণে বাছ-বিচার হবে কেন?

আবদুর রহমান তার পরিবারের নিঃস্ব হবার কাহিনী শুনালেন। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাপন্ন একটি মুসলিম পরিবারের ছেলে কিভাবে তাবুকের মরুভূমির কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয় তার একটি বর্ণনা আমি শুনলাম। আবদুর রহমানের সাথে কথা বলে মনে হলো তিনি বানিয়ে বলছেন না। তার চোখের ভাষা আমাকে তার কথা বিশ্বাস করতে মিনতি জানাচ্ছিল।

তাবুকে একটি নির্ঘুম রাত

বুফিয়া থেকে সরদার ভাইর বাসায় পৌছুলাম রাত বারোটার পরে। তাবুকের বাইরের কয়েকটি এলাকা থেকে, দুবা ও টাডকো থেকে কয়েকজন বাংলাদেশী এসেছেন সকালের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সরদার গিন্নী সবার জন্য রান্না করেছেন। রাতের খাওয়া শেষে সবাই ঢালা বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। দু'একজনের নাসিকা মৃদু গর্জন করছে। শুধু আমার চোখে ঘুম নেই। তাবুক যুদ্ধ, রোম সম্রাট কাইসার, আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইন। একের পর এক মিছিল। মদীনা থেকে কাফেলা এগিয়ে চলছে। একটি বাঁকা চাঁদ সারা পৃথিবীকে মুক্তির ইশারা দিচ্ছে। তারেক বিন যিয়াদের জাহাজ নোঙর করছে জাবাল আত্-তারিকে। সমগ্র ভূমধ্যসাগর জুড়ে এই কাফেলার নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে।

তারপর? ...ক্রুসেড! একবার দু'বার তিনবার। গাযী সালাহউদ্দীন আইউবী। রডারিক। একে একে সবাই যেন আমার সাথে কথা কইতে চান। ...ইউরোপের উস্কানিতে হালাকু খানের বাহিনী আসে। বাগদাদ ধ্বংস হয়। মুসলমানদের কেন্দ্র সরে যায় মিসরে। তার পর তুরস্ক। ইউরোপ নযর ফেরায় দিল্লীর মুগল সাম্রাজ্যের দিকে। দিল্লীর মোঙ্গল রক্তে তখন আফিমের ঘোর। পলাশীর পথ বেয়ে নামে ঘোর অন্ধকার। আমরা পথ হারাই। আমরা ঘুমাই।

এক সময় বিছানা ছেড়ে ঘরের কোণায় টেবিলে গিয়ে বসলাম। আমি কবি নই। তবু মনে হলো, এ সময় একটি কবিতাই পারে আমার সাথে কথা কইতে। আমি আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইনকে নিয়ে কয়েকটি পংক্তি লিখে ফেললাম।

যখন বিছানায় ফিরবো, মসজিদের মিনার থেকে আযান ভেসে এলো : 'হাইয়্যা আলাস সালাহ।' এসো সালাতের দিকে। 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ।' এসো কল্যাণের দিকে। তাবুকের প্রান্তর থেকে, মসজিদে জুলবিজাদাইনের মিনার থেকে আযান ভেসে আসছে। নব যুগের বিলাল হাঁকছেন : এসো। ফের কাতার বাঁধো এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আগুয়ান হও। পৃথিবীর সব অকল্যাণ ঘুচিয়ে দাও।

www.pathagar.com

স্বদেশপ্রেম বাড়ে প্রবাসে

ছয় জুন শুক্রবার। তাবুকে ভোর হলো। আমরা দল বেঁধে প্যারেড করে হাসপাতালের পাশের মসজিদে গিয়ে ফজর আদায় করলাম। এরপর সরদার ভাইর হলরুমে একটি ভিন্ন স্বাদের বৈঠক শুরু হলো। তাবুকের নেতৃস্থানীয় অভিবাসী বাংলাদেশীরা এই কাকডাকা ভোরে এখানে সমবেত হলেন।

শুরুতে আল কুরআনের তাফসীর পেশ করলেন এক যুবক। তাবুকে এসে তিনি কুরআন পড়তে শিখেছেন। অধ্যয়ন শিখেছেন। কুরআনের ওপর তার দখল আমাকে অভিভূত করলো।

বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রাণবন্ত আলোচনা হলো। সে আলোচনায় উঠে আসলো বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস। বখতিয়ার খিলজীর রাজনৈতিক বিজয়ের আগে সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে ইসলাম প্রচারকগণ দলে দলে ছুটে গেছেন বাংলাদেশে। জাতিভেদ কবলিত বাংলাদেশের মানুষকে তারা শুনিয়েছেন সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের আহবান। এক সারিতে, এক জামাতে, এক সতরঞ্চিতে, এক বাসনে, এক পাতে মিলিত হবার আহ্বান।

ইসলাম প্রচারকগণ এক সূতায় গেঁথে দিলেন বহুধা বিচ্ছিন্ন ফুলদল। তাঁরা প্রচার করলেন কর্মে এবং শিায় সকলের বাধাহীন অধিকারের কথা। তাদের আহ্বানে জেগে উঠলো সারা বাংলার ঘুমের পাড়া। জেগে উঠলো নতুন আলো। সে আলোক রশ্মি অনুসরণ করে ছুটে এলো বখতিয়ারের ঘোড়া।

তার পর সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসন। এই আমলে বাংলার অর্থনীতির গৌরব ছড়িয়ে পড়লো সারা দুনিয়ায়। বাংলাদেশের সিন্দাবাদ নাবিকরা পাল উড়ালেন পৃথিবীর বন্দর থেকে বন্দরে। বাংলাদেশ হলো জান্নাতুল বিলাদ। পৃথিবীর মনি-কাঞ্চন স্তূপীকৃত হলো বাংলাদেশে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন ঐতিহ্য নির্মিত হলো। হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল বাংলা ভাষা। বাংলা ও বাংগালীর যত গৌরব সবই তৈরি হলো মুসলিম শাসনের এই সাড়ে পাঁচশ বছরে।

এর পর আমরা সাংস্কৃতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লাম। অরক্ষিত সাংস্কৃতিক সীমানা ভেদ করে এখানে জন্ম হলো পলাশীর। তার পর সব গৌরব তলিয়ে গেল। এর পর অনেক কারবালা রচিত হলো বাংলাদেশে। ফকীর মজনু শাহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর, দুদু মিয়াদের সংগ্রামের পথ বেয়ে আবদুল লতীফ, আমীর আলী, সলীমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়াব আলীদের বুদ্ধিবৃত্তিক চৈতন্যকে অবলম্বন করে আমরা ফিরে পেলাম স্বাধীনতা।

তার পর থেকে দেশ আবার এগিয়ে চলেছে নব নির্মাণের একেকটি মঞ্জিল অতিক্রম করে। সে উন্নয়নের ধারায় অভিবাসী বাংলাদেশীগণ পালন করছেন এক অসামান্য ভূমিকা। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীগণ ছড়িয়ে পড়ছেন। সেখান থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসছেন দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা। তারচে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তারা বয়ে

www.pathagar.com

আনছেন সারা দুনিয়ার উন্নয়নের অভিজ্ঞতা। তাদের অভিজ্ঞতার স্পর্শ দ্রুত বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নের রোডম্যাপ। এই অভিবাসীরা কাজ করেন বিদেশের মাটিতে। কিন্তু তাদের মন, তাদের আত্মা, তাদের সত্তা এবং শিকড় বাংলাদেশের মাটিতে। এই আপাদমস্তক দেশপ্রেমিক বিরাট শক্তিকে পরিকল্পিতভাবে দেশের উন্নয়নে আরো কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।...

প্রবাসী বাংলাদেশীদের উন্নয়ন ভাবনা আমাকে মুগ্ধ করলো। আমি আবারও আমার ধারণায় সঞ্জীবিত হলাম। প্রবাসীরা হলেন বাংলাদেশের নাড়ি ছেঁড়া ধন। তাঁরা সুদূর তাবুকে বসে বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা ভাবছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলছেন। দেশপ্রেম দেশের বাইরে গেলেই পূর্ণতা পায়। তাঁদেরকে যথার্থ উদ্বুদ্ধ করলে প্রতি বছর তাঁরা বাংলাদেশের জন্য একেকটি যমুনা ব্রীজের মতো প্রকল্প উপহার দিতে পারেন। এ জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। কে তাদের ডাকবে?

জুমআর নামাজের আগেই অনুষ্ঠান শেষ হলো। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রামের সময়টা আমি ইমরান, তিবা ও তিন্নির দখলে চলে গেলাম। তিবার বিরাট সংসার। সে তার সংসারের বিচিত্র তৈজসপত্রের সাথে আমাকে পরিচিত করলো। ইমরানেরও রয়েছে অনেক সংগ্রহ। সৌদি আরবের নানা জায়গা সফরের সচিত্র বৃত্তান্ত সে আমার কাছে পরিবেশন করলো। তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ মতা আর ইচ্ছাশক্তি আমাকে মুগ্ধ করলো। ইমরান চায় তার দেখা সব এলাকা যেন আমিও ভ্রমণ করি।

অভিবাসীদের মিলন মেলায়

তাবুক নগরীর কেন্দ্রস্থলে আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইন মসজিদের পাশে বিরাট বাজার। রিয়াদের বাথার মতোই বাংলাদেশীদের এটি প্রধান মিলনকেন্দ্র। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিকালে তাবুকের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার বাংলাদেশী এখানে হাজির হন। এ হলো তাদের সাপ্তাহিক মিলন-মেলা। বাজার-সদাই, দেখা-সাক্ষাত, লেনদেন, দেশের খোঁজ-খবর। সব এক সাথে হয় এখানে। আড্ডাপ্রিয় বন্ধুবৎসল আবেগপ্রবণ বাংলাদেশীদের এই মিলন আকাঙ্ক্ষার কোন তুলনা আর কোথাও দেখিনি।

এই বাণিজ্য কেন্দ্রে নাবা ওয়ার্ল্ড সার্ভিস একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান। এখানে অভিবাসী বাংলাদেশীদের সাথে আমার সাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার তাবুক সফরের খবর জানিয়ে উদ্যোক্তাগণ প্রচারপত্র বিলি করেছেন। আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইন মসজিদে সালাতুল আসর পড়ে এসে আমি এখানে বসলাম। আমার চারপাশে অভিবাসী বাংলাদেশীদের ভীড় জমে উঠলো। কয়েক ভাই কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভীড় সামাল দিলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত আমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার এই উন্নয়নের প্রতিনিধিদের মিছিলে আমার কণ্ঠ মিলালাম। তাদের সুখ আর দু:খের বুকে কান পাতলে সমগ্র বাংলাদেশের হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানি শুনা যায়।

www.pathagar.com

মাদায়েনের পথে

রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরযাদী। এক নতুন কাহিনীর সাথে পরিচিত হবার আবেগ-উত্তেজনার মধ্যে সাত জুন শনিবার তাবুকে আমার ভোর হলো। আজ আমরা আল-বেদ যাবো। এ সফরে সরদার ভাই ছাড়াও সাথি হচ্ছেন মুঈন ভাই ও মওলানা জাকির। সরদারজী অভিযাত্রী দলের পরিচয় দিতে দিতে বললেন, তাঁরা সবাই দাঁড়ে আর মাস্তুলে সমান টানেন। তাবুক আর আল বেদের তারা বিশেষজ্ঞ।

সকালে আমরা তাবুক যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি আবার দেখতে গেলাম। তাবুকের দুর্গ। আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইনের কবর। মসজিদ-ই-আবু বকর। এসব স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সরদারজী আমাদের সফরের জন্য কিছু কেনা কাটা করলেন।

মরুভূমির সফরে দুপুরের খরতাপ এড়িয়ে আমরা বিকালে আল বেদ-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ইমরান আমাকে এই সফর সম্পর্কে অনর্গল নসিহত করলো। আব্বুর সাথে সে ওইসব এলাকা সফর করেছে। সে আমাকে 'বালুর ব্রিজে'র ছবি তুলে আনতে অনুরোধ করলো।

তাবুক শহর থেকে পঞ্চাশ কি.মি. যাওয়ার পর প্রথম চেকপোস্ট পড়লো। পুলিশের লোকেরা ডাক্তার সরদারকে খাতির করে পথ ছেড়ে দিলেন। আমরা বীর ইবনে হারম্‌স পার হয়ে বামে মোড় নিলাম। বীর মানে কূয়া। ইবনে হারমস-এর কূয়া থেকে বাঁয়ের এই সড়ক আল বেদ এবং হাকল-এর দিকে গেছে। আর ডানের সড়ক গেছে হেলায়েত আম্মার [Helayet Ammar]-এর দিকে। হেলায়েত আম্মার তাবুক থেকে একশ ছয় কিমি পথ। তাবুক থেকে আল বেদ-এর দূরত্ব দু'শ চল্লিশ কিমি। আর দু'শ আটত্রিশ কিমি দূরে একটু ডানে হাকল জর্দানের আরেক সীমান্তবর্তী শহর। বীর ইব্‌নে হারম্‌স থেকে আল বেদ ও হাক্‌ল-এর পথ হাবাফ [HABAF]-এ গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। হাবাফ থেকে ডানের সড়ক চলে গেছে হাকল-এর দিকে। আর বাম দিকে আমাদের গন্তব্য মাদায়েন বা আল-বেদ।

হাক্‌ল-এর নাম ফলক দেখে আমার মন খারাপ হলো। এ জায়গার প্রশংসায় ইমরান পাগল। হাকল হলো তার দেখা সবচে সুন্দর জায়গা। হাকলে ইসরাইলের একটি ভূপাতিত জঙ্গি বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে ইমরান ছবি তুলেছে। সে ছবির একটি কপি উপহার দিয়ে ইমরান বলেছে, 'আপনিও সেখানে যাবেন এবং একটা ছবি তুলবেন। তারপর চাচা-ভাতিজার ছবি এক সাথে এক ফ্রেমে বেঁধে রাখবো।' ইসরাইলের ভূপাতিত জঙ্গি বিমান-এর ছবি নিয়ে ইমরান খুবই গর্বিত। কিন্তু হাক্‌ল যাবার কর্মসূচী আমাদের ছিল না।

আইমা পার হওয়ার পর পর্বত বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলছে আমাদের পথ। পথের ধারে ছোট-বড় নানা ধরনের পাহাড়। কোথাও কোথাও মরুভূমির বাতাস দুই পাহাড়ের মাঝখানে নতুন নতুন বালুর পাহাড় গড়ে তুলেছে। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের মাঝখানে এই বালুর সম্পর্কে ইমরান নাম দিয়েছে 'বালুর সেতু'। মরু হাওয়ায়

www.pathagar.com

এই বালুর সেতু এক জায়গা থেকে অন্যখানে উড়ে যায়। সেখানে তৈরী হয় নতুন সেতু। তখন আগের জায়গাটি আর চেনা যায় না। মরুপ্রকৃতি আর বেদুইনদের চরিত্রের মধ্যে মরুভূমির এই দিক-চিহ্ন-ভ্রান্ত অবস্থার চমৎকার মিলের কথা বলেছেন মুহাম্মদ আসাদ।

এক সময় সাগরের নিচে ছিল পার্বত্য অঞ্চল। কোন কারণে এখানকার সাগরের পানি সরে গেছে কিংবা শুকিয়ে গেছে। পাহাড়-পর্বতের গায়ে সাগরের ঢেউয়ের মতো চিহ্ন লেগে আছে। সাগরের লবণ-পানির আঘাতে নানা স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এসব পাহাড়-পর্বত দূর থেকে মনে হয় যেন প্রাচীনকালের জীনের বাদশাহদের তৈরি দরদালানের দেয়ালগাত্র।

সৌদি আরবের অন্য সব এলাকায় দেখা পাহাড়-পর্বতের সাথে এগুলোর মিল নেই। মদীনার পথে দেখা পাহাড়-পর্বতগুলো কোথাও আমার কাছে মনে হয়েছে সদ্য চাষ দেয়া কালো কাদা মাটির জমি। আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত ঠাণ্ডা হয়ে এই কালো জমি তৈরি হয়েছে। আবার কোথাও যেন গাজর-শশা ফালি ফালি করে সালাদের মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাবুক থেকে আল বেদ যাওয়ার পথের পাহাড়-পর্বতের চেহারা ভিন্ন।

প্রাকৃতিক প্রাচীনতার এক ভয়াল রহস্যময় আবহের মধ্যে আমরা আমাদের শেষ বিকালের যাত্রা অব্যাহত রাখলাম। পার্বত্য এই সর্পিল পথে আমরা এগুচ্ছি মন্থর গতিতে। আমাদের পথের দু'পাশে কোন ঘরবাড়ী নেই। জনমানবের বসতি নেই। বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা দু'একটি যান্ত্রিক শকট আমাদেরকে মাঝে-মধ্যে শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে রহস্যময় কোহকাফ পুরি ভেদ করে এ সফর এক সময় কোন লোকালয়ে গিয়ে শেষ হবে!

আল জাইতা পল্লী

এভাবে পাহাড়-পর্বত ভেদ করে চলতে চলতে একটি মসজিদ পেয়ে আমরা মাগরিবের নামাজ আদায়ের জন্য থামলাম। এ জায়গার নাম আল জাইতা। ইতস্তত ছড়ানো ছিটেফোঁটা দু'একটি ঘর ছাড়া ধারে কাছে খুব একটা বসতি মালুম হলো না। তারপরও এ জনবিরল এলাকাটিকে সৌদি সরকার পল্লীর মর্যাদা দিয়েছেন। মসজিদের অদূরে একটি হাসপাতালও নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে এখানে একজন বাংলাদেশী ডাক্তার চাকুরী পেয়েছেন। সারা সপ্তাহে ডাক্তার সাহেবকে খুব একটা রোগী-পত্তর দেখতে হয় না। পাহাড়-পর্বতের মাঝখানে এই কর্মহীন প্রবাস। এ যেন আন্দামান বন্দীর দশা বলে আমার মনে হলো।

নামাজের পর আমরা চায়ের পিপাসা অনুভব করলাম। চা খাওয়ার মতো কোন দোকান চোখে পড়লো না। ফলে জাইতার মেহমানদারীর স্বাদ না নিয়েই আমরা আবার গাড়ী স্টার্ট দিলাম। মাইনাস সেভেন চশমা নিয়ে রাতে গাড়ী চালাতে সরদারজীর অসুবিধা। তাই এখন স্টিয়ারিং হাতে নিয়েছেন মুঈন ভাই। আমরা এগুচ্ছি মাদায়েন-এর দিকে।

www.pathagar.com

মাদায়েন বা মাগায়েরে শোয়েব প্রাচীন ঐতিহাসিক জনপদ। আধুনিক পৌর নাম আল-বেদ। সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমের এই আল-বেদ এক সময় মক্কা-মদীনা ও ইয়ামান-সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসর পর্যন্ত দু'টি রাজপথের মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল। আরব উপদ্বীপের এই সমৃদ্ধ এলাকা পরিচিত ছিল মাদায়েন নামে। এ শহরে নানা দেশের কাফেলার মিলন ঘটতো। আবার এখান থেকে একে অন্যের কাছে বিদায় নিতেন। এজন্যই কি এ জায়গার নাম আল-বেদা বা আল-বেদ?

মাওলানা জাকির বললেন : মাদায়েনের ইতিহাস বেশ ক'জন নবী-রাসূলের সাথে যুক্ত। ইবরাহিম [আ] এর তৃতীয়া স্ত্রী কাতুরার গর্ভজাত সন্তানগণ আরব ও ইসরাইলের ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে পরিচিত হয়েছেন। কাতুরার এক ছেলে মাদইয়ান বিন ইবরাহিম। মাদইয়ানের বংশধরগণ ইতিহাসে পরিচিত হন আসহাবে মাদইয়ান নামে। তারা হেজাজ থেকে ফিলিস্তিনের দণাংশ পর্যন্ত বসতি স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে সিনাই উপত্যকার শেষভাগে আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগরের তটরেখা ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়েন। মাদায়েন শহর ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্রভূমি।

কাতুরার অন্য ছেলেরা উত্তর আরবের তাইমা, তাবুক এবং আল উলার মধ্যবর্তী এলাকায় বসতি বিস্তার করেন। বিখ্যাত দিদানী সভ্যতার অধিকারী দিদান জাতি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বনু কাতুরার এই অংশের প্রধান কেন্দ্র ছিল তাবুক বা প্রাচীনকালের আইকাহ্। মু'জামুল বুলদান নামক বিখ্যাত গ্রন্থেও তাবুকের প্রাচীন নাম আইকাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরদার নূরুল ইসলাম যোগ করলেন : মাদায়েন ও আইকার অধিবাসীগণ আদিতে ছিলেন একই বংশোদ্ভূত এবং তাদের ভাষাও অভিন্ন ছিল। এবং সম্ভবত কোন কোন এলাকায় তারা এক সাথে বাস করতেন। বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে বনী কাতুরার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে অভিন্ন সমাজও গড়ে উঠেছিল। এছাড়া মাদায়েন ও আইকা বাণিজ্যিক যোগাযোগের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রসারও ঘটেছিল। কিন্তু এই দুই জাতির লোকেরাই পরবর্তীতে নানা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে যায়। তাদেরকে সঠিক পথে ডাকার জন্য নবীরূপে শোয়েব [আ] এর আবির্ভাব ঘটে।

বনী কাতুরার কাহিনী শুনতে শুনতে প্রাচীন গিরি-কন্দরের আলো আঁধারের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি। দ্রুত অপসৃয়মান দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকা শৈলশ্রেণীর ভেতর দিয়ে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল যেন হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে ছুটছি। প্রাচীন ইতিহাসের একটির পর একটি রহস্যময় তোরণ ভেদ করে ইতিহাসের গভীর থেকে আরো গভীরে ডুবে যাচ্ছি।

হযরত আদম [আ] এর সময় থেকে যে আদি মানব বংশধারার সূচনা, সে সময় থেকেই অনন্ত এ পথযাত্রা চলছে। পাহাড় পর্বতের আদিমতা আমার ভিতর এখন এক অতি প্রাচীন চোখের জন্ম দিয়েছে। আমি সে চোখ দিয়ে একই সাথে আমার প্রাচীন অতীতকে

www.pathagar.com

এবং অধুনাতম বর্তমানকে দেখতে পাচ্ছি। আদি ও আধুনিকতার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতে করতে অনবরত পথ চলছি...।

আল-বেদ-এ স্বাগতম

এর পর স্বপ্ন ভেদ করে হঠাৎ করেই আমরা আল-বেদ-এ প্রবেশ করলাম। শহরের মাঝখানে প্রশস্ত একটি প্রধান সড়ক। দুই পাশে ঘর বাড়ী। আরবের মেহমানদারীর প্রাচীন ঐতিহ্য ধারণ করে নগরীর প্রবেশ পথে একটি ভাস্কর্য। শোরাহি থেকে পানি ঢেলে অতিথিকে আপ্যায়নের প্রতীক। এছাড়া মেহমানদের আহ্লান-সাহ্লান জানাতে পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে নানা বিলবোর্ড। আর রয়েছে রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ সবুজ গাছ আর ঝলোমলো আলোর ফোয়ারা। আল বেদ শুধু বিদায় জানায় না। স্বাগত জানানোর ঐতিহ্যেও সুদৃঢ়। আমরা নরম আতিথেয়তার মধ্যে প্রাচীন আল বেদ বা মাদায়েনের আধুনিক ছোট্ট পৌর নগরীতে প্রবেশ করলাম।

একটু আগেই এশার আযান হয়েছে। আমরা মেজবানের বাড়ীর কাছের মসজিদে এশার জামাত শেষে আন্তরিক উষ্ণ অভ্যর্থনার বৃত্তে বিগলিত হলাম। আল-বেদ-এর অভিবাসী বাংলাদেশীগণ আমাদেরকে পুরা সময় ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। আমি ঠাট্টা করে বললাম, আপনাদের মধ্যে কেউ কি কলু ছিলেন? একজন মেজবান থতমত খেয়ে বললেন, এরূপ কাউকে জানি না তো। বললাম, ঘানিতে সরিষা পিষে তেল বের করার কায়দাটা আপনাদের মেহমানদারীতে ঠিকমতো ফুটে উঠেছে। অভিজ্ঞ কলু ছাড়া এটা কিভাবে সম্ভব?

মেজবান এবার দ্বিগুণ উৎসাহে বললেন, সৌদি আরবের এক প্রান্তে আল বেদ নিঝুম প্রত্যন্ত ছোট শহর। এখানে সহজে আমরা মেহমান পাই না। আজ যখন পেলাম, মেহমানদারীর পুরা হক আদায় করার সুযোগ তো নিতে হবে।

এশার নামাজের পর পরই আমাদেরকে একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হলো। এরপর রাত সাড়ে দশটায় আরো একটি অনুষ্ঠান। রাত প্রায় একটায় আমরা বিছানায় যাওয়ার অনুমতি পেলাম। অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছি। এ বিবেচনায় তারা রাত একটার পর আর কোন প্রোগ্রাম রাখেননি!

শোয়েব নবীর ঘর-বাড়ী

আটই জুন রবিবার। সকাল সকাল আমরা মাগায়েরে শুয়ায়েব দেখতে রওনা হলাম। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এ জন্য মনে মনে আমি ভীষণ উত্তেজিত।

মরুভূমির মাঝখানে মরুদ্যান ও বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত এক প্রাচীন পথ বেয়ে আমরা চলছি। এক সাথে আমাদের ক'টি গাড়ী। পথ চলতে চলতে মওলানা জাকিরের কাছে হযরত শোয়েব [আ] আর তাঁর কওমের কাহিনী শুনছিলাম। আল কুরআনে সূরা আল আ'রাফ-এ আল্লাহ তাঁর এই নবী সম্পর্কে বলেছেন :

"আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠালাম। তিনি বললেন : হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। তাই ওজন ও দাঁড়িপাল্লা পুরা করো। মানুষকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং সংশোধনের পর তোমরা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। তোমরা যদি সত্যি মুমিন হও তাহলে এর মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল রয়েছে।

"যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখাবার জন্য, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং সরল পথকে বাঁকা করার নিয়তে [জীবনের] প্রতিটি পথে ডাকাত সেজে বসো না। ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখো, যখন তোমরা [সংখ্যায়] কম ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের [সংখ্যা] বেশি করে দিলেন। চোখ খুলে দেখো যে, দুনিয়াতে ফাসাদ স"ষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

"আমাকে যে শিাসহ পাঠানো হয়েছে এর প্রতি যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে এবং আর একদল ঈমান না আনে তাহলে সবরের সাথে দেখতে থাকো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

"[শুয়াইবের] কাওমের সরদারদের যারা বড়াই করতো, তারা বললো ঃ 'হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। জওয়াবে শোয়াইব বললেন : আমরা রাজি না হলেও [আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া হবে]?

"[শুয়াইব আরও বলেন] : আল্লাহ আমাদেরকে [তোমাদের মিল্লাত থেকে] নাজাত দেবার পরও যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তাহলে আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাবো। আমাদের রব আল্লাহ যদি [তা-ই] চান তাহলে আলাদা কথা। তা না হলে আমাদের পক্ষে ঐদিকে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই আমাদের রবের ইলম আছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কাওমের মাঝে ঠিক ঠিক ফায়সালা করে দিন। আর আপনিই তো সবচেয়ে ভালো ফয়সালাকারী।

"তার কাওমের ঐসব সরদার, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিলো তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো : তোমরা যদি শুয়াইবে মেনে চলো তাহলে তোমরা বরবাদ হয়ে যাবে।

"[তারপর যা ঘটলো তা এই যে,] এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করলো। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

"যারা শুয়াইবকে মানতে অস্বীকার করলো, তারা এমনভাবে মিটে গেলো, যেন তারা

www.pathagar.com

[তাদের ঘরে] ছিলোই না। যারা শুয়াইবকে মিথ্যা মনে করলো তারাই [শেষ পর্যন্ত] বরবাদ হয়ে গেলো।

"তারপর [শুয়াইব] একথা বলে ঐ এলাকা থেকে চলে গেলেন : হে আমার কাওম! আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনার হকও আদায় করেছি। এখন যে কাওম সত্য কবুল করতেই অস্বীকার করে তার জন্য আমি কী করে আফসোস করি? [সূরা আল-আ'রাফ : ৮৫-৯৩]

মাওলানা জাকির এরপর সূরা হূদ থেকে তিলাওয়াত করলেন। শুয়াইব [আ] ও তাঁর জাতি সম্পর্কে সূরা হূদ-এ বলা হয়েছে :

"আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠালাম। শুয়াইব বললেন, 'হো আমার কাওম! এক আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। ওজনে ও দাঁড়ি-পাল্লায় মাপে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, তোমাদের ওপর এমন দিন আসবে, যার আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।'

"হে আমার কাওম! ঠিক ঠিক ইনসাফের সাথে ওজন ও পরিমাপ করো। মানুষকে জিনিসের মধ্যে মাপে কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফাসাদী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।

"যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহর দেওয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো। আমি তো তোমাদের উপর হেফাযতকারী নই।

"তারা জওয়াবে বললো, 'হে শুয়াইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ কথাই শেখায় যে, আমাদের বাপ-দাদারা যেসব মাবুদের পূজা করতো তা আমরা ত্যাগ করবো? অথবা আমাদের মাল আমাদের মরজি মতো ব্যবহার করতে পারবো না? তুমিই কি একমাত্র উঁচু মনের ও সৎ মানুষ?'

"শুয়াইব বললেন, 'হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখো, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যের উপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ভালো রিয্‌ক দিয়ে থাকেন [তাহলে এরপর তোমাদের পথ ভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়ার মধ্যে আমি কীভাবে শরিক হতে পারি?] আমি চাই না যে, যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা আমি নিজেই করে বসি। আমার সাধ্যে যতটুকু কুলায় আমি তো সংশোধন করতে চাই। আমি যা কিছু করতে চাই তা আল্লাহর তাওফিকের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করে আছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে ফিরে আসি।

"হে আমার কাওম? আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এতদূর না পৌঁছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের ওপরও ঐ আযাবই এসে যায়, যা নূহ, হূদ বা সালেহের কাওমের উপর এসেছিলো। আর লূতের কাওম তো তোমাদের থেকে বেশী দূরে নয়।

www.pathagar.com

"তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তাঁর দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার রব বড়ই দয়ালু এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে তিনি ভালোবাসেন।

"তারা জওয়াব দিলো : 'হে শুয়াইব! তোমার অনেক কথাই তো আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল মানুষ। তুমি যদি আমাদের বংশের লোক না হতে তাহলে কবেই তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিতাম। তোমার এমন শক্তি নেই যে, আমাদের উপর মতা দেখাতে পারো।'

"শুয়াইব বললেন, 'হে আমার কাওম! তোমাদের সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক কি আল্লাহর চেয়ে বেশি সম্মানের বিষয় যে, তোমরা [বংশকে ভয় করলে, আর] আল্লাহকে একেবারেই পেছনে ফেলে রাখলে? জেনে রাখো যে, তোমরা যা কিছু করছো, আমার রব এ সবই ঘিরে রেখেছেন।

"হে আমার কাওম! তোমাদের নিয়মে তোমরা কাজ করতে থাকো। আমিও আমার কাজ করে যাবো। শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে যে, কার ওপর অপমানকর আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা করো আমি তোমাদের সাথে অপোয় রইলাম।

"শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেলো, আমার রহমত দিয়ে শুয়াইবকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। আর যারা জুলুম করেছিলো তাদের উপর এমন কঠিন এক আওয়াজ এসে তাদেরকে পাকড়াও করলো যে, তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো, যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করতো না। জেনে রাখো, মাদইয়ানবাসীদেরকেও দূরে ফেলে দেওয়া হলো যেমন সামূদ জাতিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো।" [সূরা হূদ : ৮৪-৯৫]

সরদার নূরুল ইসলাম ব্যাখ্যা করে বললেন : 'মাদায়েনবাসীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহকে অমান্য করা, মিথ্যা বলা ও ওজনে কম দেওয়া। মাদায়েনবাসীর মধ্যে শির্ক ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়েছিল। নানাভাবে লোক ঠকানো তাদের জাতীয় ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রাজপথের ওপর বসতি হওয়ার সুযোগ নিয়ে তারা ব্যাপক আকারে ডাকাতি ও রাহাজানিতে লিপ্ত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অন্যান্য জাতির লোকদের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছিল।

'শুয়াইব [আ] তাঁর জাতিকে এ অবস্থা থেকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানান। তারা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন না করার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে। ভয়ানক বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের শাস্তি তাদেরকে ইতিহাসের শিার বস্তুতে পরিণত করে।'

আমরা একটি পাহাড়ি উপত্যকায় পৌছুলাম। চারদিকে পাহাড় পর্বত। মাঝখানে সমতল ভূমি। স্থানটি দেয়াল ঘেরা। বিরাট প্রবেশ দরজায় বড় তালা ঝুলছে। আল বেদ

www.pathagar.com

পৌরসভার বাংলাদেশী কর্মকর্তা জনাব আবু সাইদের অনুরোধে কেয়ারটেকার দরজা খুলে দিলেন। তবে তিনি আমাদেরকে এখানকার আচরণ রীতি সম্পর্কেও সতর্ক করে দিলেন। আমরা শুয়াইব [আ]-এর নগরীতে প্রবেশ করলাম। কেয়ারটেকার 'মা-ফী' উচ্চারণ করলে আমাদের ফেরত যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

শুয়াইবের [আ] জাতির লোকেরা এখানে এবং তার আশপাশের এলাকায় বাস করতেন। ঘেরাও দেওয়া স্থানটিতে কওমে শুয়াইবের ঘর-বাড়ীর কিছু বিশেষ নিদর্শন সংরক্ষিত করা হয়েছে।

মাগায়েরে শুয়াইবের পাহাড়ি বসতি

আমরা একটি পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করলাম। গুহার ভিতর একটির পর একটি আলাদা আলাদা ঘর। একটি ঘরের ভিতর চারটি ছোট খোপ। আর সামনে একটি বড় অলিন্দ।

আমরা আরেকটি পাহাড়ে গেলাম। পাহাড়ের ওপর কিছুদূর ওঠে তারপর সেখান থেকে একটি বড় সুড়ঙ্গ বা গর্তের মতো পথ। সে পথ দিয়ে নেমে গিয়ে পেলাম আরও বেশ কিছু ঘর-বাড়ীর সন্ধান। সবখানে সহজে বাতাস চলাচলের সুবিধার্থে পাথর কেটে ফোকড় বা জানালার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরেকটি পাহাড়ে পাথর কেটে একটি বড় ঘরের মতো তৈরী করা হয়েছে। সে ঘরে সারিবদ্ধভাবে দশটি কবর বা বাংকারের মতো। একেকটি বাংকারে একেকজন মানুষ শুতে পারে। অনুমান করলাম, এগুলি ছিল কবর। পাহাড়ের পাথর খোদাই করে কবর বানানো হয়েছে।

এ ধরনের সমাধি এর আগে আমি ইরানে দেখেছি। তিরানব্বই সালে ইরান সফরের সময় পারস্যের চার হাজার বছরের পুরনো রাজধানী পার্সেপোলিস বা 'তাখতে জামশিদ' দেখতে গিয়েছিলাম। শেখ সাদী ও হাফিজের শহর শিরাজ। শিরাজে আমরা এই দুই মনীষীর কবর জিয়ারত করি। এর পর শিরাজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কি.মি. দূরে তাখতে জামশীদ দেখতে যাই। ইরানের শেষ রাজা রেজা শাহ পাহলভী তার পতনের কিছুদিন আগে এখানে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার পূর্ব পুরুষদের হাজার বছরের রাজকীয় ঐতিহ্য স্মরণ করেন।

পার্সেপোলিসের কয়েক মাইল দূরে 'নকশে রোস্তম' নামে আরেকটি প্রাচীন এলাকা। সেখানে রয়েছে প্রায় আঠারোশ বছরের পুরনো একটি অগ্নিকুণ্ড। জনশ্রুতি হলো, রাসূল [সা] এর জন্মের দিনে অগ্নিপূজারীদের এ পুরনো পূজামণ্ডপের আগুন নিভে যায়। নাকশে রোস্তম নামক পর্বতের গায়ে ঘোড়সওয়ার রোস্তমের এক প্রাচীন নকশা আঁকা। তার পাশে অন্য ক'টি পর্বতের গায়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে প্রাচীন আমলের কয়েকজন রাজার কবর রয়েছে। ইরানের বড় বড় সম্রাটকে এ ধরনের সুরতি উঁচু স্থানে কবর দেয়ার রীতি প্রাচীন আমল থেকে চালু ছিল। সৌদি আরবের আল উলায় মাদায়েন সালেহ এলাকাতেও সামূদী যুগের এ ধরনের কবর রয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা বিভিন্ন পাহাড়ের ভিতর গুহার মতো ঘর-বাড়ী দেখলাম। কোন কোন বাড়ীতে সামনের দেয়ালে শিল্পীর হাতের কিছু প্রাচীন নকশা ও কারুকাজের চিহ্ন চোখে পড়লো। এগুলোর পাঠোদ্ধার হয়েছে কি না জানি না। কালের সাক্ষী হয়ে আছে এসব চিত্র-কর্ম। সরদারজী এসব প্রাচীন ঘর-বাড়ীর অনেকগুলি ছবি তুললেন।

হযরত শুয়াইব [আ] এর কওমের বাড়ীঘর। মাগায়েরে শুয়াইব। এখানে সফর করার এবং নিজ চোখে এসব নিদর্শন দেখার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। সেই সাথে ডা: সরদার নূরুল ইসলামকেও ধন্যবাদ দিলাম।

'বীরে শুয়াইব' : মূসা নবীর স্মৃতির কূয়া

মাগায়েরে শুয়াইব থেকে পাঁচ-ছয়শ মিটার দূরে একটি প্রাচীন কূয়া। এ কূয়ার পানি হযরত শুয়াইবের আমলে মাদায়েনবাসীরা ব্যবহার করতেন। আমরা মূসা নবীর স্মৃতি বিজড়িত সেই ঐতিহাসিক কূয়া দেখতে গেলাম। 'বীরে শুয়াইব' বা শুয়াইব নবীর কূয়াটি এখন কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মাওলানা জাকির তারের বেড়ার মধ্যে একটি ফোকড় খুঁজে বের করলেন। এর ভেতর দিয়ে আমরা সেই কূপের কাছে পৌঁছে গেলাম।

অতীতে বেদুইনরা তাদের উট ও ছাগলের জন্য পানি সংগ্রহ করতে এখানে জড়ো হতো। এই কূয়ার সাথে মূসা [আ]-এর একটি বিখ্যাত কাহিনী রয়েছে। এ সম্পর্কে মাওলানা জাকির আমাদেরকে আল কুরআনের সূরা কাসাস থেকে তিলাওয়াত করে শুনালেন :

"[মিসর থেকে বের হয়ে] যখন মূসা মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি বললেন, "আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালাবেন"।

"যখন তিনি মাদইয়ানের কূয়ার কাছে পৌঁছুলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, অনেক লোক তাদের পশুকে পানি খাওয়াচ্ছে। আর তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দু'জন মহিলা তাদের পশুকে আটকে রেখেছে। মূসা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের অবস্থা কি?' তারা দু'জন বললো, 'এই রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুকে পানি খাওয়াতে পারছি না। আর আমাদের পিতা একজন অতি বুড়ো মানুষ'।

"এ কথা শুনে মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। তারপর একটি ছায়ায় গিয়ে বসে দোআ করলেন, 'হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি যে মঙ্গলই নাযিল করো আমি এরই কাঙাল'।

"অল্পক্ষণ পরেই ঐ দু'জন মহিলার একজন লাজনম্রভাবে এসে মূসাকে বললো, 'আপনি আমাদের পশুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন এর বদলা দেবার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন'। যখন মূসা তার কাছে পৌঁছুলেন, তখন তাঁর সকল কাহিনী তাকে শোনালেন। ঐ লোকটি বললো, 'তুমি কোন ভয় করো না। এখন তুমি যালিম কাওমের হাত থেকে বেঁচে গেছো।'

www.pathagar.com

"মেয়ে দুটোর একজন তার পিতাকে বললো, 'আব্বাজান! এ লোকটিকে চাকরিতে নিয়োগ করুন। সবচেয়ে ভালো লোক, যাকে আপনি কর্মচারী হিসেবে রাখতে পারেন, সে এমনই হতে পারে, যে সবল ও আমানতদার'।

"তার পিতা [মূসাকে] বললো, 'আমার এ দু'মেয়ের একজনকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তোমাকে আমার এখানে আট বছর চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরা করো, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার সাথে কড়াকড়ি করতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সৎ লোক হিসেবেই পাবে'।

"মূসা জওয়াবে বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা ঠিক হয়ে গেলো। এ দু'টো মেয়াদের মধ্যে যেটাই আমি পুরা করে দেই, এরপর আমার উপর কোন চাপ যেন দেওয়া না হয়। আমরা যা কিছু বলছি আল্লাহই এর রক।" [সূরা কাসাস : ২২-২৮]

শুয়াইব [আ] এর নগরী মাদায়েন বা মাগায়েরে শুয়াইবের এই কাহিনী।

জাকির ভাই দ্রুত কূপের কয়েকটি ছবি তুলে নিলেন। আমরা যখন কূপ দেখছি তখন বীরে শোয়েবের কেয়ারটেকার সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁর নাম সালেম সুলেমান মাসউদী। তাকে এই কূয়া আর তার আশপাশের এলাকার গুরুত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা কূয়ার কাছে গেছি। এটা তার পছন্দ হয়নি। হয়তো এ কারণে তিনি কোন জবাব দিলেন না। কিংবা এই চিনির বলদ এ কূয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বেখবর।

মাকনার মাজরায়

মাগায়েরে শুয়াইব ও বীর ই শুয়াইব দেখে ফিরার পথে সাইদ ভাইকে বললাম, বিকালে 'ইস'না আশারা আ'ইন' দেখতে যাব। ব্যবস্থা করতে হবে। সাইদ ভাই জানালেন, ইসনে আশারার পথ আমাদের গাড়িকে আহলান জানাতে সম্মত নয়। সে রাস্তার জন্য 'তাজা দম' ফোর হুইল গাড়ী দরকার। সে গাড়ী যোগাড় করার দায়িত্বও নিলেন সাঈদ ভাই।

দুপুরের পর পরই আমরা মাকনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। লোহিত সাগর থেকে ইংরেজী 'ভি' হরফের মতো দু'টি পানির ধারা প্রবাহিত। তার মধ্যে আমাদের কাছেরটা হলো খালিজ আকাবা বা আকাবা উপসাগর। আর অন্যটি সুয়েজ খাল। প্রথমটি প্রাকৃতিক। অন্যটি মানুষের তৈরি। আকাবার কোলে তার বেলাভূমিতেই মাকনার অবস্থান।

আল বেদ থেকে মাকনার দূরত্ব মাত্র বত্রিশ কিমি। কিন্তু রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম। সেই দুর্গম পথের দুই পাশের ঘনসবুজ আমরা প্রাণভরে উপভোগ করলাম। পথের দুই ধারে আমরা বেশ কিছু মাজরা বা কৃষি খামারও দেখলাম। মাজরার মালিকদের প্রায় সবার সাথে সাইদ ভাইর খাতির-পরিচয়। একটি মাজরার বাংলাদেশী কর্মীরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পথে অপেক্ষা করছিলেন। তাদের আন্তরিক অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমরা পথের ধারের এই মাজরায় প্রবেশ করলাম।

www.pathagar.com

বাগানে ছোট ছোট খেজুর গাছের সারি। হাত বাড়ালেই ডাসা ডাসা সোনালী রং খেজুর ছোঁয়া যায়। সবুজ নারঙ্গী বনে মাল্টার সমারোহ। মাচায় ঝুলছে থোকা থোকা কাঁচা-পাকা আঙ্গুর। ডুমুর গাছে মৌ মৌ পাকা ডুমুর। ডালিম গাছের ডালিম ফুলের মনকাড়া লালাভা শুভেচ্ছা। ছোট ছোট আম গাছে ঝুলে আছে থোকা থোকা আম। গোটা পরিবেশ আমাদেরকে আমোদিত করে তুললো। এমন জায়গা ছেড়ে যেতে মন চায় না।

বাংলাদেশী যুবকরাও আমাদেরকে সহজে বিদায় দিতে রাজী না। তারা আমাদের জন্য দেশী কায়দায় রান্না করবেন। তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। মেহমানদারীর এমন মরুদ্যান ছেড়ে যেতে মন চায় না। তবু চলে যেতে হয়। আমরা তাদের কাছ থেকে বলে কয়ে ছুটি নিলাম। মুঈন ভাইর হাতে তারা বাগানের কিছু তাজা কলমি শাক তুলে দিলেন। আমরা ফিরে যাচ্ছি। এ সময় মাজরার মালিক একটি বড় তরমুজ হাতে দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে এলেন। তার সোজা কথা, এই মেহমানদারী গ্রহণ না করে বাগান থেকে বেরোনো যাবে না।

আমরা আবার গন্তব্যের দিকে ছুটলাম। দেশ থেকে দূরে এই বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য সাইদ ভাই লেখাপড়া এবং বিভিন্ন নৈতিক প্রক্ষিশণের কর্মসূচী চালু করছেন। অবসর সময়ে তারা এক সাথে বসে বা আলাদাভাবে জ্ঞানের চর্চা করেন। তাদের মধ্যে ইলম ও ইবাদতের প্রতিযোগিতা চলে। সাঈদ ভাই এই প্রবাসে তাদের পিতৃতুল্য অভিভাবক।

আল বেদ থেকে মাকনা পর্যন্ত নতুন পথঘাট তৈরী হচ্ছে। নতুন এসে দ্রুত পুরনো চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। আমাদের গন্তব্যের আসল পথ খুঁজে নিতে সাইদ ভাইর মতো রাহবারকেও বেগ পেতে হলো।

মূসা নবীর বারো ঝর্ণা

আমরা ঘন সবুজ একটি প্রাচীন মরুদ্যানের খেজুর বাগিচার কাছে পৌছুলাম। বাগানের কিছুটা ভিতরের দিকে একটু নিচু জায়গা। সেখানে কয়েকটি স্থানে মাটি ফুঁড়ে ঝিরঝির করে পানি উঠছে।

ছোটবেলা আমাদের গ্রামের ধারে খালের পাড়ে বালিয়াড়ি ভেদ করে পানি ঠিকরে বেরুতে দেখেছি। এই পানি বন্ধ করতে হাত দিয়ে চেপে ধরেছি। পানি তখন অন্য পথ তৈরি করে বেরিয়ে এসেছে। খুব মজার ছিল সে খেলা।

এখানে পাঁচ-ছয়টি উৎস থেকে ঝির ঝির করে অনবরত পানি উঠছে। স্ফটিক স্বচ্ছ ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি। এই পানি একটি নহর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আকাবা উপসাগরের দিকে।

এই পুরনো ঝর্ণা নিয়ে নানা কথা চালু আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় পানি নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে গড়াচ্ছে। এ কি দৃষ্টিভ্রম! সকল চোখ একই দৃশ্য দেখছে। পানি গড়াচ্ছে ওপরের দিকে। সাইদ ভাই বললেন, আমরাও তাই দেখি। কিন্তু যন্ত্রপাতি দিয়ে মেপে দেখেছি পানি উপরের দিকে যাচ্ছে না। সমতল পথেই গড়াচ্ছে!

স্থানীয় প্রবীণ আরবরা যুগ যুগ ধরে স্যা দি"ছন, এটিই হযরত মূসা [আ] এর ইসনে

আশারা আইন। মূসা [আ] এর লাঠির আঘাতে এখানে সৃষ্টি হয় তাঁর সাথী বারো কওমের লোকদের জন্য বারোটি ঝর্ণা।

আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন :

"আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, নিজ লাঠি দিয়ে আঘাত কর। তারপর তা থেকে বেরিয়ে এলো বারোটি ঝর্ণধারা।"

এখন সেই ঝর্ণাধারার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে এসেছে। পাঁচ-ছয়টি ধারা প্রাচীন সে অলৌকিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বয়ে চলেছে।

আমার সাথীরা কেউ কেউ এই পানি পান করলেন। কেউ বা অযু করলেন এই পানি দিয়ে। কিছু লোক এখানকার পানি বোতলে করে নিয়ে যায় নানা রোগ-বালাই ভালো হওয়ার নিয়তে। বাংলাদেশী, ভারতীয় ও পাকিস্তানীরা ফায়দা আর ফজিলতের এমনি সহজ পথ বেশী চিনেন।

এই বারো ঝর্ণার স্থানটির অদূরে লোহিত থেকে বেরিয়ে আসা আকাবা উপসাগর। এই লোহিতের পানির নুনের খ্যাতি জগতজোড়া। অথচ তার কয়েক গজ দূরে এই ঝর্ণার মিঠা পানি বড়ই বিস্ময়কর।

মূসা নবীর স্মৃতির পাথর

ইসনে আশারা আইনের কাছেই একটি দেয়াল ঘেরা জায়গা। সেখানে একটি বড় পাথর। মূসা [আ] মিসর থেকে এসে এখানে এই পাথরে বসে বিশ্রাম নেন। সেই স্মৃতির নিদর্শন। লোকেরা এই পাথর ঘিরে বিদাত কাজে লিপ্ত হতে পারে। সেজন্য সতর্কতা হিসেবে পাথরটি দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে।

সাইদ ভাই জানালেন এই জায়গাটিতে এক সময় কিছু খনন কাজ করা হয়। খননের সময় লম্বা পা ও মাথার খুলিসহ প্রাচীন আমলের মানুষের কংকাল-করোটি বেরিয়ে আসে। এ সব নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বেদাতের ভয়ে খননের কাজ সেখানেই থেমে গেছে। সে কারণেও এই স্থানটি ঘিরে রাখা হয়েছে।

ইসনে আশারা আইন ও মূসা নবীর স্মৃতি বিজড়িত পাথর দেখে আমরা আকাবা উপসাগরের তীরে গেলাম। উপসাগর তীরে সৌদি কোস্ট গার্ডদের ঘর-বাড়ী, অফিস-আদালত। এ পারের ছোট শহর মাকনা। আর ওপারে জর্দানের মুনতাকাতুজ জিহাব। মুনতাকা মানে প্রদেশ বা অঞ্চল। জিহাব মানে সোনা। মুনতাকাতুজ জিহাব মানে সোনার শহর। আকাবা উপসাগরের বেলাভূমিতে অনেকণ গাড়ী হাঁকালাম। এপারের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে আমরা ওপারের সোনার শহরকে ক্যামেরার ফে"মে বন্দী করতে চাইলাম।

সোনার গাওয়ের সোনার ছেলে

মাকনা শহরের একটি দোকানে এক বাংলাদেশী সেলসম্যান-এর সাথে পরিচয় হলো। সোনারগাওয়ের ফুটফুটে এক সোনার গড়ন ছেলে। বয়স উনিশ-কুড়ি। তার দোকানে

www.pathagar.com

তাকের ওপর কিছু বাংলা বই। আল কুরআনের তাফসীর তাফহীমুল কুরআন। আরো কিছু ইসলামী বইপত্র। ছেলেটি মাকনা শহরে বাংলাদেশীদের মাঝে এবং সৌদিদের কাছেও বেশ পরিচিত। দেশে মাদ্রাসায় কিছুদূর পড়াশুনা করেছে। প্রবাস জীবনে তার লেখাপড়ার চর্চা চালু আছে। দোকানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে তার প্রবাসী স্বজনকে কুরআনের তাফসীর, হাদীসের বাণী এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শোনায়।

আমাদের মেঘনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, গোমতি, কর্ণফুলি পাড়ের ছেলেরা আকাবা তীরে এসেও শুধু চাকরীতে ডুবে নেই, নিজেদের সংগঠিত সুন্দর জীবন গড়ার চেষ্টা করছে। ভিন দেশের লোকদেরকেও আলোকিত পথে উৎসাহিত করছে।

আকাবা উপসাগরের তীরে মাকনায় সূর্যাস্ত হলো সাতটা ছত্রিশ মিনিটে। আযান হলো সাতটা চল্লিশ মিনিটে। দশ মিনিট পর মাগরিবের জামাত দাঁড়ালো সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে। সাগর পাড়ের একটি সুন্দর মসজিদে মাগরিব আদায় করে আমরা আল্লাহকে শুকরিয়া জানালাম। আজ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টিকে তিনি আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রশস্ত আর বরকতময় করেছেন।

আমরা মাকনাকে বিদায় জানিয়ে আল বেদ-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ফেরার পথে আমরা আবার মূসা [আ]-এর স্ম"তির পাথর ঘেরা দেয়ালটির কাছে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ালাম।

মাকনা থেকে ফিরে আল বেদ শহরে রাত দশটার এক সমাবেশে যোগ দিলাম। গভীর রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অনেক সময় ধরে শুয়াইব নবীর ঘর-বাড়ী, মূসা নবীর কূয়া, ঝর্ণা ও তাঁর স্মৃতির পাথর, আর মাকনার বেলাভূমির স্মৃতিরা অনবরত আমার সাথে কথা বলে চললো।

বিদায় আল-বেদ

নয় ছয় সাতানব্বই। সোমবার। আল-বেদ-এ আরেকটি সূর্যোদয় দেখলাম। নিজাম ভাইদের সাথে নাশতা সেরে আল বেদ শহরটি পাখির চোখে ঘুরে দেখলাম। সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমানার এই ইতিহাস-প্রাচীন জনপদে আর কোন দিন ফিরে আসার সুযোগ পাব কি? মনের ভিতর অতৃপ্ত এক শুক পাখির ডানা ঝাপটানীর আওয়াজ টের পাচ্ছি।

আমার সাথে আছেন আলম সাহেব। এক সময় লেখালেখি ও সাংবাদিকতায় ঝোঁক ছিল। এক কথা দু'কথায় জানালেন বাহাত্তর-পঁচাত্তরে আমি যখন 'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিকটির সাথে যুক্ত তখন তিনি কখনো কখনো দু'চারটি লেখা নিয়ে আমার সাথে দেখা করেছেন। এখন তার সাথে বহু বছর পর আবার দেখা হলো মাদায়েনে এসে।

আলম সাহেব দেখালেন, বর্তমান আল বেদ শহরের অদূরে বালিয়াড়ির স্তূপের ওপর তৈরী করা হচ্ছে এক নতুন উপশহর। এখনো এ উপ শহরের কোন নাম দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

মরুভূমির মাঝখানে একটি বিরাট ন্যাচারাল পার্ক গড়ে তোলারও আয়োজন চলছে। এ যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের তেলেসমাতি! প্রদীপের ঘষায় দ্রুত বদলে যাচ্ছে মরুভূমির দৃশ্যপট। এই শহর এক সময় নতুন নামে পরিচিত হবে। একদার মাদায়েন এখন যেমন আল বেদ। তেমনি আল বেদ কখনো ইতিহাস হয়ে যাবে।

এভাবেই মানুষেরা নির্মাণ করে তাদের সময়কে। সে যুগ বাসি হয়ে আসে নবযুগ। নবযুগও এক সময় পুরনো হয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয়। আধুনিকতার পর আসে উত্তর আধুনিকতা। এ হলো ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক। ইতিহাসের শহর মাদায়েনে দাঁড়িয়ে আমি যুগান্তরের ঘুর্ণিপাক উপলব্ধি করতে করতে আল-বেদকে বিদায়ী সালাম জানালাম।

দুবা'র পথে কিয়াল ও শাওয়ার্মা

আলবেদ বা মাদায়েন পিছনে রেখে আমরা দুবা'র উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মাদায়েন থেকে দুবা নগরীর দূরত্ব একশ ষাট কিমি। বিশ কিমি পথ যাওয়ার পর বামে মোড়। সোজা রাস্তা চলে গেছে 'শেখ আল হামিদ'-এর দিকে। শেখ আল হামিদের পরেই অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে না গিয়ে ছুটছি ভিন্ন দিকে। আমাদের প্রথম কাবা বায়তুল মুকাদ্দাস। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থান। কবে সে মসজিদ আবার আমাদের হবে?

আমরা কিয়াল নামে একটি ছোট জনপদ অতিক্রম করলাম। স্থানীয় লোকেরা কিয়ালকে উচ্চারণ করে গিয়াল। 'লোহিত' শব্দের সাথে 'গিয়ালে'র একটা সম্পর্ক আছে বলে কেউ কেউ বলেন। তবে খতিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি। গিয়ালের ওপারে লোহিত সাগরের তীরে মিসর ভূমি আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

কিয়াল থেকে আমরা শাওয়ার্মা পৌঁছুলাম। শাওয়ার্মা লোহিতের তীরে এক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর। সামুদ্রিক জাহাজে করে আনা মালপত্র এখান থেকে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে যায়। বন্দরের মালামাল সহজে সেসব শহরে পৌঁছানোর জন্য তাবুক পর্যন্ত সরাসরি প্রশস্ত সড়ক নির্মাণের তোড়জোড় চলছে। এজন্য পাহাড়-পর্বত কেটে বা ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন সড়ক নির্মাণের প্রাথমিক কাজ করা হ"ছে।

আমাদের দীর্ঘ পথের বাম ধারে বিস্তীর্ণ-পাহাড় পর্বত শ্রেণী। আর ডান পাশে লোহিতের স্রোতধারা। এমন চমৎকার দীর্ঘ সড়ক যাত্রার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। শৈল শ্রেণীকে এক পাশে রেখে আমরা যেন সমুদ্রের বেলাভূমিতে বিচরণ করছি। লোহিতের নীল স্রোতধারা নিয়ে ভাবছি। মনে হলো এই সাগরের নাম 'নীল সাগর' না রেখে লাল সাগর রাখলো কে?

আল-বেদ থেকে লোহিতের তীর ঘেঁষে এই পথ চলে গেছে জেদ্দা পর্যন্ত। এ হলো ইতিহাসের এক অতি প্রাচীন পথ। এই পথ আরবদের সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহার করা বাণিজ্য পথ। হাজার হাজার উট নিয়ে বাণিজ্যের বিশাল কাফেলা চলেছে এই

www.pathagar.com

তিহামার পথে। আমি যেন এখনো সে উটের কারাঁভার একটানা মিষ্টি মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

আল মুইলা ও দুবা বন্দর

আল মুইলা নামে একটি ছোট শহরে পৌঁছুলাম। নাম ফলকে 'আল মুইলা' দেখে চমকে উঠলাম। ডাঃ নূরুল হুদা থাকতেন মুইলাতে। ঢাকার মৌচাকে তার সাথে পরিচয়। আমি সৌদি আরব আসার সময় নূরুল হুদা সাহেব শিশু বিশেষজ্ঞ সরদার নূরুল ইসলামের ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন, তাবুক সফরের সময় সরদার সাহেবকে আপনার সাথী ও সহযোগী হিসেবে পাবেন। নূরুল হুদা সাহেবের সে ভবিষ্যত বাণী অনুসরণ করে আমি এখন সরদারজীর সাথি হয়ে আল মুইলা পাড়ি দিচ্ছি।

আল মুইলা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম দুবা বন্দর। ইংরেজী নাম ফলকে লেখা DIBA PORT. যাত্রীবাহী একটি মিসরী সামুদ্রিক জাহাজ এসে ভিড়লো। যাত্রীদেরকে এখানে আনা নেয়ার কাজ করছে সৌদি এ্যারাবিয়ান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বাস। এই বন্দরটি এখনো যাত্রী পারাপারের জন্যই ব্যবহার হচ্ছে। এ পথে নামমাত্র খরচে মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টায় মিসর ও সৌদি আরবের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। মিসর ও সৌদি আরবের মাঝে এ সামুদ্রিক অভিসার অনেকটা আমাদের যমুনা নদীতে আরিচা-নগরবাড়ী ফেরী পারাপারের মতো ব্যাপার। ছোট্ট এই সমুদ্র বন্দরটি মাল খালাসের উপযোগী আরো বড় বন্দরে পরিণত করার জন্যও আয়োজন চলছে।

দুবা পোর্ট থেকে সাতাশ কি.মি. দূরে আমাদের গন্তব্য দুবা শহর। শহরের তিন মাইল দূরে একটি চেকপোস্ট অতিক্রম করলাম। সেখানে আমাদেরকে চেক করা হলো না। কেউ কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না। সরদার ভাই বললেন, এর আগে যতবার এসেছি এখানে কড়া চেকিং-এর কবলে পড়েছি। কাগজপত্রে সামান্য এদিক-ওদিক হলে আর রা নেই। ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন। আরেকটু বেশী হলে নির্ঘাত গ্রেফতার। আমি বললাম, এবার নিশ্চয় বুজুর্গ চিনতে পেরেছেন!

দুবা শহরে দিন-রাত

দুবা শহরে প্রবেশের আগে আমরা দুবা পাওয়ার প্লান্ট ও ডি স্যালাইনেশন প্লান্ট দেখলাম। এরপর আমরা শহরে আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার রহমতউল্লাহ ভায়ের বাসায় পৌঁছুলাম।

দুপুরে আমাদের খাওয়ার দাওয়াত নারায়ণগঞ্জ-এর ফতুল্লাহর আবদুল আজীজ ভায়ের বাসায়। আমাদের আগমন উপলক্ষে আরো বেশ কিছু মেহমানকে দাওয়াত করা হয়েছে। সেখানে নানা ধরনের ভর্তা, ভাজি ও শাকের ব্যঞ্জন আর লাউপাতার স্যুপ পরিবেশন করা হলো। মেইন কোর্স শেষে যশোরের খাজুরার খেজুর গুড়ের পায়েস। মেহমানদের রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে সরদারজী মেজবানকে আগাম নোটিস দিয়ে রেখেছিলেন। আবদুল আজীজ ভাইর ছোট ছোট দুই মেয়ে রাহিমা ও মারইয়াম আর

www.pathagar.com

এক ছেলে ইছহাক। তারা আমাদের বিশ্রামের সময়টা নানাভাবে আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরিয়ে তুললো।

দুবা শহরে আমার বিকাল কাটলো একটি বাংলাদেশী হোটেলে। সেখানে রাত দশটা অবধি অভিবাসী বাংলাদেশীদের সাথে আমার নানাপ্রকার মানসিক লেনদেন চললো।

রাত দশটায় আমরা মিলিত হলাম আলোচনা অনুষ্ঠানে। বঙ্গোপসাগরের তীরের কক্সবাজার শহরের মতোই লোহিতের তীরে ছোট সুন্দর ঝকঝকে পরিকল্পিত শহর দুবা। আলোচনা অনুষ্ঠানে লোক সমাগম দেখে মনে হলো যেন সারা শহরের অভিবাসী বাংলাদেশীগণ ভেঙ্গে পড়েছেন এখানে। শ্রোতাদের মধ্যে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারসহ নানা স্তরের পেশাজীবী রয়েছেন। এ ছাড়া অন্য সকলকেও শিক্ষিত বলে মনে হলো।

ইঞ্জিনিয়ার রহমত ভাই তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পুরো অনুষ্ঠানটি অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। মনে হলো কোন স্টুডিওতে বসে অনুষ্ঠান করছি। আজকের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর তিনি ক্যাসেট-বন্দী করে সমগ্র তাবুক এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। সেভাবেই সামগ্রিক আয়োজন।

রাত দশটা থেকে একটা অবধি তিন ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠান চললো। এর পর খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম।

নতুন পথে তাবুক সফর

দশ জুন মঙ্গলবার সকাল দশটায় দুবা থেকে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদেরকে এখন নতুন সড়কে তাবুক ফিরতে হবে। আগে তাবুক থেকে প্রায় আড়াইশ কি.মি সফর করে মাদায়েন এসেছি। আল-বেদ থেকে দুবার দূরত্ব একশ ষাট কিমি। নতুন পথে দুবা থেকে তাবুকে আমাদের সফর হবে একশ বিরানব্বই কি.মি.।

মুঈন ভাই জানালেন, সাপের মতো আঁকা বাঁকা এই পথ। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় পর্বত গুঁড়িয়ে বিস্তর রিয়াল খরচে নির্মাণ করা হয়েছে দুবা-তাবুক এই সড়ক পথ। মনে মনে রোমাঞ্চিত হলাম– 'নতুন সড়কে সফর এবার হে পথিক সিন্দাবাদ।'

যাত্রার শুরুতে আমরা দুবা শহরের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় আবারও একটা চক্কর দিলাম। লোহিতের এ বেলাভূমি কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের মতো ততো বিস্তৃত বা সুন্দর নয়। কক্সবাজারে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম সামুদ্রিক বেলাভূমি। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে মানবিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে দুবায় পর্যটকদের জন্য এক অসামান্য আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের সৈকতে এর সামান্য ছিটে-ফোটা ছোঁয়া লাগলে কক্সবাজার সারা পৃথিবীর সকল সাগরপ্রেমী মানুষকে বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের ডগায় নাচাতে পারতো।

দুবা ছেড়ে আমরা তাবুকের পথে সমুদ্দুরের পিঠ থেকে পার্বত্য পথে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকলাম। সাগরের পিঠ থেকে দু'হাজার দু'শ ফুট উঁচুতে তাবুক শহর। আমাদের পথের

www.pathagar.com

দুই ধারে দুর্গম পর্বত শ্রেণী। এর মাঝখানটায় কিভাবে এই পথ তৈরী করা হয়েছে তা ভেবে অবাক হলাম।

এ পাহাড়ী এলাকায় শত শত কি.মি জুড়ে কোন মানব বসতি নেই। কালচে লাল রঙের নাঙ্গা পর্বত সারি বিশালকায় দৈত্যের মতো মাথা উঁচিয়ে তাদের কর্তৃত্বের পাহাড়াদারি করেছে। পাহাড়-পর্বত থেকে নেমে আসা ঢল যাতে সড়কের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য নানা জায়গায় পাথর দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। পানির গতিকে ভিন্ন খাতে বয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার পাশে জনমানব শূন্য স্থানে সড়কযাত্রীদের জন্য ছোট ছোট কয়েকটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছে।

দুবা থেকে ষাট কিমি সফর করার পর আমরা তাম্বায় পৌঁছুলাম। এখানকার সড়ক পথ তৈরি হয়েছে পর্বতের চূড়ার ওপর দিয়ে। আমরা যেন পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে গাড়ি হাঁকাচ্ছি। চারদিকে তাকিয়ে দেখি জনমানবহীন এই পার্বত্য বিস্তারের মাঝে অনির্বচনীয় এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাজ্যে আমরা প্রবেশ করেছি। মনে হলো, একান্ত একা হয়ে এই গহিন পর্বত কন্দরে হারিয়ে যেতে পারলেই কোহকাফ পুরির বানেছা পরীর সন্ধান পাওয়া যাবে। যার সন্ধানে আমাদের পুঁথি-কাব্যের সয়ফল মুলক সাত সাগর তের নদী পাড়ি দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে সুযোগ কই? এই সফর শেষে ফিরতে হবে তাবুক শহরে। সেখানে ইমরানের ইন্টারভিউর মুখোমুখি হবো। তারপর যেতে হবে টাডকো সফরে। সত্তর কি.মি. দীর্ঘ ও পঞ্চাশ কি.মি. প্রস্থ তাবুক এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী। সৌদি আরবের বৃহত্তম কৃষি খামার। সেখানে কয়েকশো বাংলাদেশী তাদের হৃদয়কে তোরণ বানিয়ে অপেক্ষা করছেন। এরপর হাইল। তা'য়ীপুত্র হাতেমের ঘর-বাড়ী। হাইলের হাতছানি কিভাবে উপেক্ষা করি! ■

www.pathagar.com

যেখানে মানুষ বড়

জাফর তালুকদার

সবার উপর মানুষ সত্য তার উপরে নাই।

শুধু কথায় নয়, এটা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ [সা]।

বিবি খাদীজার বিত্ত-বৈভব আর নবীজির মহিমায় অপার সুখ-শান্তিতে ভরপুর ছিল তাঁদের সংসার। কিন্তু তিন ছেলের অকাল মৃত্যুতে একটা চাপা দুঃখ ছিল মনে। কিন্তু বিধাতা এক অদ্ভুত উপায়ে এই কষ্ট লাঘব করেছিলেন তাঁদের মন থেকে।

হযরত খাদীজা 'ওকাজ' মেলা থেকে হঠাৎ যায়েদ নামে একটা দাস কিনে আনেন। তখনকার দিনে প্রভুদের ভোগ-বিলাসের জন্যে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হত তাদের। চুন থেকে পান খসার জো ছিল না। তাহলেই চলত নির্যাতনের স্টিম রোলার। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত বেলালও ক্রীতদাস হওয়ার কারণে চরম অপমান আর নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন মালিকের হাতে। পরে তিনি অর্জন করেছিলেন 'মুয়ায্যিনের' গৌরব।

নবীজির খেদমতে ন্যস্ত করা হল যায়েদকে।

কিন্তু যাঁর হৃদয় অন্যের দু:খে কাতর, তিনি কী করে নিজের সুখের জন্যে বন্দী করবেন একজন মানুষকে! তিনি কখনও কারো প্রভু হতে চান না।

www.pathagar.com

তাঁর কাছে দুনিয়ার সব মানুষ ভাই ভাই। মানুষের কাতারে দাস-প্রভুর সীমারেখা টেনে তিনি মানবাত্মাকে খাটো করতে পারবেন না।

বিশ্ব মানবের মুক্তিদাতা মুহাম্মাদ [সা] তাই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, 'যায়েদ, তুমি মুক্ত। যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পার।'

প্রিয় নবী যায়েদকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। পিতার মমত্বে সিক্ত হল সন্তানের হৃদয়। এই দৃশ্যে অভিভূত হয়ে অনেকে যায়েদকে যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বা মুহাম্মাদের পুত্র বলে সম্ভাষণ করতেন।

পিতার স্নেহে সন্তানের হৃদয় বন্দী হল নতুন গৃহকোণে।

এখানে বন্দীত্বের মর্মজ্বালা নেই। দাস বলে নেই প্রভুর উপেক্ষা আর রক্তচক্ষু। শাসন-শোষণ আর বঞ্চনায় তপ্ত হয়না মযলুমের হৃদয়। এখানে কেবলই অপার ভালবাসা আর স্নেহের অফুরান বন্ধন। এই মায়াবি শৃঙ্খল উপড়ে সে কী করে ফিরে যাবে আপন নিবাসে।

কিন্তু একসময় বুঝি সেই ডাক এল ফিরে যাবার।

একদিন যায়েদের বাবা আর চাচা এসে তার মুক্তির জন্যে ফরিয়াদ জানালেন নবীজির কাছে। এ ব্যাপারে তারা মুক্তিপণ দিতেও রাজি।

নবীজি তাদের আরজি শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, যায়েদকে তো অনেক আগেই মুক্তি দিয়েছি! সে ইচ্ছে করলে এখনই যেতে পারে।'

প্রিয় নবীর উদারতায় তারা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিনা পনে মুক্তিদান– এ যে কল্পনারও অতীত! সন্তানের আসন্ন মুক্তির আনন্দে বাবার উষ্ণ হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

এই অবুঝ পিতার কাছে এক বিরাট বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তখনও। মুক্তি পেয়েও যায়েদ কিছুতেই রাজি হল না বাবার সঙ্গে যেতে। সে প্রিয় নবীকে অনুনয়ের গলায় বলল, 'দয়ার নবীজি! দয়া করে এই অধমকে আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনিই আমার পিতা। আপনার খেদমতে আমার এই তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ করতে চাই।'

সবাই হতবাক হয়ে গেলেন এই ঘটনায়। কোন যাদু বলে মহানবী বশ করলেন এই ভিখেরীদাস বালককে। অন্যায় অবিচারের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে যখন একজন দাস মুক্তির জন্যে ছটফট করে, তখন এই বালক বাবা-মার রক্তের ঋণ অস্বীকার করে মনীবকে সহাস্যে মাথায় তুলে বসাল পিতার আসনে!

যায়েদের বাবা ছেলের আচরণে মোটেই রুষ্ঠ হলেন না। বরং খুশী মনে মুহাম্মাদের কাছে ছেলেকে রেখে রওনা হলেন বাড়ির পথে।

এই ঘটনায় নবীজির মনে অন্য এক চিন্তা উদয় হল। যায়েদকে এভাবে কাছে রেখে

www.pathagar.com

দিলে তার দাস-পরিচিতি কোনোদিনও ঘুঁচবে না। এমনকি সে হয়ত ভবিষ্যতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না কখনও তার আত্মীয়-স্বজনের মনে এ নিয়ে কাজ করবে এক ধরনের হীনমন্যতা আর গ্লানিবোধ। এই ভাবনা থেকেই তিনি যায়েদকে নিয়ে কাবাগৃহে হাযির হয়ে কুরাইশ নেতাদের সামনে ঘোষণা দিলেন, 'সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, যায়েদ আমার পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তার উত্তরাধিকারী।'

নবীজির ঘোষণায় সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এক অজ্ঞাত-কুলশীল ক্রীতদাস কী করে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী হতে পারে! নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের জয়গান গেয়ে এভাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মানুষের মনে।

পরবর্তীকালে এই ক্রীতদাস যায়েদই যুদ্ধ অভিযানে অতি গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন।

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই...।'- মহানবীর এই অমর শিক্ষা একজন ক্রীতদাসের জীবনে এমন চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।■

www.pathagar.com

বই কিনুন বই পড়ুন

প্রিয়জনকে ইসলামী বই উপহার দিন

বিশ্ববরেণ্য তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', সহীহ্ আল-বুখারী, মাসয়ালা-মাসায়েল, ইসলামী সাহিত্যরাজি, জীবনী গ্রন্থ, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও আরো অসংখ্য গ্রন্থের প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ওপর অভিযোগের পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ

আধুনিক প্রকাশনী

আপনার ব্যক্তিগত পাঠাগার, লাইব্রেরী ও বুকস্টলের জন্য আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে আসুন (ভি.পি. এবং ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমেও বই পাঠানো হয়।)

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয়কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ বই বিপণী বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

বরকতের ঝর্ণা

হাসান আলীম

পিতৃহারা জাবির। মাত্র কিছুকাল পূর্বে তার প্রিয় পিতা আবদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেছেন। পিতার বিয়োগ ব্যথায় তার কোমল হৃদয় ভারাক্রান্ত, বেদনার্ত। কে এখন তাকে আদর করবে? কে এই বিরাট সংসারের দায়িত্ব নেবে! নয় বোন, মা সহ বেশ বড় পরিবার। বটবৃক্ষের মত তার বাবা এতদিন ছায়া দিয়েছিলেন। কিছুই টের পাননি জাবির। কোন দায়িত্বের বোঝা ছিল না তার। কিন্তু এখন কি হবে, কিভাবে এই বিরাট সংসার চলবে?

সংসারের সে-ই একমাত্র পুরুষ। তার কাঁধেই পরিবারের ব্যয়ভার এসে চাপল। সংসারের ঋণের চাপ রয়েছে। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর পাওনাদারেরা জাবিরের নিকট এল। তারা সকলে অতিসত্বর ঋণ পরিশোধ করতে বলল।

জাবির অস্থির হয়ে পড়লেন। কি করবে সে এখন? হৃদয়ে পিতৃবিয়োগ ব্যথার ঘা না শুকাতেই প্রবল দুশ্চিন্তার আঘাত লাগতে লাগল।

জাবিরদের একটি ক্ষুদ্র খেজুর বাগান রয়েছে। এ বাগানের খেজুরে তাদের অভাবের সংসার কোনমতে প্রাণ সংবরণ করে।

খেজুরগুলো অন্যে নিয়ে গেলে তাদের নির্ঘাত না খেয়ে মরতে হবে। জাবির চিন্তা করলেন জান যায় যাক তবু মান রাখতে হবে। বাবার ঋণ শোধ করতে হবে। পাওনাদারদের সব খেজুর দিয়ে ঋণ শোধ

www.pathagar.com

করবে। কিন্তু দয়াশূন্য ইহুদীরা কি তা শুনবে? তারা যে একটি খেজুরও কম নেবে না, এক হালালাও ছাড়বে না।

জনৈক ইহুদী পাওনাদার জাবিরকে উদ্দেশ্য করে বলল কৈ, আমাদের দিনারগুলো দিয়ে দাও।

– এইতো দিচ্ছি।

দিচ্ছি; দিচ্ছি করে তোমার বাপ খতম হয়েছে। তুমি দিবে কখন? ইহুদীটি ক্ষিপ্ত হয়ে বলল।

– দেখুন, আমার বাবা শহীদ হয়েছেন। তাকে নিয়ে অমন কথা বলবেন না।

হ্যা, শহীদ বটে। পরদেশী এক লোকের ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ! মুহাম্মদ তোমাদের যাদু করেছে।

– কসম, খোদার! আমার নবী সম্পর্কে কটুক্তি করবেন না। আমি কিন্তু সহ্য করতে পারবো না।

যান, কাল এসে আপনার পাপ্য নিয়ে যাবেন। জাবির গম্ভীর কণ্ঠে ইহুদীকে বলল।

এ্যা, বলে কি! তোমার বাবাই দিতে পারেনি ঋণের দিনার। তুমি দিবে কিভাবে? তিরস্কার মিশ্রিত কণ্ঠে ইহুদী বলল।

– সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমাদের খেজুর বাগান আছে না। সব খেজুর কাল এসে নিয়ে যাবে। জাবির ইহুদীকে একটু উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলল।

ও, এই কথা। ঐ এক চিলতে বাগানের খেজুরের কথা শুনাচ্ছ! ওতে হবে না। দিনার তো প্রচুর দিয়েছি। খেজুরে ঋণ শোধ হবে না।

– ইহুদী বলল।

জাবির তাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলল– দেখ, আর কথা বাড়ায়োনা। কাল এসে তোমার দিনার নিয়ে যেও।

ইহুদীটি জাবিরের কথা শুনে হন হন করে দূরে সরে গেল।

জাবির চিন্তা করতে করতে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলেন– কি করা যায়। ইহুদীর বাচ্চাটি খেজুরে তৃপ্ত হবে না। আসলে যে পরিমাণ খেজুর হবে বাগানে– তাতে দেনা শোধ হবে না। অন্য চিন্তা তাঁর মাথায় ভর করল।

নবী মুহাম্মদ [সা] কে কাল মিমাংসার জন্য নিয়ে আসবেন, ইহুদীরা হয়ত নবীর সম্মানে তাঁর যে কোন রায় মেনে নেবে।

পরদিন নবীর উপস্থিতিতে ইহুদীটি আরও ক্ষিপ্ত হল। এখানেও মুহাম্মদ [সা]। বেচারা সবখানেই রয়েছে। এইতো সেদিন মদীনার ইহুদীরা তাঁর সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে– যে কোন মূল্যে তারা মদীনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে। মুহাম্মদ [সা]-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করবে, তিনি ধর্ম নেতা। মসজিদের ইমাম, রাষ্ট্র নেতা, কূটনীতিবিদ, সমরনীতিবিদ। কি নন্ তিনি!

www.pathagar.com

তিনি এসেছেন এই ক্ষুদ্র পারিবারিক ফ্যাসাদের মিমাংসা করতে! না, এটা সে মানবে না। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সবখানেই মুহাম্মদ [সা]-এর হস্তক্ষেপ কামনা করা যায় না। এমন সব বাজে চিন্তা করছে আর রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করছে ইহুদীটি। রাসূল [সা] ইহুদীকে অনুরোধের কণ্ঠে বললেন– তোমরা কিছুদিন সময় দাও অথবা যতটুকু সম্পদ আছে তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাক।

ইহুদীটি রাসূলের কথা মানতে নারাজ।

রাসূল [সা] জাবিরকে বললেন প্রত্যেক প্রকার খেজুরের স্তূপ আলাদা আলাদা করতে। জাবির নির্দেশমত করলেন। নবীজী খেজুর স্তূপগুলোর চারপাশে তিনবার করে চক্কর দিলেন। একটি স্তূপের নিকটে বসে জাবিরকে বললেন– তোমার ঋণদাতাদের ডাক।

রাসূল [সা] নিজ হাতে প্রত্যেক ঋণদাতার ঋণ পরিমাণ খেজুর ওজন করে দিতে লাগলেন।

জাবির মনে মনে ভাবলেন কোন রকমে ঋণ শোধ হলেই বাঁচেন তিনি। রাসূল যখন হাত লাগিয়েছেন। নিশ্চয়ই ফয়সালা হয়ে যাবে। বরকতে তার ঘর ভরে যাবে।

খেজুর বন্টন শেষে দেখা গেল একটি স্তূপের খেজুরই শেষ হয়নি। অন্য স্তূপগুলো উঁচু হয়ে রয়েছে। অথচ পাওনাদারও আর নেই। তাহলে এত খেজুর কোত্থেকে এল। তার ক্ষুদ্র বাগানে তো এত খেজুর ছিল না। ইহুদী পাওনাদার তার প্রাপ্য না পেলে জাবিরই কেবল অপমানিত হবেন না– বরং রাসূলের মনও ছোট হয়ে যাবে। রাসূল ছোট হবেন তা কি হয়! আল্লাহ রাসূলের আঙুলে বরকতের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। খেজুরে খেজুরে জাবিরের উঠোন ভরে গেছে। এ খেজুর আর শেষ হবে না।

ইহুদীরা অবাক হৃদয়ে পাওনা বুঝে নির্বাক চিত্তে ফিরে গেল।

খাদ্য, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দরিদ্র মুসলিম বিশ্ব ইহুদীদের অবরোধে, বেদখলে দিশেহারা। আল্লাহ কি রাসূলের দস্ত মোবারক দরিদ্র মুসলিম বিশ্বে বুলিয়ে দিবেন না?

বরকতের ঝর্ণায় মুসলিম বিশ্ব আলোকিত হবে, সমৃদ্ধ হবে আর ইহুদীরা হবে নির্বাক, নিশ্চুপ, নিশ্চল পাথর। ■

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক অগ্নি, নৌ, মোটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসায় প্রকৃত তাকাফুল বাস্তবায়নে আমরাই এগিয়ে

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১. *শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত;*

২. *লাভ-লোকসান বীমা গ্রহীতা ও কোম্পানীর মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন্টন;*

৩. *সুদমুক্ত খাতে বিনিয়োগ;*

৪. *তাকাফুল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা;*

৫. *ব্যবস্থাপনায় খোদাভীরুতা ও পেশাদারিত্বের অপূর্ব সমন্বয়।*

Takaful Islami Insurance Limited

তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

(সহমর্মিতা ও নিরাপত্তার প্রতীক)

প্রধান কার্যালয় ঃ

৪২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৭ম ও ৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ৭১৬২৩০৪, ৯৫৭০৯২৮-৩০, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৮২১২

ই-মেইল ঃ tiil@dhaka.net

www.pathagar.com

প্রাচ্যবিশেষজ্ঞগণের ডাহা মিথ্যাচার প্রেক্ষাপট সীরাতে রাসূল [সা]

ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম

পাশ্চাত্যের অনেকেই প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাদেরকে Orientalist বা প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ বলা হয়। তারা প্রাচ্যের অনেক ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে লিখেছেন। তবে তারা প্রাচ্যের ইসলাম ধর্ম তথা আরবী, কুরআন, রাসূল [সা]কে নিয়ে যতোবেশী গবেষণা করেছেন প্রাচ্যের অন্য কোন ধর্ম নিয়ে ততোবেশী গবেষণা করেন নি। আমরা আজ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যমুখী। তাদের অনুকরণ আমাদের কাছে প্রশংসনীয়। আমাদের অনেকেরই ধারণা এ সকল পাশ্চাত্যের বিদ্বানদের দেয়া তথ্য ও তাদের গবেষণাই চূড়ান্ত সত্য। তারা ভুলের উর্ধ্বে। জ্ঞানের জগতে তারাই শ্রেষ্ঠ। এমনকি ইসলাম সম্বন্ধে তাদের গবেষণালব্ধ সকল তথ্যই সমালোচনার উর্ধ্বে। তাদের গবেষণার ফলাফল নির্ভুল। আমাদের অনেকের মনেই এ ধারণা আজ বদ্ধপরিকর। পক্ষান্তরে বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম, নবী, রাসূল, কুরআন, হাদীস প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ও লেখা প্রায় ক্ষেত্রেই পক্ষপাতদুষ্ট। তারা ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাদের অনেকেই রাসূল [সা]-এর জীবনী রচনায়ও অংশ নিয়েছেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টির

www.pathagar.com

সেরা মানুষ। নৈতিকতা বোধে তিনি তুলনাহীন। সেই নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বকেও তারা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হননি। রাসূল [সা] সম্পর্কে তারা আজগুবি কথাবার্তার প্রশ্রয় নিয়েছেন। মিথ্যা বক্তব্য ও মন্তব্য করেছেন। অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের এই সত্যদ্রোহী, বাস্তবমুখী চরিত্র উন্মোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার মাধ্যমে তাদের এই পক্ষপাতদুষ্ট, ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন করা অতীব জরুরি।

পাশ্চাত্যে প্রাচ্যকেন্দ্রিক গবেষণার সূচনা

পাশ্চাত্য ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না। এমনকি সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দেও তাদের নিকটে ইসলাম একটি মূর্তিপূজার ধর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল। এই শতাব্দীতে সেখানে রেঁনেসার সূত্রপাত হয়। নিজেদের প্রয়োজনেই সে সময় তারা ইসলামকে জানতে শুরু করেন। এই প্রেক্ষাপটেই তাদের মধ্য হতেই প্রাচ্য বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হয়। শুরু হয় অসংখ্য আরবি পুস্তকের অনুবাদ। বিশেষ করে আরবিতে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদ করাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এই সকল ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– আরপ নিউস [Arp], মারগুলিউস এডউর, পুকক [Pococke] ও হ্যাটিনজার [Hattinjer]। অনেকটা কাকতালীয়ভাবে এ সময়ে আরবি থেকে অনূদিত প্রায় সকল ইতিহাস গ্রন্থের লেখকরা ছিলেন খ্রিস্টান। যেমন সায়ীদ বিন বতরীক [মৃ. ৯৩৯ খ্রি.], ইবনি আমীদ আল-মাক্কীন [১২৭৩ খ্রি.], আবুল ফরজ ইবনুল আরাবী আল-মালতী [১২৮২ খ্রি.]। তারা সকলেই ছিলেন আরবিভাষী খ্রিস্টান।

অষ্টাদশ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপে ইসলাম, আরব, প্রাচ্য সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। ইসলামকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ সময় থেকেই তারা জানতে শুরু করেন। ইসলাম সম্পর্কে লেখাও প্রকাশিত হয় এ সময় থেকেই। এমনকি ১৮৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপে প্রত্যহ গড়ে একটি করে ইসলাম বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। ১৮০০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইউরোপে ইসলাম বিষয়ে প্রায় ষাট হাজার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ইসলাম ও ইসলামী বিশ্ব নিয়ে গবেষণার জন্য শুধুমাত্র আমেরিকাতে ৫০টির বেশী গবেষণাগার রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থান হতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রায় তিনশ' ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। বিগত একটা বছরে ইসলামকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে অসংখ্য কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছে প্রায় ত্রিশটি। অক্সফোর্ড সম্মেলন ছিল তন্মধ্যে অন্যতম। সেখানে প্রায় নয়শ' প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ একত্রিত হন। এর সবগুলোর উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদের থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জায়গা লাভ করা। মুসলমানদেরকে সকল ক্ষেত্রেই পদানত করে রাখার অভিনব কলাকৌশল উদ্ভাবন ছিল এদের অন্যতম লক্ষ্য।

পাশ্চাত্যে সীরাত চর্চা

পাশ্চাত্যে সীরাত চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এ সময়ে সীরাতে রাসূল [সা]-এর উপরোল্লিখিত প্রায় সকল আরবি পুস্তক ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। সর্বপ্রথমে Reiske [১৭৭৪ খ্রি.] আবুল ফাদা' রচিত ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থ পাদটিকাসহ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় সেই সময়েই।

www.pathagar.com

অষ্টেরীয় প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ Kremer [১৮২৮-১৮৮৯] ১৮৫৬ সালে মুহাম্মাদ বিন অকিদী [৭৪৭-৮২২]-এর কিতাবুল মাগাযী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৬০ সালে ইবনি হিশাম [৮২৮ খ্রি.] রচিত সীরাতে রাসূল, আলী নূরুদ্দীন সামহুদী [১৫০৬ খ্রি.] রচিত মদিনার ইতিহাস ও ইবনি কুতাইবা [৮২৮-৮৮৯ খ্রি.] রচিত তারিখুল মা'য়ারিফ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৬৪ সালে ড. G. Well সীরাতে ইবনি হিশামকে জার্মানি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৭৭ সালে ফ্রান্সের অধ্যাপক Manet Edouard [১৮৩২-১৮৮৩] আলী বিন আল হুসাইন আল-মাসউদী [৯৫৬]-এর মুরুয-উয-যাহাব প্রকাশ করেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে Wellhausen মুহাম্মদ ইবনে উমার আল-অকিদী [৭৪৭-৮২২]-এর কিতাবুল মাগাযী জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ সালে Houstasma আহমাদ বিন অদিহ আল-য়া'কুবী [৮৯৭ খ্রি.]-এর রচিত ইতিহাস গ্রন্থকে দু'খণ্ডে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর সাধ্যসাধনার পরে J. Barth ও Moldcke [১৮৩৬-১৯৩০] মিলে আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তবারী [৯২৩] কর্তৃক রচিত প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ "তারীখুল উমাম অল মুলূক" গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইবনি সা'য়াদ মুহাম্মাদ আয-যুহরী [৮৪৫] কর্তৃক রচিত "কিতাবুত্-তবাকাতুল কুবরা" এক নজীর বিহীন গ্রন্থ। রাসূল [সা]-এর জীবনীর ওপর এত বিস্তৃতভাবে অন্য কোন গ্রন্থে আলোচনা হয়নি। জার্মানের অধ্যাপক Sachuu এ নিরলস চেষ্টা ও তার সাথীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯০০ সাল থেকে এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড করে প্রকাশনা শুরু হয়।

এ সকল মূল গ্রন্থ অথবা অনুবাদ গ্রন্থ ইউরোপ ও আমেরিকাতে ইসলামের ইতিহাস, বিশেষ করে রাসূল [সা]-এর সীরাত চর্চার পথ উন্মুক্ত করে। তারা এ সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনকি এগুলো থেকে প্রভাবিত হয়ে তারাও রাসূল [সা]-এর জীবনী লিখতে শুরু করেন। আস্তে আস্তে রাসূল [সা]-এর সীরাত নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়। তাদের কেউ কেউ মুহাম্মাদ [সা]-এর সীরাত লেখকদের তালিকাভুক্ত হওয়াকেও সৌভাগ্য মনে করতেন।

সীরাত চর্চায় ডাহা মিথ্যাচার

প্রাচ্য বিশেষজ্ঞদের যারা রাসূল [সা] সম্পর্কে কথা বলেছেন, অথবা তার সীরাত বা জীবনী রচনা করেছেন দুই-একজন ছাড়া তাদের প্রায় সকলেই যে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। উদাহরণস্বরূপ রাসূল [সা]-এর জীবনের দু'টো একটি বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো। যেসব বিষয়ে তারা অসত্যের অবতারণা করেছেন। মিথ্যার প্রশ্রয় নিয়েছেন। এমনকি সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ হননি। সীরাত কেন্দ্রীক আলোচনায় তারা যেসব বিষয়ে ডাহা মিথ্যাচারের প্রশ্রয় নিয়েছে তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে–

অহি ও রিসালাত : তাদের ভাষায় "আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মাদের নিকটে কোন অহি আসেনি।" এর অর্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত রাসূল বা নবী ছিলেন না। কুরআনও আল্লাহর বাণী নয়। সুতরাং ইসলামের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

"Mohammed at Makka" ও "Mohammed at Medina" গ্রন্থদ্বয়ের লেখক Montogomary Watt এ প্রসঙ্গে বলেন– "মুহাম্মাদের রাসূল হওয়া ও তার নিকটে

www.pathagar.com

কুরআন অবতীর্ণ হওয়াটা স্বকল্পিত ধ্যান-ধারণা মাত্র। বাস্তবে অহি বলতে বাহিরের কোন কিছু তার নিকটে আসেনি। বরং তিনি রিসালাত ও অহি সম্পর্কে যা কল্পনা করতেন সেইটাকে রিসালাত ও অহি বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি রাসূল ছিলেন না। তার কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়নি।" তিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে রাসূল [সা]-এর হাদীসের ভাব-ভাষা ও কুরআনের ভাব-ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার কারণের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনিই বলেন- "দু'টোই মুহাম্মাদের রচিত। যা তিনি অবচেতন মনে রচনা করেছেন তাই কুরআন, আর যা' স্বাভাবিকভাবে রচনা করেছেন তাই হাদীস।

তিনি আসলে এই বক্তব্যে কুরআনের অলৌকিকত্বের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। কুরআন যে সর্বকালের, সকল যুগের, সবার জন্য মহাচ্যালেঞ্জ; সে সম্পর্কে হয়ত তিনি জেনেও না জানার ভান করেছেন অথবা না জেনে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন। নিরক্ষর মুহাম্মাদ [সা]-এর পক্ষে এই মহাচ্যালেঞ্জ নামক জীবন ব্যবস্থা প্রণয়নকে সম্ভব বলা, পাগলামী বা সত্যদ্রোহী বৈ কিছু নয়। দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরেও এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার দুঃসাহস কেউ দেখায়নি, এইটুকুই যথেষ্ট যে, এটি মহান স্রষ্টারই বাণী। সেই শাশ্বত সত্যই উচ্চারিত হয়েছে কুরআনেই- "আল কুরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে, বরং এটি পূর্ববর্তী যা তাদের কাছে এসেছে তার সত্যতা স্বীকার করে ও তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে। এটা যে বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষ থেকে আসা তাতে কোন সন্দেহ নেই।" [১০ : ৩৭]

অতি সম্প্রতিকালে প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ হাড্ডাড নামক এক অপরিচিত লেখকের দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি হচ্ছে- "Mohammed and the Qur'an" ও অপরটি হচ্ছে- "Jesus and the Qur'an"। এ বই দু'টিতে মুহাম্মাদ [সা]-এর অরাকাহ ইবন নাওফালের সাথে পনের বছরের সম্পর্ক প্রমাণের অপচেষ্টা চালান হয়েছে। লেখকের ভাষায় অরাকাহ মুহাম্মাদের সাথে খাদীজার বিবাহ দেন। এটি এই সম্পর্কের বাস্তব প্রমাণ। দীর্ঘ এই সম্পর্ক থাকার কারণেই মুহাম্মাদ [সা] খ্রিস্টান ধর্মগুরু অরাকার নিকট থেকে অহি প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং ইসলামে যে অহির কথা বলা হয় তার উৎসই হচ্ছে, অরাকা ইবনে নাওফাল। এখানে ঐতিহাসিক দিক থেকে সর্বস্বীকৃত তথ্যের বিপরীতকে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা উক্ত লেখকের পক্ষপাতিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত এটাই যে, হযরত খাদীজাহ [রা]-এর চাচা আমর ইবন আসাদ-ই খাদীজার সাথে রাসূল [সা]-এর বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং সেখানে অরাকাকে টেনে আনা ইতিহাসের স্বীকৃত সত্যকে আড়াল করার অপপ্রয়াস। ইসলামের অহির উৎস খ্রিস্টানরাই, তা প্রমাণের ব্যর্থ অপচেষ্টা।

তাদের কেউ কেউ মনে করেন- "মুহাম্মাদের কাছে প্রথম অহি এসেছিল অরাকাহ থেকে। দ্বিতীয় অহি এসেছিল হিরা গুহায়।" এখানে হিরা গুহায় আসা অহি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তার অস্পষ্ট স্বীকৃতি থাকলেও তা কিন্তু তারা স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা পেয়েছেন। তাদের আবার কেউ কেউ সত্যের এই অপলাপও করেছেন যে, মুহাম্মাদের অহি য়াহুদি ধর্মযাজক বুহায়রার কাছ থেকে প্রাপ্ত। এমনকি ইসলামের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলোই এই বুহায়রার অবদান, তারা এমন অবাস্তব ও মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করেননি। ■

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল [সা]

ড. মাহ্ফুজ পারভেজ

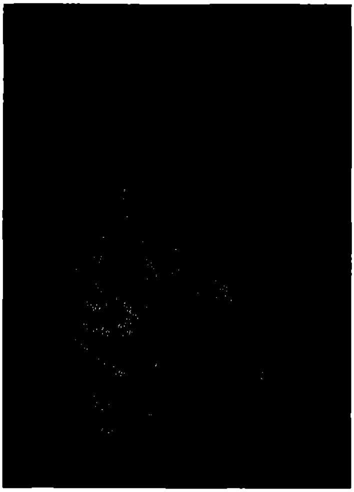

শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম ও ওফাতের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত রবিউল আউয়াল মাস। এ মাসের ১২ তারিখ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আর তাঁর জীবনের অবসানও হয় ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে। তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রেরিত নবী ও রাসূল; তিনি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে শুরু আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে-পরিসমাপ্তি হয়েছে নবী-রাসূলদের সিলসিলা। পূর্ণতা পেয়েছে দীন ইসলাম। পরিপূর্ণ হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার বাণী, হুকুম, আহকাম মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দাওয়াতি মিশন। এখন সেই মিশনকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মানুষের সামনে রয়েছে দু'টি উপকরণ।

www.pathagar.com

একটি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কিতাব বা আল কোরআন আর অন্যটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-কর্ম-কথার নির্যাস আল-হাদিস। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি বা নাজাতের মাধ্যম হলো এই কুরআন ও হাদিস।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের বরকতে এবং তাঁর মহান শিক্ষার বদৌলতে বদলে গেল পৃথিবী, বদলে গেল পৃথিবীর অনাচার, কুপ্রথা ও অন্ধকার। মানবতার উত্তরণ ঘটল গ্রীষ্মের খরতাপ, লু-হাওয়া, প্রচণ্ড দাহ ও দুর্ভিক্ষ ঘেরা এক ভয়ঙ্কর ঋতু থেকে এমন এক ঋতুতে, যেখানে গলাগলি করছে ফুল আর বসন্ত, যেখানে উদ্যান ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছলছল প্রবাহের উচ্ছল ঝর্ণাধারা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের বরকতে এবং তাঁর মহান শিক্ষার বদৌলতে বদলে গেল মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের হৃদয়গুলো আপন প্রতিপালকের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। মানুষ ব্যাপকভাবে ধাবিত হল আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অভিমুখে। মানুষ সন্ধান পেল এক নতুন স্বাদের, এক নতুন রুচির, এক নতুন ভালোবাসার।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের বরকতে এবং তাঁর মহান শিক্ষার বদৌলতে আইয়ামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগের ঘুমন্ত, নিস্তেজ হৃদয়গুলো জেগে উঠল ঈমানের উষ্ণতায়, মায়া-মমতার পরশে। তৎপর ও উদ্যমী মানবকুল দলে দলে বেরিয়ে এল সরলপথ বা সিরাতুল-মুস্তাকিম-এর সন্ধানে; কল্যাণ-নাজাত-মুক্তির অন্বেষণে। আরব, আযম, মিসর, তুর্ক, ইরান, খোরাসান, আফ্রিকা, স্পেন, হিন্দুস্তান, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সমরখন্দ, বোখারা তথা পৃথিবীর সর্বত্র মনে হল মানবতা যেন আবার জেগে উঠেছে, চেতনা পেয়েছে; দীর্ঘ ও গভীর নিদ্রাশেষে পুনরুত্থানের জাগরণে উজ্জীবীত হয়েছে।

কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকাকালীন যে সুদীর্ঘ সময় কেটে গেল তার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে? আর তা যে না হলেই নয়! এ ক্ষতিপূরণের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠল আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার আল কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আল হাদিসের আলোয় আলোকিত একদল দাঈ, মুখলিস, নিষ্ঠাবান মুজাহিদ, সংস্কারক, প্রশিক্ষক, সৃষ্টির শোক-ব্যথায় সমভাগী, মানবতার কল্যাণে আত্মোৎসর্গীকৃত ও নিবেদিতপ্রাণ এবং এমন সব মনীষী ও ব্যক্তিত্বগণ, নূরের ফেরেশতাকুলের কাছেও যাঁরা ঈর্ষণীয়।

তাঁরা সবাই মিলে কি করলেন? বিরান ও অনাবাদী হৃদয়গুলোকে আবাদ করলেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রেমের মশাল জ্বেলে। বইয়ে দিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও হিকমত-মারেফত-জিহাদের হাজারো সালসাবিল। নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করলেন জুলুম-নিপীড়ন, অন্যায়-অবিচার এবং দুশমনী ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদদীপ্ত এক প্রচণ্ড বিদ্রোহী আন্দোলন। নির্যাতিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত

www.pathagar.com

মানবতাকে শিক্ষা দিলেন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং উপেক্ষিত, বিতাড়িত ও অসহায় মানব গোষ্ঠীকে টেনে নিলেন সেই বুকে, যে বুকে আবাদ বা চাষাবাস হয় কেবলই প্রেম-মায়া-মমতা-ভালোবাসা-ত্যাগ-সৌহার্দ্য-কল্যাণ!

মানবতার সেবায় নিবেদিত একটি জামাত বা দল থেকে পৃথিবী কখনওই বঞ্চিত হয়নি। এরা অতীতে ছিলেন, বর্তমানেও রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। এদের সংখ্যা নিরুপণ করা অসম্ভব। এদেরকে আলোচনা করতে হবে গুণ দিয়ে সংখ্যা দিয়ে নয়। এরা কোয়ানটিটির ধার ধারেন না কোয়ালিটির দিকে লক্ষ্য রাখেন। ইতিহাসের পাতায় তাকালে দেখা যাবে এদের উন্নত চিন্তা, জাগ্রত বিবেকবোধ, প্রশান্ত আত্মা, তীক্ষ্ণধী ও নির্মল স্বভাব-চরিত্রের আলোকিত শত-উদাহরণ, যা বদলে দিয়েছে পৃথিবীর অন্ধকারকে রাঙা প্রভাতের ঠিকানায়। গভীরভাবে তাকালে আরও দেখা যাবে: এরা কেমন করে আর্ত মানবতার ব্যথায় ব্যথিত হতেন এবং নিজেকে তাদের সেবায় বিলিয়ে দিতেন। সৃষ্টিলোকের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁদের পবিত্র অন্তরাত্মা বিগলিত হত সমবেদনায়, সহমর্মিতায়, সৌহার্দ্যে। মানবতার মুক্তির স্বার্থে নিজেদেরকে যে কোনও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতেন তাঁরা হাসিমুখে। আর তাঁদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকগণও ছিলেন পূর্ণ দায়িত্বসচেতন, আমানতদার। একদিকে রাত জেগে জেগে ইবাদত-বন্দেগিতে থাকতেন মশগুল আর অপর দিকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিও রাখতেন সদা-সতর্ক দৃষ্টি। শাসক-শাসিতের মধ্যে কোথাও কোনও অমিল, বিরোধ বা দূরত্ব কল্পনাও করা সম্ভব ছিল না। সকলের মধ্যে ছিল অদ্ভুত ঐক্যতান ও সহযোগিতা। এদের মুনাজাত, দো'য়া, ইবাদত, দুনিয়াবিমুখতা, চারিত্রিক উৎকর্ষ, মাহাত্ম্য, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, নম্রতা, ত্যাগ, সততা, সাধুতা, দয়া ও করুণা অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছিল। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই আস্থা-শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের উজ্জ্বল উপমাকে তুলে ধরতে বাধ্য হন।

মনে হতে পারে, তাঁদের ব্যক্তিগত সাফল্য ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা বুঝি কবি বা সাহিত্যিকের কল্পনামাত্র। সত্যি বলতে, ইতিহাসের সে সকল অবিচ্ছিন্ন সূত্র, স্বাক্ষ্য ও সনদ সংরক্ষিত না থাকলে এবং নির্ভরশীল-বিশ্বস্ত বিবরণ না পেলে অনায়াসে এই সত্য ঘটনাকে কল্পকাহিনী ও উপকথা বলে চালিয়ে দেওয়া হত। সত্যি, এই মহান বৈপ্লবিক পরিবর্তন-সমাজে ও মানুষের মননে সম্ভবপর করেছিলেন শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সূচনা করেছিলেন এক গৌরবদীপ্ত মানবিক নতুন যুগের। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অসীম রহমতের মহাদানে শান্তির দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নতুন যুগের আহ্বান স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিল। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যথার্থই বলেছেন যে: "আমি তো তোমাকে

www.pathagar.com

জগতসমূহের জন্য কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি"। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭]
বস্তুতপক্ষে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অপার রহমতের নিদর্শন নিয়ে আগমন ঘটে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর। তিনি সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। তিনি অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী। তিনি শুধু একজন ধর্মপ্রবর্তকই নন, মানব সমাজের জরাজীর্ণ ও ঘুণেধরা কাঠামোর সফল সংস্কার ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনকারী। গোটা বিশ্বে বর্তমানে বিরাজমান অশান্তি, নৈরাজ্য, হানাহানি, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার অবসানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষা প্রকৃতভাবে পালন ও গ্রহণই একমাত্র উপায়। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি, কল্যাণ ও নাজাতও নিহিত রয়েছে সীরাত ও সুরতের মধ্যেই, তাঁর সুন্নাহর মধ্যে।
প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান যুগ ও আগামী দিনের অনাগত যুগ সম্পূর্ণরূপে শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আবির্ভাব, তাঁর ব্যাপকভিত্তিক চিরন্তন দাওয়াত, তাঁর মানবতাবাদী-কল্যাণকামী চেষ্টা-সাধনা-ত্যাগ-তিতিক্ষার কাছে ভীষণভাবে ঋণী। তিনিই নাঙা তলোয়ারের নিচ থেকে বিপন্ন মানবতাকে উদ্ধার করেছেন। অতঃপর মানবতার হাতে তুলে দিয়েছেন এক নতুন উপহার যা মানবতাকে দান করেছে এক নতুন জীবন, নতুন জীবনবোধ, নতুন উদ্যম, নতুন শক্তি, নতুন প্রতীতি, নতুন সম্মান এবং নতুন করে পথচলার হিম্মত-সাহস-পাথেয়। আর সেই উপহারের বদৌলতেই মানবতা তাহযিব-তমদ্দুন-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা-কৃষ্টি-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রযুক্তি সর্বোপরি ন্যায়নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতা এবং চরিত্র ও সমাজ দর্শনের মাপকাঠিতে নতুন করে মানুষ গড়ার সমাজ গড়ার কত হাজারও মনযিল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনা, সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রণোদনা এবং প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তিতে পৃথিবী ভরে উঠেছিল সোনালী মানুষে। পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল স্বর্ণযুগ। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলেন:
"আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে; যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ ও কিয়ামত দিবসের আশা রাখে এবং যারা আল্লাহকে অনেক স্মরণ করে"।
আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালতের সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছেন। তাঁকে আপন মাহবুব বানিয়েছেন এবং উত্তম আদর্শ ও মনোনয়নে মনোনীত করেছেন। তিনি বিলাসী ও আরাম-আয়েশের জীবন কেবল নিজের জন্যই অপছন্দ করতেন না, বরং আহলে বায়ত [নবী পরিবার]-এর জন্যও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু রিযিকই দিও।" হযরত আবু

www.pathagar.com

হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: "শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আবু হুরাইরার জীবন! আল্লাহর নবী ও তাঁর পরিবারবর্গ কখনও উপর্যুপরি তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে খেতে পারেননি আর এ অবস্থায় তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন।"

যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করেন এবং শেষ হজ্জ্ব আদায় করেন, তখন তাঁর সামনে ছিল মুসলমানদের জনসমুদ্র, সমগ্র আবর ভূখণ্ড ছিল তাঁর পদানত, অথচ তাঁর নিজের অবস্থা ছিল একজন দরিদ্রের ন্যায়; তাঁর গায়ে ছিল একটি মাত্র চাদর, যার মূল্য ছিল মাত্র চার দিরহামের বেশি ছিল না। সেই সময় তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! একে তুমি এমন হজ্জ্ব বানাও যার ভেতর রিয়া [লোক দেখানো] ও খ্যাতির কামনা যেন না থাকে।"

উজ্জ্বলতম অনুসরণীয় আদর্শের মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য এক অনন্য আলোকবর্তিকা। সকল ধরনের শোষণ-নিপীড়ন, জুলুম-অত্যাচার, অজ্ঞানতা-অন্ধকার-কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে জ্ঞান-শান্তি -আলোর অনিঃশেষ ঝর্ণাধারা তিনি। তিনি মানবতার মুক্তির মহান দূত। সারা বিশ্ব জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ। তাঁর মিশন, তাঁর কথা, তাঁর কর্ম যা আল কুরআন ও আল হাদিসের মাধ্যমে আমরা আজও অনুপ্রেরণার উৎসরূপে বুকে জড়িয়ে ধরে পেতে পারি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তি এবং সমগ্র বিশ্বকে করতে পারি সকল অনাচার-হানাহানি থেকে মুক্ত এক শান্তির বাগান।

তাঁর প্রতি আমাদের দরুদ ও সালাম: বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও সহচরদের প্রতিও সালাম। ■

www.pathagar.com

চারিত্রিক উন্নয়নে রাসূলের [সা] আদর্শ

ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম

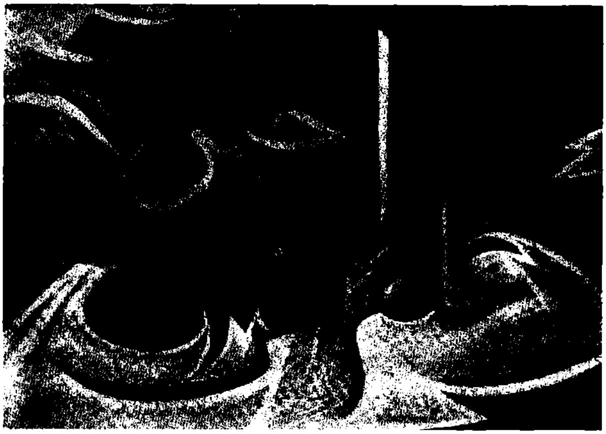

চরিত্র মানব জীবনের একটা মহাসম্পদ– মানব ও পশুর মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টির এবং জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নবীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর মুহাম্মাদ [সা]-কে প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব চরিত্রকে এর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পরিপূর্ণতা দান করা। তবে সর্বোচ্চতার এ মানদণ্ড বা উদাহরণ কে? কার জীবনকে সামনে রেখে গঠন করা হবে চরিত্র? দ্বিতীয়ত: চরিত্র কি? কি কি কাজ বা আচরণ চরিত্রকে ভাল করে বা খারাপ করে? চরিত্র গঠন করলে এর দ্বারা কি কি ফায়দা হবে? এ বিষয়ে কিছু বলার লক্ষ্যেই প্রণীত হচ্ছে এ প্রতিবেদন।

চরিত্র কি?

চরিত্রের আরবী শব্দ হচ্ছে 'খুলক'। এর বহু বচন হচ্ছে আখলাক। এ যাবৎকাল অধিকাংশ লিখনীতে চরিত্র গঠনের পদ্ধতিই বেশী স্থান পেয়েছে। চরিত্র কি? এর উপাদানসমূহ কি কি? এসব বিষয়ে একেবারে নগণ্য আলোচনাই হয়েছে। অথচ মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন : "ইন্নামা বুয়িছতু লিউতিম্মা মাকারিমা আল আখলাক।"[১] অর্থাৎ– মানব চরিত্রকে এর পরিপূর্ণতা বিধানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যেই কাজের জন্য মহানবীর [সা] প্রেরণ বা নবুওয়াত দান, সে বিষয়টি হলো চরিত্রের পরিপূর্ণতা দান। এর অর্থ

www.pathagar.com

চরিত্র উন্নত হলে যাবতীয় কার্যক্রম উন্নত হবে, চরিত্র স্বয়ংক্রীয় ভূমিকা পালন করবে। যে চরিত্রের অতো গুরুত্ব সে চরিত্রটা তাহলে কি?

আরবী ভাষায় খুলক এর অর্থ হলো : সহজাত প্রকৃতি, প্রাকৃতিক মেজাজ, আচরণ ব্যবহার।[২] ইমাম আল গাজালীর মতে, "চরিত্র [আখলাক] হচ্ছে মানবাত্মার সে নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী অবস্থার নাম যেখান থেকে কোন প্রকার চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই স্বয়ংক্রীয়ভাবে মানুষের আচরণসমূহ বেরিয়ে আসে। এ আচরণ বা কাজগুলো যদি ভাল হয়– তা যদি ইসলামী শরীয়া এবং বিবেক দ্বারা সমর্থিত হয়– তাহলে এ আচরণ বা কাজসমূহকে বলা হবে ভাল চরিত্র। বিপরীত পক্ষে স্বয়ংক্রীয়ভাবে বেরিয়ে আসা কাজগুলো যদি ভাল না হয়– ইসলাম শরীয়া এবং বিবেক দ্বারা সমর্থিত না হয়– তাহলে একে বলা হয় খারাপ চরিত্র।"[৩]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, খুলক কোন কর্ম বা আমলের নাম নয়– বরং তা হচ্ছে মানবাত্মার একটা স্থায়ী ও বিধিবদ্ধ অবস্থার নাম। মানবাত্মার এ অবস্থা সম্পর্কে মহানবী বলেন, [লিকুল্লি জাসাদিন মুদ্গাহ] প্রতি দেহে একটি গোশত পিণ্ড আছে। এ পিণ্ডটি সুস্থ থাকলে সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে– আর এটি অসুস্থ হলে সমস্ত দেহই অসুস্থ থাকে– আর তা হলো কালব বা আত্মা।[৪]

মানবাত্মার এ স্থায়ী অবস্থাকে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক এর সাথে বা টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটের সাথে তুলনা করা যায়। কম্পিউটারে যে যে প্রোগ্রাম সংস্থাপিত থাকে- বাটন টিপলে ঐ প্রোগ্রামটাই বেরিয়ে আসবে। তেমনি যে আত্মার সত্যবাদিতা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন অবস্থায় একজন ব্যক্তির আচরণ থেকে কেবল সত্যবাদিতাই বেরিয়ে আসবে।

উন্নতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে মহানবীর চরিত্র

যে যে আচরণের ফলে একটা চরিত্রকে উত্তম চরিত্র [আহসানুল খুলক] বলা যায়– সে চরিত্রের অধিকারী ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ [সা]। এ ব্যাপারে আল্লাহর সনদ হচ্ছে : যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর নবীর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ– [লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা][৫] চারিত্রিক পরিপূর্ণতা সম্পর্কে কুরআনিক সনদ হচ্ছে : নূন-কলমের শপথ। আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন, আপনার জন্য রয়েছে অপূরণীয় পুরস্কার– আর আপনার চরিত্র পৌঁছেছে এর সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতায় [ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম]।[৬]

আসমানী সার্টিফিকেটের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন তার সাথী-সংগীগণ। তাদেরই দু'জন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী আয়েশা এবং তার গৃহভৃত্য আনাস। তাঁরা বলেন, সকল মানুষের মধ্যে আল্লাহর নবীর চরিত্র ছিল সর্বোত্তম- [কানা রাসূলুল্লাহ আহসানান নাসু খুলকান]।[৭] অপর এক বর্ণনায় আয়েশা [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহর [সা] চরিত্রই হচ্ছে আল কুরআন- [কানা খুলকুহু আল কুরআন][৮] এর অর্থ হচ্ছে কুরআনে যা পালন করতে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে তিনি হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কুরআনে যা বর্জন করতে বলা হয়েছে- তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তা বর্জন শুরু করেছেন।

যে চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই মহানবীর আগমন– যার চরিত্রের সার্টিফিকেট দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবীর সাথী-সংগীগণ ইতিহাসে তিনিই একমাত্র অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় ব্যক্তি। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে মুসলিমদের হাতে এ বিশাল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার মুসলিম সমাজ আজ সবচেয়ে বেশী চারিত্রিক সমস্যার শিকার। পবিত্র কুরআন-হাদীসের ভাণ্ডার অটুট থাকার পরও, প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ আল্লাহর গোলামী স্বীকার করে নামায আর তাসবীহ্ করার পরও বাংলাদেশ পরপর ৫ বার বিশ্বের প্রধান দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের খেতাব পেয়ে আসছে। এর অন্যতম কারণ চারিত্রিক পদস্খলন। কিসে চরিত্র ভাল হয় আর কিসে হয় তা খারাপ এ অনুভূতি না থাকা এবং খারাপ চরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল থাকা, ব্যাখ্যার সুযোগ নেই বলে এখানে শুধুমাত্র সৎচরিত্র ও বদচরিত্রের আচরণগুলোর নাম পেশ করা হচ্ছে মাত্র।

যে যে আচরণে চরিত্র সৎ হয়

চরিত্র সৎ বা ভাল বা সুন্দর হওয়ার জন্য অনেকগুলো আচরণ রয়েছে। এর কয়েকটি হলো :

১. সত্য কথা বলা

২. আমানত রক্ষা করা

৩. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা

৪. ধৈর্যশীল হওয়া

৫. শিষ্টাচারী, সৌজন্যতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা

৬. দয়ালু হওয়া

৭. ক্ষমা প্রবণ ও দয়ালু হওয়া

৮. ক্ষমা করার মানসিকতা থাকা

৯. উদার ও দানশীল হওয়া

১০. অতিথিপরায়ণ হওয়া

১১. সরলতা ও উৎসর্গীয়সম্পন্ন হওয়া

১২. সরলতা ও অমায়িকতা

১৩. বিনয়ী ও নম্র হওয়া

১৪. শালীনতা বোধ থাকা

১৫. সরল-সততা ও অকপটতা

১৬. সাধুতা

১৭. উত্তম আচরণ করা

১৮. ন্যায়বান হওয়া

www.pathagar.com

১৯. সাধুবাদ ও ধার্মিকতা প্রদর্শন
২০. সংযমী ও মিতাচারী হওয়া
২১. অধ্যবসায়ী হওয়া
২২. অনুশোচনা করা
২৩. আল্লাহভীতি অর্জন
২৪. শোকর গোজারী হওয়া
২৫. লজ্জাশীলতা
২৬. হাসিখুশি বা রসালো হওয়া
২৭. সাহসী হওয়া
২৮. বিজ্ঞতা

যে যে আচরণে চরিত্র খারাপ হয়

অনেকগুলো এ জাতীয় আচরণের কয়েকটি হলো :

১. মিথ্যা বলা
২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা
৩. আমানতের খেয়ানত করা
৪. অধিক ভোজন বা পেটুক হওয়া
৫. মাত্রাতিরিক্ত যৌনকামী হওয়া
৬. মাত্রাতিরিক্ত কথা বলার অনুভূতি
৭. অভিশাপ দেয়ার প্রবণতা
৮. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া
৯. কুৎসা রটনা
১০. অপবাদপ্রবণ হওয়া
১১. অতিমাত্রায় রাগী হওয়া
১২. তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করা
১৩. হিংসাপ্রবণ হওয়া
১৪. দুনিয়া পূজারী
১৫. সম্পদ প্রেমিক
১৬. কৃপণ হওয়া
১৭. পারিপার্শ্বিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া
১৮. বাহ্যাড়ম্বরী বা প্রদর্শন ইচ্ছাপরায়ণ
১৯. গর্ব-অহংকারী হওয়া
২০. অহমিকতা

www.pathagar.com

২১. লজ্জাহীনতা

২২. ভীরুতা

২৩. পাপাচার

২৪. বোকামী-নির্বুদ্ধিতা

২৫. হঠকারিতা

২৬. অতিরিক্ত লোভ

২৭. ইচ্ছার দাসত্ব

২৮. অবিচারী।[৯]

মহানবীর ভাষায় সৎ চরিত্রের ভূমিকা

প্রতিটি অর্জনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। তেমনি রয়েছে তা সৎচরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রেও। সৎ চরিত্রের ভূমিকা অর্থ চরিত্র অর্জনের ফায়দা কি? এর দ্বারা কি অর্জন করা যায়? এর অনেক অর্জনের কয়েকটি হলো :

১. সৎ চরিত্র অর্জনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া যায় :

শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম মানুষই পারে স্রোতের গতি উল্টিয়ে দিয়ে অন্যায় দূরীভূত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। আর তা অর্জন সম্ভব চরিত্র অর্জনের মধ্য দিয়েই। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা [রা] বলেন, মহানবী কখনো অশালীন কথা বলতেন না এবং তা শুনতেনও না। তিনি বলতেন : তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে সে যার চরিত্র সবার চেয়ে উত্তম– [ইন্না মিন খিয়ারেকুম আহসানুকুম আখলাকান]।[১০]

২. সৎ চরিত্র খাঁটি ঈমানদার হওয়ার মাধ্যম :

যার ঈমান যতো মজবুত তার সম্পর্ক তার মনিব আল্লাহর সাথে ততো দৃঢ়– তার কর্ম ততো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক, সৎ চরিত্রই এ যোগ্যতা বিধানে সক্ষম। আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে মহানবী [সা] বলেন, ঈমানের ব্যাপারে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর [আকমালাল মু'মিনীনা ইমানান ওয়া আহসানুহুম আখলাকানা।][১১]

৩. সৎ চরিত্র সুন্নাহ ও নাওয়াফিল নামাযের চেয়ে উত্তম :

নামায বেহেশতে যাওয়ার মাধ্যম– অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়। সুন্নাহের গুরুত্বও অপরিসীম, তবে চরিত্রের গুরুত্ব অতিরিক্ত নামাযের চেয়েও অনেক উত্তম। আয়েশা [রা] বর্ণিত হাদীসে রাসূল আল্লাহ্ বলেন, একজন ঈমানদার ব্যক্তি তার চরিত্র বলে সে মর্যাদা অর্জন করতে পারে যে মর্যাদা অর্জনের জন্য তাকে দিনভর রোযা রাখতে এবং রাতভর ইবাদত ----- বিহুসনি খুলুকিহি দারজাতান লিল সায়েমে ওয়া আল কায়েমে]।[১২]

৪. সৎ চরিত্র মানুষকে নবীর নিকটতম ও বন্ধু হতে সাহায্য করে :

যাবতীয় বন্দেগীর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ এবং পরকালে মহানবীর [সা] সান্নিধ্য অর্জন। আল্লাহর নবীর নিকটতম হতে এবং প্রিয়পাত্র হতে প্রয়োজন সৎ চরিত্র অর্জন।

www.pathagar.com

জাবির [রা] মহানবীর বক্তব্য বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের মাঝে মর্যাদার ক্ষেত্রে সেই হবে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটতম যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর– [ইন্না মান আহিব্বাকুম ইলাইয়া ওয়া আকরাবাকুম মাজলিসান ইয়াওমাল কিয়ামাহ আহসানুকুম আখলাকান]।[১৩]

৫. সৎ চরিত্র জান্নাতে যাওয়ার জন্য উত্তম মাধ্যম :

জান্নাত লাভই হচ্ছে একজন ঈমানদারের একান্ত কামনা। যাবতীয় চেষ্টা সাধনা এ জন্যই অথচ সৎ চরিত্র গঠন ছাড়া এ অর্জন সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা [রা] বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, মহানবীকে [সা] জিজ্ঞেস করা হলো [হে নবী], কোন কাজটি বেশী বেশী লোকের জান্নাতে যাওয়ার জন্য সহায়ক? তিনি বললেন, [তা হলো], আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র– [তাকওয়া আল্লাহ ওয়াহুসনুল খুলক], তাকে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন কাজটি বেশী বেশী লোকের জাহান্নামের যাওয়ার কারণ? তিনি বললেন, [তা হলো], মুখ এবং লজ্জাস্থান।[১৪]

৬. সৎ চরিত্র নেক আমলের পাল্লাকে ভারীকরণে সক্ষম :

যার সৎ আমলের পাল্লা ভারী সেই হবে জান্নাতী– আর বদ আমলের পাল্লা যার ভারী সে হবে জাহান্নামী।[১৫] সৎ আমল ভারী করার উপায় হলো সৎ আচরণ। এ প্রসঙ্গে আবি আল ওয়ারা বর্ণনা করেন যে, মহানবী [সা] বলেছেন, কিয়ামতের দিনে একজন ঈমানদার ব্যক্তির পাল্লায় সৎ চরিত্র [সদাচারণ] ছাড়া আর কোন জিনিসই অত বেশী ভারী হবে না। আল্লাহ্ অশ্লীল ও বাজে কর্মকে অপছন্দ করেন– [মা মিন সাঈইন আচ্‌কালা ফি মিজান আল আবদিল মু'মিননে ইয়াওমাল কিয়ামাতে মিন হুসনুল খুলক]।[১৬]

৭. যাবতীয় সৎ কর্ম হলো সৎ চরিত্রের ফসল :

সৎ কর্ম কি? এর জবাব হচ্ছে সৎ চরিত্র, অর্থাৎ চরিত্র বা আত্মার প্রতিষ্ঠিত রূপ ভাল হলেই ভাল কর্ম আশা করা যায়। এ প্রসঙ্গে নাওয়াস বিন সামআনের রিপোর্ট হচ্ছে : তিনি বলেন আমি মহানবীকে জিজ্ঞেস করেছি [হে নবী] সৎ কাজ এবং অসৎ কাজ কি? তিনি বললেন, সৎ কাজ হচ্ছে সৎ চরিত্র- [সৎ আচরণ] [আল বিররু হুসনুল খুলুক]। আর অসৎ কাজ হচ্ছে সেটি যা তোমার অন্তরাত্মাকে খাট করে দেয় আর এ কাজটা মানুষ জানুক তা সে চায় না।[১৭]

শেষ কথা :

উপরোক্ত বর্ণনার তিনটি প্রধান দিক রয়েছে। প্রথমত: চরিত্র কি? দ্বিতীয়ত: চরিত্রের ক্ষেত্রে মহানবীই হচ্ছেন একমাত্র অনুসরণীয়-অনুকরণীয় মানদণ্ড আর তৃতীয় হলো সুন্নাহ প্রদত্ত আইনে চরিত্রের ভূমিকা বা চরিত্র অর্জনের ফায়দা এর অর্থ যখন বলা হয় কোন ব্যক্তির চরিত্র ভাল এর অর্থ হলো লোকটি সত্যবাদী, মিথ্যার দুশমন, আমানতদারী, খেয়ানতের বিভীষণ, লোকটি ধৈর্যশীল, ধৈর্যহীনতা তার অপছন্দ, লোকটি দয়ালু-কৃপণতা তার শত্রু ইত্যাদি। চরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিই অনুসরণীয় যার উন্নত চরিত্রের সাক্ষী দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর নিকটতম সাথী-সংগীগণ। আর

www.pathagar.com

তিনি হচ্ছেন শেষ নবী, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মোস্তফা [সা]। চরিত্র অর্জন সহজ সাধ্য কাজ নয়। কারণ চরিত্র বলে মানুষের মন জয় করা যায়, রাজ্য জয় করা যায়, জান্নাত পাওয়া যায়, এটা কোন সাধারণ মানুষের কথা নয়, একথা বলেছেন স্বয়ং নবী কারীম [সা]। আর নবীর কথাও ওহী ভিত্তিক কথা। সবশেষে বলা যায়– বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের প্রধান সমস্যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নয়– বরং তা হচ্ছে চারিত্রিক সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হলে অপরাপর সব সমস্যার সমাধান আপনা আপনিই হয়ে যাবে। এজন্যই মহানবী বলেছিলেন, ইন্নামা বুয়েসতু লিউতাম্মিমা মাকরিমাল আখলাক। চরিত্র বা সদাচরণ অসৎ আচরণের পরিহারই হচ্ছে সব সাফল্যের মহা সোপান এবং সব রোগের মহৌষধ। অতএব, মুসলিম যদি বিজয় চায়, সাফল্য চায়, বিশ্ব দুর্নীতিগ্রস্থ রাষ্ট্র হওয়ার বদনাম ঘুচাতে চায় এবং দুনিয়া ও পরকালের অবমাননা মোকাবেলা করে জান্নাত পেতে চায় তাহলে সৎ চরিত্র অর্জনের কোনই বিকল্প নেই। ■

তথ্যপঞ্জি

১. সহীহ বুখারী, কি. হুসনুল খুলক, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কি. হুসনুল খুলুক।

২. ওয়েবস্টার ডিকশনারী-১৯৯৭, ১৮তম প্রিন্ট।

৩. কাশেম, আবুল, এথিক্স অফ ইমাম গাজালী, কুয়ালালামপুর, ১৯৭৫, পৃ. ৭৯।

৪. ইবনে মাজাহ, সুনান, কি. আল বির।

৫. আল কুরআন, হুজরাত, ৩৩ : ২১।

৬. আল কুরআন, আল কালাম, ৬৮ : ১-৪।

৭. বুখারী ও মুসলিম, মুত্তাফিকুন আলাইহি।

৮. বুখারী।

৯. এসব গুণাবলী পাওয়া যাবে আবুল কাশেম প্রণীত Ethics of Iman Ghazali, মুহাম্মদ গাজ্জালী রচিত Muslim Character, আল নারাকী রচিত জামিয়া সায়াদাত প্রমুখ গ্রন্থাবলীতে।

১০. বুখারী, সহীহ, কি. আদাব; আবু দাউদ, সুনান, কি. সুন্নাহ, আল কুরআন, আল মু'মিনুন, ২৩ : ১।

১১. আবু দাউদ, সুনান, কি. সুন্নাহ, তিরমিযী, সুনান কি. বিদ্দাহ।

১২. আবু দাউদ, সুন্নান, কি. হুসনুল খুলক।

১৩. ইবনে মাজাহ, সুন্নান, কি. হুসনুল খুলক।

১৪. তিরমিযী, সুনান, কি. জুহুদ বাব : জুনুব।

১৫. আল কুরআন, আল কারিয়া. ১০১ : ৭-১১।

১৬. তিরমিযী, সুনান, বাব : হুসনুল খুলক।

১৭. মুসলিম, সহীহ, কি. আল বিরর, তিরমিযী, সুনান, কি. আল জুহুদ, আবু দাউদ, সুনান, কি. হুসনুল খুলক।

www.pathagar.com

নতুন এক সভ্যতার নির্মাতা মুহাম্মাদ [সা]

ইকবাল কবীর মোহন

জাহিলিয়াতের চরম অন্ধকার যখন পৃথিবীকে গ্রাস করে বসেছিলো সেই দুর্দিনে নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে দুনিয়ায় এলেন। তখন মানুষ হয়ে পড়েছিলো সৃষ্টির দাসত্বে নারীজাতি ও দাস-দাসীরা ছিলো চরমভাবে নিপীড়িত, কন্যা সন্ত নকে জীবন্ত কবর দেয়ার মতো জঘন্য অপরাধ করতেও হৃদয়হীন মা-বাবা কুণ্ঠিত হতো না। মানবতা ও মনুষ্যত্ব বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিলো না। সুদি কারবার ও মহাজনী শোষণে অর্থনীতি ছিলো পংগু। সামাজিক পরিস্থিতি এমন এক ভয়াবহ পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলো যে জীবন ধারণ করা ছিলো সত্যিই দুর্বিষহ। অনিয়ম, হানাহানি, সন্ত্রাস, কুসংস্কার ও শোষণ-নিপীড়নে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের ধারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। মহানবী [সা] হিদায়াত ও সংস্কারের এক আলোকবর্তিকা নিয়ে মানবতার কাছে উপস্থিত হলেন। হেরার যে আলোকরশ্মি তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ধারণ করলেন তার মাধ্যমেই তিনি মহান এক সভ্যতা বিশ্বের মানুষের কাছে উপস্থাপন করলেন। মহানবী [সা]-এর এ সুন্দর সভ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক– 'J.H. Denison Zuvi Emotion as the basis of Civilization' গ্রন্থে অতি চমৎকারভাবে

www.pathagar.com

বলেছেন, 'In the fifth and sixth centuries, the civilized world stood on the verge of chaos. It seemed then that the great civilization which it had taken four thousand years to construct was on the verge of disintegration, and that mankind was likely to return to that condition to barbarism where every tribe and sect was against the next, and law and order was unknown. ---The new sanctions created by Christianity were working for division and destruction instead of unity and order---. It was these people [Arabs] that the man was born who was to unite the whole known world of East and South.' অর্থাৎ প্রথম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য জগত বিশৃঙ্খলার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। তখন এটাই মনে হচ্ছিল যে, চার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বিশাল সভ্যতা ভেঙে চুরমার হওয়ার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং মানবজাতি বর্বরতার এমন এক চরম অবস্থায় ফিরেছে যেখানে প্রতিটি জাতি, গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-বিবাদে লিপ্ত ছিলো, আইন শৃঙ্খলা ছিলো না, খ্রিস্ট ধর্মের দ্বারা সৃষ্ট নিত্যনতুন নিয়ম-অনুশাসন এবং শৃঙ্খলার বদলে বিভেদ ও ধ্বংসের কাজ করছিলো। এ জনগোষ্ঠীর [আরবদের] মধ্যে সেই মহামানব জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি পূর্ব ও দক্ষিণের জানা পৃথিবীটাকে ঐক্যবদ্ধ করতে আবির্ভূত হলেন।' মহানবী [সা] ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে নতুন যুগের সূচনা করলেন তার এ বিশাল অবদানকে ঈযধসনবৎং উহপুপষড়ঢ়বফরধ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে। সেখানে মহানবীর [সা] অবদানকে চিত্রায়িত করা হয়েছে এভাবে– It was the prophet who laid the foundation of the vast edifice of enlighten and civilization which has adorned the world since his time -অর্থাৎ মহানবী [সা] এমন এক অন্ধনালোক ও সভ্যতার বিশাল প্রাসাদের বুনিয়াদ স্থাপন করলেন যা তাঁর সময় থেকে পৃথিবীটাকে অলঙ্কৃত করে আসছে।

মহানবী [সা] যে প্রকৃতই সেরা সমাজ সংস্কারক ও নতুন সভ্যতার নির্মাতা তা তাঁর কার্যক্রম সম্পন্ন করার গতি-প্রকৃতি অবলোকন করলেই অনুধাবন করা যায়। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ [সা] যখন এলেন তখন আরবের সমাজ ছিলো মারামারি, হানাহানি ও সীমাহীন বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। মানুষে-মানুষে, বংশ ও গোত্রে দ্বন্দ্ব-বিবাদ লেগেই থাকতো। সমাজের মানুষ চুরি, ডাকাতি ও ধোঁকাবাজি-প্রতারণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলো। মদ ও জুয়া অধিকাংশ মানুষের নেশায় পরিণত হয়েছিলো। মহানবী [সা] মানুষের মধ্যকার সকল ভেদাভেদ ও হানাহানি দূর করে সমাজে শান্তি ও স্থিতি স্থাপন করলেন। তিনি সমাজ থেকে সকল অসঙ্গতি ও অকল্যাণের বিষদাঁত তুলে ফেলে মানুষে মানুষে ভালবাসা ও সম্প্রীতির এক সুন্দর সমাজ কায়েম করলেন। প্রথমেই তিনি মানুষকে আল্লাহর ওপর আস্থা স্থাপন করার তাকিদ দিলেন। কেননা, মানুষ কেবল তখনই সব অন্যায়-অবিচার ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে পারে যখন সে বুঝতে পারে তার কাজের জন্য তাকে আখেরাতে পাকড়াও করা হতে পারে। মহানবী [সা] বললেন, 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাকে বিরাট

www.pathagar.com

পুরস্কার প্রদান করবেন'। [সূরা কাহাফ : ৫] মানুষ যাতে হানাহানি ও বিভেদ ভুলে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে তার জন্য তিনি মানুষের মর্যাদাকে তুলে ধরলেন। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'তোমরা একে অপরের ভাই, একজনের নিকট অন্যের জান ও মাল আমানতস্বরূপ।' সমাজের মানুষের মধ্যে বংশ, গোত্র ও কৌলিন্য বিভেদকে বাতিল করার জন্য তিনি আরো ঘোষণা করলেন 'অনারবগণের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' ফলে তাঁর হাতে গড়া সভ্যতায় এমন এক মদিনা রাষ্ট্র জন্ম নিলো যার জনগণ সীমাহীন শান্তি সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এমন একটি কল্যাণ রাষ্ট্র আজ অবধি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

তখনকার আরবে মানুষের মধ্যে সততা ও ন্যায়নীতির নামমাত্র ছিলো না। ফলে একে অপরের সম্পদ লুটে নিতো, মানুষ মানুষের ওপর জুলুম চালাতো এবং শক্তিশালীদের কাছে দুর্বলরা ছিলো চরম অসহায়। তাই একটি সভ্য সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে সত্যবাদিতা ও ন্যায়নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিলো না। মহানবী [সা] মানুষকে সত্যের পথে আনয়নের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করলেন, 'যারা ঈমান এনেছো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।' [সূরা তওবা, ১১৯] তিনি আরো বললেন, 'তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, কেননা, মিথ্যাচার অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে এবং অন্যায় দোযখের পথে ধাবিত করে।' সুবিচার ও ন্যায়নীতি বিসর্জিত আরবের সমাজকে দেখে মহানবী [সা] বুঝতে পারলেন মানুষকে এর অভিশাপ থেকে বাঁচাতে হবে। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'কোন সম্প্রদায়ের শক্রতা যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে ন্যায়নীতি বর্জন করতে। ন্যায়বিচার করবে। ন্যায়বিচার করাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।' [সূরা মায়িদা : ৮] মহানবীর [সা] নিরলস প্রচেষ্টায় বিরাট সংখ্যক মানুষ সেদিন অবিচার, অসত্য ও ন্যায়হীনতা ছেড়ে সত্য ও সুন্দরের পথে এগিয়ে এলো। তারই সুফল ও প্রভাব পরিলতি হলো আরব সমাজে।

অটকারময় আরবে মানবতা ছিলো বন্দী। সমাজে মানবাধিকারের নাম-গন্ধ ছিলো না। এই অবস্থা থেকে মানবতাকে বাঁচাতে মহানবী [সা] সমাজের সকল পর্যায়ে মানবাধিকারের এমন এক নমুনা পেশ করলেন যা আজও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গোটা বিশ্বের কাছে অনন্য হিসেবে স্বীকৃত। তিনি শ্রেণী ও বংশগত বৈষম্যের অবসান ঘটালেন। তাঁর প্রচেষ্টায় দাস প্রথা উচ্ছেদ হলো। চাকর-বাকর ও দাসরা এতদিন যে নীচ বলে পরিগণিত হতো তাদের সঠিক মানবিক মর্যাদা মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি আল্লাহর বাণী মানুষকে শুনিয়ে বললেন, 'আর সৎব্যবহার করো অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে।' [সূরা আন নিসা : ৩৬] মহানবী [সা] এসব নিরীহ মানুষের ওপর থেকে জুলুমের অবসান ঘটানোর জন্য ঘোষণা করলেন, 'যে চাকর-বাকরদের বা দাস-দাসীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সে বেহেশতে যেতে পারবে না।' তিনি আরো বললেন, 'যে চাকরদের প্রতি তুমি খুশি তাদের তাই খেতে দেবে, যা তুমি খাও।' মহানবী [সা] ৬২৪ সালে দুনিয়ার মানুষের জন্য যে অভূতপূর্ব সংবিধান 'মদিনা সনদ' প্রতিষ্ঠা করলেন তা

www.pathagar.com

এখনও মানবাধিকারের ইতিহাসে অসাধারণ ইশতেহার হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এতে ৫১টি ধারা সন্নিবেশিত ছিলো।

জাহিলিয়াতে ভরা আরব সমাজে তথা তখনকার বিশ্বে নারীজাতি ছিলো সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত। তারা সকল প?কার অধিকার থেকে বঞিত ছিলো। তাদের না ছিলো সামাজিক মর্যাদা, না ছিলো কোন নিরাপত্তা। মহানবী [সা] এমন এক সমাজ কায়েম করলেন যেখানে নারীজাতির ওপর থেকে সকল বৈষম্য দূরীভূত হলো। নারীদের তিনি প্রকৃত মানবিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তখন নারীরা ছিলো চরমভাবে অবহেলিত। তাদেরকে ভোগের সামগ?ী ছাড়া আর কিছুই মনে করা হতো না। চরমভাবে অবহেলিত নারীদের উন্নতির জন্য মহানবী [সা] ব্যক্তিত্ব পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি দিলেন। নারীজাতির মুক্তির এই অধিকার এর আগে এবং পর আর কেউ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আজকের আলো জ্বলমল সভ্যতায় নারীদের অধিকারের ব্যাপারে অনেক হইচই করা হলেও নারীরা ইসলামের দেয়া সার্বজনীন অধিকার এখনও ফিরে পায়নি, যা রাসূল [সা] নিজে কায়েম করে বিশ্বের সেরা মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। মহানবী [সা] বললেন, 'আর তোমরা যে মোহরানা স্ত্রীদের দিয়েছো, তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করা তোমাদের জন্য মোটেও হালাল নয়। তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে জীবনযাপন করো।' [সূরা আন নিসা : ১৯] সে সময় মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়ার যে চরম অমানবিক ও পশু প্রবৃত্তি বিরাজমান ছিলো তাকে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহর নবী [সা] নারী জাতির মহামুক্তির পথ পরিষ্কার করে গেছেন।

মহানবী [সা] নতুন সভ্যতার যে ভিত্তি রচনা করলেন তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন এক ন্যায়ভিত্তিক ও সুষম বণ্টনের অর্থনৈতিক বিধান। যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজ থেকে দূরীভুত হলো দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সব ধরনের জুলুম ও শোষণ। সুদের অভিশাপ ও মহাজনী কারবারের জুলুম থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য তখন সুদি কারবারকে নির্মূল করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিলো না। তাই সুদকে হারাম এবং ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করা হলো। কুরআনের বাণী উল্লেখ করে রাসূল [সা] বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয়কে করেছেন বৈধ, আর সুদকে করেছেন হারাম।' এ বাণী প্রচারিত হবার সাথে সাথে মানুষ সুদি কারবার পরিহার করে তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এলো, দূরীভূত হলো সুদের মহামারি এবং প্রতিষ্ঠিত হলো সুষ্ঠু অর্থনীতি।

আজ এ কথা প্রমাণিত যে, সভ্যতার প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। যে জাতি যতটা শিক্ষিত সে জাতিই ততটা উন্নত। সভ্যতার বিকাশের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অথচ এই শিক্ষা বিস্তারের প্রথম উৎসাহের বাণী আমরা শুনলাম মহানবী [সা]-এর কাছে। আরবের সমাজ তথা গোটা বিশ্ব যখন জ্ঞানের আলো থেকে একেবারে বঞ্চিত তখন নবী [সা] আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানের যে বাণী শুনালেন তা হলো- 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে।

www.pathagar.com

পাঠ করো আর তোমার প্রতিপালকের মহিমা যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।' [সূরা আলাক]। আল্লাহর তরফ থেকে প্রথম ওহির এই শিক্ষা মানুষকে জানানোর সাথে সাথে মহানবী [সা] আরো ঘোষণা করলেন- 'বিদ্যা অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।' তিনি আরো বললেন, 'জন্ম থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো।' এর ফলে গোটা মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়লো। মহানবী [সা]-এর ওফাতের পরও কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত এ জ্ঞানের আলোয় মুসলমানরা দুনিয়াকে উদ্ভাসিত রেখেছিলো। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশের সূচনা যে ইসলামী শিক্ষা ও মুসলিম মনীষীদের হাতে হয়েছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজকের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসের বিস্তাররোধ করতে গিয়ে দিশেহারা। সন্ত্রাস নির্মূলে অহর্নিশ চলছে এক মহাযুদ্ধ। অথচ এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ইসলামই নির্মূল করে দিয়েছিলো। মহানবী [সা] ইসলামের যে বাণী প্রচার করলেন তাতে হানাহানি ও সন্ত্রাসকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এ জন্য পবিত্র কুরআনে পাকে বলা হলো, 'ফিতনা বা সন্ত্রাস হত্যার চেয়েও গুরুতর।' [সূরা বাকারা : ১৯১]

এভাবে জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী [সা] কায়েম করে গেলেন এমনসব নীতি, আদর্শ ও ব্যবস্থা যা গোটা মানবজাতিকে মর্যাদা, স্থিতি ও উন্নতির এক ঐতিহাসিক সোপানে নিয়ে দাঁড় করাতে সম হলো। মানবতা ফিরে পেলো নতুন গতি, পেলো নতুন চলার দিশা। আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মহানবী [সা] প্ঃচারিত অজেয় দীন ইসলাম সত্যিকার অর্থে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। মহানবী [সা] এমন এক ধর্ম মানুষের কাছে প্রচার করলেন এবং নিজেই তা প্রতিষ্ঠা করে দেখালেন যার ফলে সমাজ জীবনে নেমে এলো সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার অমিয় ফল্গুধারা। মহানবী [সা]-এর এই ঐতিহাসিক সংস্কারের জন্যই বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক Raimond চমৎকারভাবে বলেছেন, The founder of Islam is in fact, the promoter of the first social and international revolution of which history gives mention' আর তাই Encyclopedia Britannica মহানবী [স]-কে দুনিয়ার সবচেয়ে সফল ব্যক্তি বা সংস্কারক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। Britannica-তে বলা হয়েছে- 'Of all the religious personalities of the world Mohammad was the most successful'. পাশ্চাত্য লেখক Maikel Hart যথার্থই বলেছেন- He was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels. অর্থাৎ ইতিহাসে তিনিই মহানবী [সা] একমাও মানুষ যিনি ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাঙ্গীন মহাসাফল্য লাভ করেছেন।

আজকের সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার অভাবে অস্থির। মানবাধিকারের বাণী এখন কেঁদে মরছে। দুর্বলরা সবলদের আগ্রাসনে পিষ্ট হচ্ছে। শক্তিশালী দেশ কম শক্তির

www.pathagar.com

দেশগুলোকে দখল করে নিচ্ছে। নারী মুক্তির নামে নারী জাতিকে বেলাল্লাপনা ও নোংরামির শেষ সীমায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে বাড়ছে বিরোধ, রক্তারক্তি। সন্ত্রাস মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। বাসযোগ্য দুনিয়া এখন অসভ্যতা ও অন্যায়-অবিচারের প্রচণ্ডতায় পশু সভ্যতার দিকে মোড় নিয়েছে। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, শুভকামনা ও শুভাশিস পালিয়ে বেড়াচ্ছে। চরম রাজনৈতিক পীড়নে মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও সুদি কারবারের ব্যাপকতা মানুষের হাড়-মজ্জা পর্যন্ত খেয়ে ফেলার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। এমন অবস্থায় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] প্রবর্তিত জীবন বিধানের প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে একটি সুন্দর ও শান্তিময় পরিবেশ। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তাই অনেকে আশা করছেন, আগামী শতক হয়তো বা মহানবী [সা] প্রবর্তিত সেই অনন্য সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। অবস্থা দেখে অন্তত এটাই আমরা আশা করতে পারি। ■

www.pathagar.com

তমসা পালিয়ে যায় ॥ মা হ ফু জু র র হ মা ন আ খ ন্দ

আগুনের ঝড় বয় রোদেলা দুপুর
ভুট্টার খই ফোটে তপ্ত বালিতে
বাদ্যের তালে তালে ঘুঙুর নূপুর–
ধূসর বর্ণ যেন কৃষ্ণ কালিতে।

রঙিন উকাজ আর নওরোজ মেলা
মানুষের হাটে দেখি পশুদের খেলা
যুদ্ধ মদ্য নারী
শক্তির বাড়াবাড়ি।

কান্নার ঢেউ বয় পাহাড়ের গায়
সমাজের ভিত্ নড়ে হাল্কা হাওয়ায়
নিকশ আঁধার থেকে করুণার বীণ
চারদিকে তমসা রাত কিবা দিন

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ভেসে আসে নূর
তমসা পালিয়ে যায় দূর থেকে দূর।

রাসূলের শানে কবিতা ॥ আ ল তা ফ হো সা ই ন রা না

হে প্রিয় রাসূল আমার–
পৃথিবীতে যতো আছে প্রিয় তুল্
সবচেয়ে প্রিয় তুমি যে রাসূল
আস্‌মান-জমিনে খোদার প'রে তুলনা নাই যার।

খোদার হাবিব রাসূল আমার–
শান্তির পথে, মুক্তির পথে, সহসা এগিয়েছো তুমি
মানুষে-মানুষে করোনি বিভেদ, ভেবেছো এক সারা জাহানভূমি
তোমার সেই সে দেখানো পথে চলি যেন বারবার।

জগতের সেরা রাসূল আমার–
তোমার মহৎ প্রাণ, সকলকে করেছে আকর্ষণ

ত্যাগের মহান আদর্শ তোমার, করেছে আমাদের বেগবান
তোমারই পরশে আলোকিত পৃথিবী, দূরে আজ আঁধার

আজ তুমি নেই, রাসূল আমার–
তোমার রেখে যাওয়া কর্মের বাহক হয় যেন তোমারই মতো
এক আল্লাহ ছাড়া, কারো কাছে করবে না মাথা নত
তবেই পাবো রোজ হাশরে শাফায়াত তোমার ॥

বিশ্বাসের প্রহর ॥ সা' দ ত সি দ্দি ক

বিশ্বাসের প্রহর গুণে গুণে সজীব আকাশ
প্রশান্ত, আটলান্টিক কি শুধুই জলের আঁধার
মৃগ হরিণের বিস্তীর্ণ বিচিত্র সবুজ বন
সোনালী স্বপ্নের মত দুলে ওঠা দীর্ঘ ক্ষেত
অব্যক্ত কথায় প্রেয়সীর মত জাকিয়ে তোলে
দুর্লভ অন্তর নাকি প্রতিটি প্রাণ?

আমার নীরব বিশ্বাসের সমুদ্রে
দীর্ঘ নিমজ্জিত পাথরের মত আরও নীরব নিস্তব্ধ হয়ে ডুবেছে
আর বিশ্বাসের পাহাড় গড়তে গড়তে
অবিশ্বাসের কাটায় বিদ্ধ হয়েছে বারবার।
আমার বিশ্বাসের প্রহর আকাশের শুকুনি, প্রশান্তের অক্টোপাস
বনের ব্যস্ত, ক্ষেতের বিষাক্ত কীটের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে
চলে এসেছে হৃদরবতীর প্রতারণার বিষাক্ত ছোবলে
আর বিশ্বাসী বাহাদুর সমস্ত শরীরে নীলের প্রতাপে বিধ্বস্ত।

আজ হৃদয়বীণার যত সুর ঘরপোড়ার গোয়ালের মত
কেঁপে কেঁপে নির্লিপ্ত নিভৃতে বেহালা বাজায়।

www.pathagar.com

নাতে রাসূল ॥ ইব্রাহীম মন্ডল

ত্রিভুবনের সেরা তিনি
নাই কোন তাঁর তুল
সে যে আমার মোহাম্মদ রাসূল।

নীল আকাশের চাঁদ সেতারা
পাহাড় নদী ঝর্ণাধারা
রাসূল প্রেমে পাগলপারা
তামাম সৃষ্টিকুল
সে যে আমার মোহাম্মদ রাসূল।

সৃষ্টি থেকে ধ্বংসাবধি যত মানব কুল
সবার চেয়ে সুন্দর তিনি রাসূলে মাকবুল
আমার মোহাম্মদ রাসূল।
তিনি ইমাম সবার নেতা
মানবতার মুক্তিদাতা।
নূরের ঝলক বদন খান
আল্লাহর বাণী পাক কোরআন।
হৃদয়ে তাঁর আল্লাহ আল্লাহ বুল
সে যে আমার মোহাম্মদ রাসূল।

দোয়েল কোয়েল পাপিয়া গায়
প্রজাপতি নেচে বেড়ায়।
তাঁর উছিলায় সৃজন হলো তামাম সৃষ্টিকুল
সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি তিনি মোহাম্মদ রাসূল।

তোমার কথা রাখতে পারিনি ॥ সোহরাব আসাদ

আমার ক্রমাগত বিশ্বাসভঙ্গতার জন্য
কষ্ট পেয়েছো খু-ব, বেদনায় হয়েছো নীলকণ্ঠ?
ওই অধরা আকাশটার মত তোমার ঔদার্যে
বিস্ময়-বিমুগ্ধ আমি।

www.pathagar.com

আবার সাহসে হাত বাড়াই তোমাকে ছোঁবো বলে।
মুক্তোর চেয়েও প্রোজ্বল কী তৃপ্তির হাসি,
রাগ কিংবা বিরক্তি নেই একতিল।

দীর্ঘ মরুপথ বেয়ে শ্রান্তিতে একটুও হয়নি ম্লান স্বর্গীয় স্মিতি!
শুভ্র স্বেদবিন্দুর আবেশী সৌরভে পরম তৃপ্ত আমি।
খোর্মার বন আর বণিকের উটের সারিও দাঁড়িয়ে যায়
দ্যুতিময় সৌম্য-শান্ত আলোর আভায়।
প্রণতি জানায় উষর মরুর নিরক্ষর বেদুইন।

আত্মার নিলয়ে লুকানো সব প্রেম উজাড় করে
তোমার নিঃশ্বাসে অনাঘ্রাত খোশবুর সাথে অবলিলায়
মিশে যেতে উদ্বাহু আকুতি জানালাম।
দেহের সব শক্তি পুঞ্জিভূত করে চিৎকার দিয়ে বলেছি
এই যে আমি। শুধু তোমারই সেই আমি।

এই দূরান্তের বিরান ভূমি থেকে
আর ক্ষীণ কণ্ঠের মিনতি ব্যর্থ আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত
হয়ে আছড়ে পরে ইথারের কার্নিশে। এর একটি
শব্দকণাও কি পৌঁছেনি তোমার কাছে?
কি করে পৌঁছবে! আমি যে পায়ে পায়ে বিশ্বাসভঙ্গ করেছি প্রিয়।
আমি সেই ক্লান্ত নিঃসঙ্গ মুসাফির।
একাই ফিরে যাচ্ছি।

দীর্ঘ সফরে রসদ বলতে নেই কিছুই।
তুমি ছাড়া কে আছে এই অধমের আর্তি শোনার
কেই বা আছে এমন দুঃখ ভোলানিয়া অনুপম প্রেমময় সৌর্য পুরুষ?

তোমাকে স্মরণ করার এখন সময় হে রাসূল ॥ শ হী দ সি রা জী

তোমাকে স্মরণ করার এখন সময় হে রাসূল

যেখানে স্বপ্নগুলো নিকষ কালো আকাশ ছোঁয়া
যেখানে চিন্তাগুলো নিঙড়ে ফেলা রক্ত ধোয়া
যেখানে জীবনবোধের ভাবনাগুলো শিকড় কাটা

www.pathagar.com

যেখানে মনমুকুরের স্বপ্নগুলো পর্দা আঁটা
জীবন বেলার সব কিছুতেই গভীর ভুল
তোমাকে স্মরণ করার এখন সময় হে রাসূল।

এখানে আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলায় রোদ্র খরা
এখানে পথের শেষে অচিন পথে পথিক হাঁটে
এখানে রাখাল ছেলে মেঘ ভাগানোর ফন্দি আঁটে
জীবন বেলার সব কিছুতেই গভীর ভুল
তোমাকে স্মরণ করার এখন সময় হে রাসূল।

এখানে চলছে নতুন রংতুলিতে আঁকিবুকি
এখানে মধুর কুঞ্জে অচিন স্বাদের মৌ শুকি
এখানে আঁধার হয়ে আসছে ধেয়ে নতুন দিন
এখানে আশার বেলুন উড়ছে চোখে বেশ রঙিন
জীবন বেলার সব কিছুতেই গভীর ভুল
তোমাকে স্মরণ করার এখন সময় হে রাসূল।

সবকাজে আর নেইতো তোমার মূলনীতি
জীবনবোধের সবকিছুতেই নেই প্রীতি
সবখানে আজ চেতনা তোমার ঢেকে রাখি
কোন খানে আজ শান্তি খোঁজার নেই বাকি
জীবন বেলার সব কিছুতেই গভীর ভুল
তোমাকে ধারণ করার এখন সময় হে রাসূল।

প্রতীক্ষিত আগমন ॥ শে খ এ না মু ল হ ক

জাজিরাতুল আরবের মসিলিপ্ত
জাহেলিয়ার আদিগন্ত আকাশে
নীরবে থেমে গেছে জীবনের উচ্ছ্বাস
প্রাণের স্পন্দন আচমকা আটকে গেছে
নিরুত্তাপ হৃদযন্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে
লুণ্ঠিত মানবতার পরতে পরতে
জমেছে ঘূর্ণায়মান ধুলিমাখা মেঘ
অশান্ত চারদিকে সাইমুমের তান্ডব
কম্পিত পক্ষীকুলের সরব কুজন
ফুলপাখীদের উচ্ছ্বসিত কোলাহল নেই

www.pathagar.com

নেই মৃত্তিকার জয়গান
লোহিত সাগরের নীল সরোবরে
মৎস্যকুলের স্বপ্নিল সমাবেশ নেই
উন্মত্ত হাঙ্গরের আগ্রাসী থাবায়
ওদের প্রাণোচ্ছল উপস্থিতি নেই।

এই বিক্ষুব্ধ মরু সায়রে হে নবী
তোমার সাড়া জাগানিয়া আগমন
শৃগাল কুকুরেরা সব
কোথায় পালিয়ে গেল
বর্নিল ইতিহাসে তার বিবরণ নেই।

প্রাপক, পোস্ট মাস্টার, মদীনা ॥ শু ভ জা হি দ

এ চিঠি পৃথিবীর শুরু থেকে লেখা হচ্ছে
এ চিঠি লেখা হবে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত
চিঠিতে আবেগ থাকবে, উৎকণ্ঠা
থাকবে আর থাকবে বটবৃক্ষের
মত অনন্তকাল ব্যাপী অপেক্ষা।
অন্ধকারে ঢেকে থাকা অচেনা
পথে বিশ্বস্ত এক বাতিওয়ালার
জন্য অপেক্ষা। অবিশ্বাস আর
অতিবিশ্বাসের দোলাচলে একজন
আল্যামিনের জন্য অপেক্ষা।
বিভক্ত জনগণ, ক্লান্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের
শুভ কামনায় একজন
অবিসংবাদিত রাষ্ট্র নায়কের
জন্য অপেক্ষা।
তিনি আসবেন। দীর্ঘদেহী আরব,
দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনা থেকে
অজস্র সৌরভ নিয়ে আমাদের বদ্বীপে
তিনি আসবেন, যমযমের শীতলতা
নিয়ে। আমরা অগণিত তৃষ্ণার্ত
যুবক তাকিয়ে আছি পশ্চিমে

www.pathagar.com

তিনি আসলে তার হাতে বাইয়াত
গ্রহণ করব। আর প্রচণ্ড শ্রদ্ধায়
চিৎকার করে উঠব- আসসালামু
আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ-ইয়া হাবীবাল্লাহ।

হেরার সাধক ॥ খা লী দ শা হা দা ৎ হো সে ন

মুহম্মদের বয়স বেড়েছে চল্লিশে হাতছানি
তখনো নাজিল হয়নি কুরআন পাননি অহির বাণী।
নিদ্রিত আর জাগ্রত হালে স্বপ্নে দেখেন সব
ভোরের সূর্য উদয়ের মত সত্য ও বাস্তব।

মানসপটে জেগে থাকে তার স্বপ্নে দেখা ছবি
আল্লাপাকের খাশ রহমত হতে চলেছেন নবী।
ঘর সংসার তুচ্ছ তাহার কি যেন অভাব মনে
শহর নগর-লোকালয় ছেড়ে চলে যান নির্জনে।

মাঠ প্রান্তর-দুর্গম পথ করিতে অতিক্রম,
চারিদিগ হতে গাছ পাথরে শ্রদ্ধা জানায় পরম!
হে আল্লার প্রিয় রাসূল আপনার প্রতি সালাম
কিছুতো দেখি না ভয়ে ভয়ে তিনি তাকান ডাইনে বাম,

মক্কা হতে দু'ক্রশ দূরে হেরা পাহাড়ের গুহা
অনেক খুঁজিয়া, কি মনে বুঝিয়া বাছিয়া লইলেন উহা,
হেরার গুহায় ধ্যানমগ্ন-মুহম্মদ আলামিন
ধ্যানের মধ্যে কেটে যায় তার কত যে রজনী দিন।

ভৃত্য যায়েদ নিত্য এসে দিয়ে যান যত খানা
সাদিয়া আম্মা খাদিজা দেখেন খায়নিক একদানা।
খেজুর রুটি মশকের পানি অথবা ছাতু যব
গতকাল যা পাঠানো হয়েছে পড়ে যে রয়েছে সব।

ধ্যান মগ্ন লগ্নে কঠোর আল্লার ইবাদাত
এভাবে সেদিন সাধনার মাঝে এলো কদরের রাত।
মানুষ বেশে কে যেন এসে ছড়ালো দীপ্ত আলো
হারিয়ে গেল হেরা গুহার আঁধার রাতের কালো।

www.pathagar.com

দেখে আগন্তুক সত্যসাধক ভয়ে হন জড়-সড়
কি যেন লেখা সামনে ধরিয়া বলিলেন ইহা পড়ো।
পড়ো তোমার রবের নামে করেছেন যিনি সৃষ্টি
কেমনে পড়িব– পড়িতে জানি না চোখে নাই পাঠদৃষ্টি!

এসো হে সাধক আগন্তুক করিলেন কোলাকুলি
হেরার কক্ষ সাক্ষ্য বক্ষের জ্ঞানচোখ গেল খুলি।
আগন্তুকের সাথে এবার মিলিয়ে মুখের স্বর
অতি সহজে পড়িয়া নিলেন লিখে নিজ অন্তর।

পাঠ শেষ হলে আগন্তুক বলে আপনি খোদার রাসূল
আমি জিবরীল ফেরেস্তা খোদার নয় কিছু এর ভুল।
হেরার সাধক ফিরে এলো ঘরে ভয়ে কম্বল গায়
আবুল কাশেম কি হলো তোমার জিগালেন খাদিজায়?

খাদিজার ভাই ওরাকা ছিলেন পণ্ডিত ইঞ্জিলে
শুনে বলে বোন ঘটনা এমন কেতাবের সাথে মিলে!
ঈসা, মুসা, নবীদের মতো ঘটনা মিলেছে সবই
করিও না ভয়, জেনো নিশ্চয়– ইনিতো সত্য নবী।

নাতে রাসূল [সা] ॥ মোঃ আ মি নু ল ই স লা ম

মানবতার বন্ধু হয়ে
যিনি এলেন ভুবনে
ধন্য ধন্য ধন্য ধরা
তাঁর আগমনে।

জুলুম শোষণ নিকষ আঁধারে
বিশ্ববাসী দিশেহারা, কান্না হৃদয়ে
দিলেন খোদা মজলুমানের
মহান নেতা ভুবনে
ধন্য ধন্য ধন্য ধরা
তাঁর আগমনে।

মরুর বুকে ফুলের সুবাসে
উজ্জীবিত সবাই যেন শুধু নিমিষে

www.pathagar.com

পাল্টে গেল সব আচরণ
নেতা এলেন জীবনে
ধন্য ধন্য ধন্য ধরা
তাঁর আগমনে।

ভালোবাসি যারা নবীর পথ
হে দয়াময় আমরা তোমার নবীজীর উম্মত
পাক মদীনার রাস্তা যেন
থাকে জীবন মরণে
ধন্য ধন্য ধন্য ধরা
তাঁর আগমনে।

তোমাকে দেখেছি ॥ মা সু দা সু ল তা না রু মী

কিভাবে যে দিন যায় রাত আসে
রাত শেষে ভোর হাসে বুঝিনা।
ক্রমে ক্রমে একা একা চলেছি কোন নিরুদ্দেশ্যে
নিশীথের করতলে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ
কতবার দেখেছি হিসাব জানা নেই।
কতবার দেখেছি জোসনার ফোয়ারা
মাঠে মাঠে ফিঙে আর ফড়িঙের নাচ
ঘাসের ডগায় নিশির শিশির!
কত বাতাস মেখেছি গায়
শির শির ঝির ঝির...
নীলাভতম আকাশ নীলে দেখেছি কত যে আলো
চাঁদের মৃত্যু দিবসে দেখেছি অমানিশার নিঃসীম কালো
দেখেছি জাম জারুল হিজল শিরীষ কৃষ্ণচূড়ায়
লাল নীল সবুজ বেগুনী সমারোহ।
দেখেছি শালিক টিয়ে দোয়েল শ্যামা
দেখেছি বনের চাতক– যে আকাশের দিকে
অনিমেষে চেয়ে থাকে।
হেমন্ত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দেখেছি। দেখেছি
অপরূপ বসন্ত। সব অপরূপের মধ্যে
দেখেছি তোমাকে।

www.pathagar.com

আবূ তালিবের কবিতায় রাসূলুল্লাহ [সা]

আহমদ আবুল কালাম

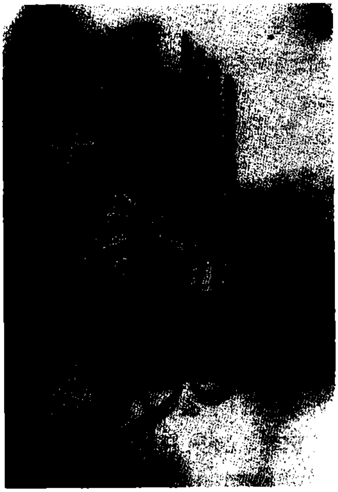

কাফির মুশরিকদের প্রবল বিরোধিতা ও অমানুষিক যুলুম-নির্যাতনের মুখে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দাওয়াত অঙ্কুরে মুখ থুবড়ে না পড়ার যতগুলো কারণ রয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে তাঁর প্রতি চাচা হযরত আবূ তালিবের সময়োপযোগী সাহায্য-সহযোগিতা দান। অন্যান্য কুরাইশ নেতা উদীয়মান জীবন-বিধান ইসলামের বিনাশ সাধনে একের পর এক চক্রান্ত ও শত্রুতা চালালে আবূ তালিব তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি রাসূলুল্লাহ [সা]-কে আপন পুত্রের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন, ভালবাসতেন তাঁর অনুসারী নওমুসলিমদেরকেও। রাসূলুল্লাহও [সা] তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন পিতার মতো। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততোদিন তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বিশেষ আশ্রয়।[১] কাফির মুশরিকদের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি কোনভাবেই তাঁর প্রতি পিতৃব্যসুলভ কর্তব্য পালনে নিবৃত্ত হননি। একটি হাদীসে আবূ তালিবকে কুরাইশদের সায়্যিদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস [রা] বলেছেন ঃ নবী করীম [সা] চাচা আবূ তালিবের দাফন থেকে ফিরে এসে দু'আ করেন এই বলে, আপনি উত্তম

www.pathagar.com

প্রতিদান লাভ করুন হে আমার চাচা![২]

ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর প্রতি প্রারম্ভিক শত্রুতা শুরু করলে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন আবূ তালিব। তাঁর পক্ষাবলম্বন করে রচিত তাঁর প্রশংসাগীতিতে আবূ তালিব বলেন ঃ

কুরাইশরা গৌরব করে যদি কোনদিন
মুহাম্মাদই [সা] যথাযথ, তাদের শ্রেষ্ঠ সার্বজনীন
উস্কে দেয় মোদের প্রতি ওদের সৎ-অসৎজন
ওরা বিফল, ব্যর্থ ওদের চেষ্টাপণ।[৩]

রাসূলুল্লাহ [সা] কুরাইশদেরকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা জ্বলে ওঠে। তারা রাসূলুল্লাহ [সা]-কে নিবৃত্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ান আবূ তালিব। অগত্যা তারা আবূ তালিবকে জানিয়ে দেয়, 'হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে থামান নতুবা তাঁর ব্যাপার আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।' তাদের এরূপ ষড়যন্ত্র ও পীড়াপীড়ির জবাবে আবূ তালিব তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

'বায়তুল্লাহর কসম! তোমাদের ধারণা মিথ্যা, অসংগত
মুহাম্মাদ [সা]-কে ছাড়ব না মোরা প্রাণ হলেও ওষ্ঠাগত।
মর্যাদার রক্ষাকবচ তিনি, নিষ্কলুষ নিখাদ স্বনির্ভর
ইয়াতীম মিসকীনের আশ্রয় তিনি, ত্রাণকর্তা বিধবার।[৪]

পিতৃব্য আবূ তালিব একই সংগে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরে তার কবিতার শেষে বলেন ঃ

১. আমার জীবনের কসম! আবদ্ধ হয়েছি আমি
আহমদ [সা] ও তাঁর ভাইদের মায়ার বন্ধনে
যেভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে স্নেহবৎসল কোন লোক।
২. কে আছে এত প্রত্যাশিত তাঁর মতো জগতে
বিচারকরা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ে এগোয় যখন।
৩. ন্যায়বান, সুবোধ, সহনশীল, স্থির
মা'বুদের সংগে সম্পর্ক তাঁর অবিচ্ছিন্ন গভীর
যে মা'বুদ উদাসীন নন তাঁর প্রতি কভু।
৪. মহৎ কাজের কাজী তিনি সম্মানিত অনায়াসে,
সম্মানিত বংশজাত– যুগ যুগ ধরে বহমান
উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মান যার– ঠুন্‌কো নয় এ গৌরব।
৫. নিজের থেকে সাহায্য করেন তাঁকে মানুষের রব
প্রকাশ তিনি করেন দীন– অনন্য জীবন-বিধান
সত্য সে দীন নিত্য সে দীন নয় ক্ষীয়মান।

www.pathagar.com

৬.৭. আল্লাহর কসম! আমি অনুসরণ করতাম তাঁর
যদি আশংকা না করতাম পূর্বপুরুষের দুর্নাম
সময়ের অবস্থা যা-ই হোক, এ আমার মনোভাব
ঠাট্টাচ্ছলে বলছি না এটা, বাস্তব সঠিক বারবার।

৮. আমাদের ছেলে মুহাম্মাদের প্রতি নেই
মিথ্যা অপবাদ দেয়ার মতো আমাদের কোন লোক;
অপবাদ, মিথ্যা কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না কেউ।

৯. আমাদের মাঝে আহমদ দৃঢ়মূল থেকে আগত
গভীর মযবুত প্রাচীরের মতো অটল, পর্বতসম অনড়।

১০. আমি বিপন্ন করি তাঁর জন্য আমার সমগ্র জীবন
তাঁকে রক্ষা করে চলি সবকিছু দিয়ে সর্বতোভাবে।[৫]

আবূ তালিব রাসূল [সা]-কে হিফাযত করার জন্য সর্বতোভাবে তৎপর থাকার প্রেক্ষিতে আবূ লাহাব ব্যতীত সকল হাশিমীরা তাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। আবূ তালিবের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে হাশিমীদের থেকে অনুকূল সাড়া মিলে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর পক্ষে। এতে কুরাইশদের অন্যান্য শাখা-গোত্র আরো ক্ষেপে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ [সা] ও হাশিমীদেরকে সমাজ থেকে বয়কট করে সমাজচ্যুত বলে ঘোষণা করে এবং এ মর্মে একটি সম্মিলিত চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করে। এতে রাসূলুল্লাহ [সা] ও তাঁর সংশ্লিষ্ট লোকজন বেশ কিছুকাল শি'ব-ই-আবী তালিব বা আবূ তালিব গিরিসংকটে শৃঙ্খলিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন। কুরাইশদের এরূপ পরিকল্পিত শত্রুতা ও অমানবিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আবূ তালিব তাঁর কবিতার এক স্থানে বলেন ঃ

"তোমরা কি জান না, মুহাম্মাদকে পেয়েছি আমরা নবীরূপে
যেমন নবী ছিলেন হযরত মূসা– পূর্ব কিতাবের বিবরণে
মানুষের হৃদয়ে রয়েছে তাঁর অফুরন্ত ভালবাসার ঠাঁই
আল্লাহর মুহাব্বতে বিশেষিত তিনি– তাঁর চেয়ে কল্যাণ নাই[৬]
নিখাদ বিবেক ও মজবুত প্রতিরোধের অধিকারী মোরা সবাই
বাহাদুরদের প্রাণ উড়ে যায় যখন ভয়-ত্রাস ও বিহ্বলতায়।[৭]

লা'নতপ্রাপ্ত কুরাইশ নেতা আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ [সা]-এর প্রতি অপমান ও নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখলে আবূ তালিব তাকে কোমল ভাষায় বুঝিয়ে শুনিয়ে নিবৃত্ত করার প্রয়াস চালান। যুলুম-নির্যাতন পরিহার করে রাসূল [সা]-এর সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করে হযরত আবূ তালিব একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির অংশবিশেষ এরূপ ঃ

"যার চাচা আবূ উতায়বা[৮] সে তো থাকবে সম্মান ও আনন্দে
তার থেকে যুলূম-নির্যাতনের যে কোন আচরণ কল্পনাতীত।

www.pathagar.com

আমি তাকে বলি, আবূ মুআত্তাব[৯] সুদৃঢ় রাখ তোমার সৎ নেতৃত্ব
কিন্তু আমার উপদেশ কোথায় আর তার অবস্থানই বা কোথায় কিরূপে?
যতদিন বেঁচে থাক জগতে গ্রহণ করো না এমন পদক্ষেপ
সভা-সমাবেশে যোগদান করলে কুড়াতে হয় প্রচুর নিন্দা-দুর্নাম
'না পারা'র পথ পরিহার কর, সে তো তোমা ভিন্ন অন্যদের
'না পারা' বা অপরাগতার ওপর তোমার সৃষ্টি নয় নিশ্চিত।
বায়তুল্লাহর কসম! তোমরা এখনও দেখনি গিরিসংকটের অন্ধকার দিন
তোমাদের ধারণা মিথ্যা যে, মুহাম্মাদ [সা]-কে ছিনিয়ে নেয়া হবে আমাদের থেকে।[১০]

রাসূলুল্লাহ [সা]-কে প্রায় তিন বছরের মতো দুরবস্থায় অবস্থান করতে হয় শি'ব-ই আবী তালিবে। এ সময়ে লুআই ইবন গালিব গোত্রের হিশাম ইবন আমরের নেতৃত্বাধীন একদল বিবেকবান মানুষের প্রচেষ্টায় 'বয়কট সম্পর্কিত চুক্তিপত্র' বাতিল করা হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ [সা], তাঁর অনুসারী ও হাশিমীগণ শৃংখলমুক্ত অবাধ জীবন-যাপনে সক্ষম হন। আবূ তালিব চুক্তিপত্র ছিন্নকারী-দলের প্রশংসায় বলেন :

আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন হাজূনের এ দলটিকে
জনসমক্ষে আসেন যারা, বিবেকের কথা বলেন, দেখান সৎপথ
তারা হাজূনের নাকের ডগায়[১১] বলেছিলেন যেন-রাজন্যবর্গ
বরং আরো সম্মানিত, আরো মর্যাদাশীল শ্রেষ্ঠ অতি তারা।
সাহায্য করেন তাতে[১২] প্রত্যেকে তারা বাজপাখীর মতো
সুদীর্ঘ বর্ম পরে এগোয় যখন, এগোয় তারা শান্ত পদক্ষেপে।
লুআই ইবন গালিব বংশের[১৩] অন্যতম সেরা মানুষ তারা
অবমাননাকর আচরণ হলে পাল্টে যায় তাদের চেহারা
সন্ধিপত্রে হস্তক্ষেপকারী লোকজন এসব নির্মল চরিত্রের আধার
বৃহৎ ঝাণ্ডাধারী জননেতা সর্বজননন্দিত ব্যক্তিত্ব যাদের।[১৪]

রাসূলুল্লাহ [সা] ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানালে চাচা আবূ তালিব তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি কোনদিন কোনভাবে। অবশ্য অন্যান্য নওমুসলিমের মতো প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেননি। কেউ কেউ তাঁকে 'অপ্রকাশ্য মুমিন' বলে অভিহিত করে থাকেন।[১৫] রাসূলুল্লাহ [সা-এর দাওয়াতের জবাবে চাচা আবূ তালিব কাব্যে বলেন :

আমাকে দাওয়াত দিচ্ছো (ইসলামে) জানি তুমি আমার কল্যাণকামী
সুপথ দেখালে সবায়, পূর্ববৎ বিশ্বাসভাজন সত্যবাদী তুমি
উপস্থাপন করেছ যে দীন স্বীকার করি তা সত্য নির্ভুল
জগতে যত দীন রয়েছে সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে দীন

www.pathagar.com

যদি ভর্ৎসনা বা গালমন্দের আংশকা না করতাম আমি
আমাকে পেতে তুমি এ দীনের বিনীত প্রকাশ্য অনুগামী
ওরা সব মিলেও ক্ষতি তোমার করতে পারবে না কভু
যতদিন বেঁচে আছি– লাশ হয়ে কবরে না যাই আমি।[১৬]

বহু দেববাদী কুরাইশদের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বড় 'আপত্তিকর দিক' হচ্ছে তিনি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কথা বলেন, দেবদেবীর পূজা অর্চনা করতে নিষেধ করেন, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে বলেন। এজন্য কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ [সা]-কে অপমাণিত করার, নিপীড়িত করার সম্ভাব্য কোন কৌশলই হাতছাড়া করেনি। তাদের এরূপ ঘৃণ্য অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মুখে আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ [সা]-এর অনন্য মর্যাদা ও অনুপম শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরে বলেন ঃ

আমাদের ছেলে মুহাম্মাদ [সা]-কে দেয়া যায় না মিথ্যার অপবাদ
(সভ্য সমাজে) না-হক কথার আমল দেয়া হয় না যুগপৎ।
তাঁর উজ্জ্বল শুভ্র চেহারার বরকতে প্রার্থনা করা হয় বর্ষার
ইয়াতীম মিসকীনের আশ্রয় তিনি, ত্রাণকর্তা বিধবার
তাঁর কাছে আশ্রয় লয় হাশিমীদের দুঃস্থ অভাবীজন
ওরা সবাই থাকে তাঁর দয়া মায়ায়, স্বাচ্ছন্দ্যে একান্ত আপন।[১৭]

সহীহ্ বুখারীর বিবরণ থেকে জানা যায়, হযরত সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি কখনো কখনো কথাবার্তায় কবির কথা উদ্ধৃত করতাম। মিম্বরে আসীন রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কবির কবিতা আবৃত্তি করতাম। একদিন মুষলধারে বৃষ্টির সময় মদীনার অলিগলি ও নালা দিয়ে উত্তাল বেগে পানি প্রবাহিত হলে আমি উদ্ধৃত করলাম :

তাঁর উজ্জ্বল চেহারার বরকতে দু'আ করা হয় বর্ষার
ইয়াতীম মিসকীনদের আশ্রয় তিনি, ত্রাণকর্তা বিধবার।[১৮]

উদ্ধৃত হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ [সা]-কে কেন্দ্র করে যেসব কবিতা রচনা করেছিলেন তা সাহাবা-ই-কিরামের মুখে মুখে মাঝে-মধ্যে উচ্চারিত হত স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। রাসূলুল্লাহর [সা]-এর ওসীলায়, তাঁর চেহারার ওসীলায় বৃষ্টি নাযিলের ঘটনা প্রমাণিত সত্য। এ সত্যকে কাব্যছন্দে সর্বাগ্রে রূপায়ণ করেছেন কবি আবূ তালিব। আবূ তালিবের ওফাতের বহু বছর পর মদীনার জীবনে বৃষ্টি নামলে কোন কোন সাহাবী উদ্ধৃত করতেন তাঁর রচিত বৃষ্টি বিষয়ক উপর্যুক্ত পংক্তিটি। অন্যান্য পংক্তি ও কাব্যাংশও তাঁরা উল্লেখ করতেন অবস্থার চাহিদানুসারে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, রাসূলুল্লাহ [সা] মদীনার জীবনে বিশিষ্ট আনসার কবিদের নিয়ে বিরাট এক কবিগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। সাংস্কৃতিক যুদ্ধে তাঁরা প্রত্যেকেই সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন। কবি হাসসান ইবন ছাবিত [রা], কবি আবদুল্লাহ ইন রাওয়াহাহ্

www.pathagar.com

[রা], কবি কা'ব ইবন মালিক [রা] তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর মক্কী জীবনের প্রথম দশ বছরে মক্কার কবিরা তাঁর ডাকে তেমন সাড়া দেয়নি; বরং তারা তাদের কবিতাকে নিপুণভাবে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে যথাসাধ্য। দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি তাদের কাব্যিক ও সাংস্কৃতিক নির্যাতন কম চলেনি ইসলাম ও নওমুসলিমদের ওপর। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে সর্বপ্রকার যুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে রুখে দাঁড়িয়েছেন আবূ তালিব। তিনি তাঁর নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভালবাসা দিয়ে, তাঁর বুদ্ধি কৌশল দিয়ে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন অকপটে। কুরাইশ কবিরা যে মুহূর্তে তাঁদের কবিতার অস্ত্র প্রয়োগ করে ইসলামকে নিন্দিত করার পাঁয়তারা করেন, ঠিক সে মুহূর্তে কবি আবূ তালিব তাঁর কবিতাকে ব্যবহার করেছেন ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে, ভ্রাতৃষ্পুত্র মুহাম্মাদ [সা]-এর হিফাযতে! আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। ■

তথ্যসূত্র

১. রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : "যতদিন না আবূ তালিবের মৃত্যু হয়েছে ততদিন আমি কুরাইশদের প্রবল আক্রমণের মুখোমুখি হইনি।" দেখুন : আস্-সীরাতুন্নববীয়া : ইবন কাছীর, পৃ. ১২২

২. আস-সীরাতুন্নববীয়া : কাছীর, পৃ. ১২৯

৩. আস-সীরাতুন্নববীয়া : কাছীর, পৃ. ১৪৭, সীরাতুন্নবী [সা] : ইবন হিশাম : ই.ফা. বা খ ১, পৃ. ২০৭; সীরাতুন্নবী : ইবন ইসহাক খ ৩

৪. আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ : ইবন কাছীর খ ৪ পৃ. ৪৮

৫. আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ : ইবন কাছীর খ ৪ পৃ. ৫০
আল্লামা ইবন হিশাম আবূ তালিব রচিত এ কবিতাটি সম্পূর্ণ উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন : 'আমার মতে এটা তার রচিত সহীহ ও বিশুদ্ধ কাব্যগীতি, অন্য কারো রচিত নয়। অবশ্য কোন কোন বিশেষজ্ঞ কবিতাটির সিংহভাগ পংক্তি অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এটা অন্যের দ্বারা পরবর্তীতে রচিত।' (দেখুন সীরাতুন্নবী : ইবন হিশাম খ ১। ইবন হিশামের এই মন্তব্য উল্লেখ করে আল্লামা ইবন কাছীর বলেছেন : এ এক গভীর অর্থবহ সুমহান কাব্যগীতি। কবি আবূ তালিবের ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ কাব্যগীতি রচনা করা সম্ভব নয়। এ কাব্য-গীতি জাহিলিয়াত কালের বিখ্যাত আস্-সাবউল মু'আল্লাকাত বা 'মহামূল্যবান সপ্তগীতির চেয়েও উৎকৃষ্ট ও অধিক অর্থবহ। (দেখুন, আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ : ইবন কাছীর খ ৩ পৃ. ৫০)

৬. সুহায়লী বলেছেন, এক কল্যাণ অন্য কল্যাণের চেয়ে বেশী কল্যাণকর হতে পারে। এ দৃষ্টিতে এলাইনটির অর্থ করা যায় অর্থাৎ আল্লাহ যাকে তাঁর মুহাব্বত দ্বারা বিশেষিত করেছেন তার চেয়ে অধিক কল্যাণকর আর কোন কল্যাণ নেই। (দেখুন : আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্ টীকা : খ ৩ পৃ. ৭৭)

৭. সীরাতুন্নবী [সা] : ইবন হিশাম খ ১, পৃ. ৩৫, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্ : খ ৩, পৃ. ৭৭;

৮. 'আবূ উতায়বা' আবূ লাহাবের উপনাম। কুরআনে তাকে আবূ লাহাব নামে অভিহিত

www.pathagar.com

করা হয়েছে। আবূ লাহাব নামেই সে কুখ্যাত হয়ে উঠে। তার মূল নাম আবদুল উযযা। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চাচা চিলেন। (দেখুন সূরা লাহাব : আল কুরআন : ১১১ সূরা)।

৯. আবূ মুআত্তাব বলতে আবূ লাহাবকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্ এর টীকা : খ ৩, পৃ. ৮২;

১০. সীরাতুন্নবী [সা] : ইবন হিশাম খ ২, পৃ. ৬২, আল বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ্ : খ ৩, পৃ. ৮২;

১১. 'হাজূন' মক্কার উঁচু দিকের একটি স্থানের নাম। হিশাম ইবন আমরের নেতৃত্বাধীন দলের সদস্যরা (যথা যুহায়র ইবনে আবী উমাইয়া, মুতইম ইবন আদী, আবূল বাখতারী ও যামআ ইবন হিশাম প্রমুখ) এই হাজূন নামক স্থানে বসে রাতে গোপনে চুক্তিপত্র বাতিলের কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন।

১২. চুক্তিপত্রটি বাতিল ও ছিন্ন করতে।

১৩. চুক্তিপত্র ছিন্নকারী দলের নেতা হিশাম ইবন আমরের পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে লু'আঈ ইবন গালিব। তার বংশধারা এরূপ : হিশাম ইবন আমর ইবন রাবীআহ্ ইবন হারিছ ইবন যুহায়র ইবন নাসর ইবন জাযীমা ইবন মালিক ইবন হিসল ইবন আমির ইবন লুআই ইবন গালিব।

১৪. আস-সীরাতুন্নববীয়া : ইবন কাছীর খ ১ পৃ. ৪৬৪; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া : ইবন কাছীর খ ৩, পৃ. ৮২; সীরাতুন্নবী : ইবন হিশাম খ ৩;

১৫. দেখুন : 'আবূ তালিব' নিবন্ধ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড পৃ. ৪৭

১৬. আস-সীরাতুন্নববীয়া : ইবন কাছীর খ ১ পৃ. ৪৬৪; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ইবন কাছীর খ ৩, পৃ. ৩৭;

১৭. সীরাতুন্নবী [সা] : ইবন হিশাম খ ১ পৃ. ২৭২; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্ : ইবন কাছীর;

১৮. সহীহ বুখারী : খ ৫, পৃ. ১৫৫।

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক অবদান

মূল : ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী

তরজমা : আকরাম ফারুক

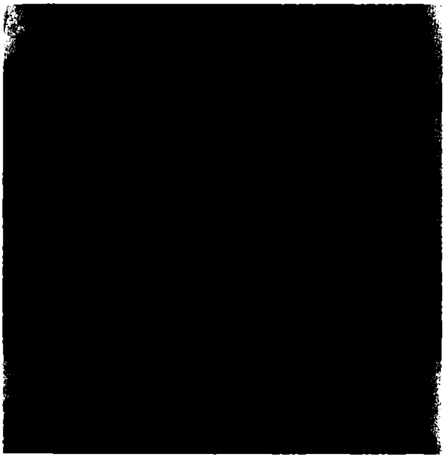

ইসলামী সভ্যতা মানব জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সাহিত্য ও দর্শন এবং রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ও স্মৃতি রেখে গেছে। সেই ঐতিহাসিক অবদানসমূহ ও স্মৃতিসমূহ কী এবং তার গুরুত্ব কতখানি, সেটাই এবার আমরা পর্যালোচনা করবো।

ইসলামী সভ্যতার চিরঞ্জীব অবদান ও উপাদানগুলোকে আমরা পাঁচটা বড় বড় ভাগে বিভক্ত করতে পারি :

১. আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্ম

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইউরোপে যে সংস্কারমুখী সভ্যতার উত্থান ঘটেছে, তার ওপর ইসলামী সভ্যতার মূলনীতি ও আদর্শের গভীর প্রভাব পড়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা আল্লাহর একত্বের শিক্ষা দিয়েছে এবং বলেছে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় ক্ষমতায় আর কেউ অংশীদার নেই। তাঁর কোন দেহ নেই। যুলুম ও অসম্পূর্ণতা থেকে তিনি সর্বোতভাবে মুক্ত ও পবিত্র। ইসলাম এ কথাও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং তাঁর আইন

www.pathagar.com

ও বিধানকে বুঝার জন্য ইসলামের পাদ্রী-পুরোহিত ধরনের কোন স্বতন্ত্র শ্রেণীকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মন-মগজকে উন্মোচিত করতে এবং এই চিরন্তন ও অকাট্য মূলনীতিগুলোর দিকে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইতোপূর্বে দুনিয়ার জাতি-গোষ্ঠীগুলো এক নিষ্ঠুর ধর্মীয় একনায়কত্ব ও পৌরহিত্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, এই যাঁতাকল তাদের স্বাধীন চিন্তা ও মতামতের কণ্ঠরোধ এবং তাদের দেহ ও সহায়-সম্পদকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ইসলাম যে বিজয় অর্জন করেছিল তার স্বাভাবিক দাবী ছিল, আশপাশের জাতি-গোষ্ঠীগুলো সবার আগে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়া এবং বাস্তবেও তাই হয়েছিল। এ জন্যই আমরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইউরোপে এমন কিছু সংস্কারের আবির্ভাব ঘটতে দেখি, যারা পৌত্তলিকতা ও ছবিপূজার বিরোধী ছিল। আরো কিছুকাল পরে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটে, যারা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে মানুষকে মাধ্যম বানানোর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে এবং পাদ্রী ও বিশপদের বাদ দিয়ে সরাসরি ধর্মীয় গ্রন্থ চর্চার আবেদন জানায়। বহু সংখ্যক গবেষক জোর দিয়ে বলেছেন যে, মার্টিন লুথার স্বীয় সংস্কার আন্দোলনে আরব দার্শনিক ও মুসলিম চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতদের লিখিত বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং লুথারের যুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজে ঐ সব অনুবাদ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতো। ফরাসী বিপ্লবে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ বিকৃত খ্রীষ্টীয় পৌত্তলিক ও পাদ্রীতন্ত্র থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মুক্তির আন্দোলন। ক্রুসেড যুদ্ধ ও স্পেনের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতি এ আন্দোলনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২. দর্শন ও বিজ্ঞান

চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, রসায়ন, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ময়দানেও আমাদের সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। ইউরোপে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ ঘটে, ইসাবেলা, কর্ডোভা ও গ্রানাডার [স্পেন] মসজিদগুলোতে মুসলিম জ্ঞানতাপসদের কাছ থেকে ইউরোপবাসীর অর্জিত ফল্গুধারা থেকেই তার স্ফূরণ ঘটেছিল। পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা যখন আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে প্রবেশ করতো, তখন এটা দেখে অবাক হয়ে যেত যে, সাদা-কালো নির্বিশেষে যে কোন আদম সন্তানের জন্য এসব বিদ্যাপীঠের দ্বার উন্মুক্ত, যার দৃষ্টান্ত তাদের দেশে ছিল না। আমাদের জ্ঞানীজনেরা যখন নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষে ও পুস্তকাদিতে পৃথিবীর আবর্তন, তার গোলাকৃতি এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আবর্তন নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন ইউরোপবাসীর মন-মগজে এসব বিষয়ে নানা রকমের অলীক ধারণা ও কুসংস্কার কিলবিল করতো। এ কারণেই আরবী পুস্তকাদির ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ শুরু হয় এবং আমাদের পণ্ডিতদের লেখা পুস্তকাদি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো আরম্ভ হয়। ইবনে সীনার 'আল কানুনের' অনুবাদ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। এর চেয়েও বৃহত্তর ও বিশালকায় গ্রন্থ আর-রাযীর 'আল হাবী'র অনুবাদ হয় ১৩শ শতাব্দীতে। ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে

www.pathagar.com

চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষা এই দু'খানা গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল ছিল। দর্শনের চর্চা চলেছিল আরো দীর্ঘকাল। আমাদের অনুবাদ করা গ্রীক দর্শন থেকেই ইউরোপের এই শাস্ত্রে হাতেখড়ি হয়।

বিশিষ্ট গবেষক গাস্টাওলীভানসহ বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বীকার করেন যে, মুসলমানরা অন্তত কয়েকশো বছর ধরে ইউরোপকে দর্শন শিক্ষা দিয়েছে এবং ইউরোপের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বইপুস্তকই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র উৎস। ইবনে সীনার অন্যান্য পুস্তকের অনুবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে মম্বিলিয়াতে করা হয়েছে। রোজার বেকন, লিওনার্ড, আর্নো ফিলকোনী, রেমন লাওল, সান থোমা, আলবার্ট, আজনোনিক প্রমুখ পুরোপুরি আরবী পুস্তকাদির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। মোশে রীনান বলেন : 'আলবার্ট দি গ্রেট ইবনে সীনার কাছে এবং সান থোমা ইবনে রুশদের কাছে ঋণী'। প্রখ্যাত ওরিয়েন্টালিস্ট সেদিভ বলেন : "মধ্যযুগে একমাত্র আরবরাই ছিল সভ্যতার পতাকাবাহী। উত্তরের অসভ্য উপজাতিগুলো ইউরোপকে লুণ্ঠন ও পদদলিত করে যে সভ্যতার বীজ বুনে রেখে গিয়েছিল, আরবরাই তা থেকে ইউরোপকে মুক্ত করে। আরবরা গ্রীক দর্শনকে শুধু বহন করে আনেনি বরং তাকে আরো বিকশিত করেছে এবং বিশ্ব প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে নতুন নতুন দিক উন্মোচন করেছে। তারা মহাশূন্য বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনের পর গণিত শাস্ত্রেও দক্ষতা অর্জন করে এবং এ ক্ষেত্রে তারা আমাদের ওস্তাদ ছিল। জারবার্ট সেলিফিস্টার [দ্বিতীয়] ৯৭০ থেকে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে স্পেন থেকে শেখা জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে ছড়িয়ে দেন। ইংরেজ পণ্ডিত ওহিলাত ১১০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে স্পেন ও মিশর ভ্রমণ করেন এবং আরবী ভাষায় লেখা জ্যামিতি গ্রন্থ আল-আরকানের অনুবাদ করেন, অথচ ঐ সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে ইউরোপের হাতেখড়িও হয়নি। আফলাতুন তিকোলী নামক জনৈক পণ্ডিত থিওডোসিয়সের গ্রন্থ 'আল-আরব' আরবী থেকে অনুবাদ করেন। লিওনার্ড দ্য ভিঞ্চি আরবদের কাছ থেকে আহরিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আলজেবরা সংক্রান্ত একখানা পুস্তক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখেন। কাম্বালুস নেভী ১৩শ শতাব্দীতে আরবীতে লেখা জ্যামিতি পুস্তক উকলিদেসের সর্বোত্তম অনুবাদ করেন। একই শতাব্দীতে হাসান ইবনে হাইসামের গ্রন্থ 'আলবাসরিয়াত' এর ভিত্তিতে মহাশূন্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য পাশ্চাত্যে প্রচার করেন ফেতলুন বোলনী। রজার [১ম] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিসিলিতে আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নির্দেশ দেন। ফ্রেডারিক [২য়] এর দরবারে সর্বক্ষণ অবস্থান করে তাকে জীববিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন ইবনে রুশদের পুত্র। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পুস্তকে হোমিল্ড লিখেছেন : আরবরাই সর্বপ্রথম রাসায়নিক ওষুধ তৈরির পন্থা উদ্ভাবন করেন। ইবনে সীনার 'আল কানুন' পাঁচ খণ্ডে অনূদিত হয়ে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে এবং ফ্রান্স ও ইটালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানচর্চার জন্য এর ওপরই নির্ভর করা হতো।

৩. ভাষা ও সাহিত্য

পাশ্চাত্যবাসী বিশেষত স্পেনীয় কবিগণ আরবী সাহিত্য দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঘোড়সওয়ারী, বীরত্ব, উদাহরণ ও উপমা, চমকপ্রদ রচনাবলী স্পেনের আরবী সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রবেশ করেছে। স্পেনের খ্যাতিমান

www.pathagar.com

লেখক আবানীয লিখেছেন : "আরবদের স্পেনে প্রবেশ এবং দক্ষিণ ইউরোপে তাদের আস্তাবল ও ঘোড়া ছড়িয়ে পড়ার আগে ইউরোপ অশ্বারোহণ, যুদ্ধ বিদ্যার সাথে পরিচিত ছিল না। রোজী লিখেছেন, "মেধাবী ও রুচিবান লেখকদের ওপর আরবী সংগীত জাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করেছে।"

চতুর্দশ শতাব্দী ও তারপর ইউরোপের বহু সাহিত্যিকের লেখায় আরবী সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে বুকাশিও 'দশটি সকাল' নামে তার যে গল্পের পুস্তক প্রকাশ করেন তাতে তিনি আলিফ লায়লা তথা আরব্যোপন্যাসের অনুকরণ করেন। শেক্সপিয়ার তার এক নাটকের কাহিনী এখান থেকে নিয়েছেন। আরব্যোপন্যাসের অনুকরণে জার্মান নাট্যকার লিসং 'বোকা চিকিৎসক' নামক নাটক এবং ইংরেজী সাহিত্যিক বুকাশিও তার বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'কন্টার বেরী টেল্‌স' লিখেছেন। দান্তের প্রখ্যাত কবিতা 'ডিভাইন কমেডি' আবুল আলা আল-মায়ারীর 'গুফরান' এবং ইবনে আরাবীর জ্বিন সংক্রান্ত রচনাবলী দ্বারা প্রভাবিত। 'আলিফ লায়লা' বা এরাবিয়ান নাইট্‌সের বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় তিনশোরও বেশী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি 'সেকিটের ভ্রমণ কাহিনী' ও ডিফোর রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণ কাহিনী আলিফ লায়লা ও আরব দার্শনিক ইবনে তোফায়েলের গ্রন্থ 'হাই ইবনে ইয়াকবান' এর অনুকরণে লিখিত। আলিফ লায়লার এত ব্যাপক প্রচার থেকে বুঝা যায়, ইউরোপবাসী এই পুস্তক দ্বারা কত বেশী প্রভাবিত।

এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় আরবী বহু শব্দ প্রায় আসল রূপ নিয়েই প্রবেশ করেছে। যেমন : কুতন থেকে কটন, লেমুন থেকে লেমন, সিফর থেকে যিরো ইত্যাদি। মাইকেল বলেছেন : "ইউরোপ স্বীয় নান্দনিক সাহিত্যে আরবী সাহিত্যের কাছে ঋণী।" অনুরূপভাবে মধ্যযুগে ইউরোপে যেসব আধ্যাত্মিক ও চিন্তাগত বিপ্লব এসেছিল, তার পেছনেও আরব জাতির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রেরণার প্রচুর অবদান ছিল।

৪. আইন রচনা

ইউরোপের যেসব ছাত্র স্পেনের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে অধ্যয়নরত ছিল, তারা মুসলমানদের বহু ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করেছিল। সে সময় ইউরোপীয় দেশগুলোতে কোন স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না এবং কোন ইনসাফপূর্ণ আইনও চালু ছিল না। নেপোলিয়ান যখন মিশর জয় করলেন, তখন মালেকী মযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থাবলী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সর্বপ্রথম 'কিতাবুল খলীল' অনুবাদ করা হয়, যা ফরাসী আইনের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন ফরাসী আইন অনেকাংশে মালেকী মযহাবের অনুরূপ ছিল। কিতাবুল খলীলের লেখক ছিলেন খলীল বিন ইসহাক বিন ইয়াকুব [মৃত্যু ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে]।

৫. সরকার ও শাসন ব্যবস্থা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে শাসকদের সমালোচনা করার অধিকার জনগণকে দেয়া হতো না। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ছিল গোলাম ও মনিবের মতো। শাসন হতো চরম স্বৈরাচারী এবং প্রজাদের সাথে যেমন খুশী তেমন আচরণ করতো। রাজ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে

www.pathagar.com

প্রাপ্ত সম্পত্তি মনে করা হতো এবং তা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হতো।

দুই পক্ষে লড়াই হলে বিজয়ী পক্ষের জন্য পরাজিত পক্ষের প্রাণ, সহায়-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা হরণ করা হালাল হয়ে যেত। ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। একমাত্র ইসলামই এসে অন্যান্য মূলনীতির সাথে এ কথাও ঘোষণা করে যে, শাসকদের কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার জনগণের রয়েছে এবং শাসকরা শুধু জনগণের রক্ষক ও বেতনভুক্ত সেবক। জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা ও সেবা করাই তাদের দায়িত্ব। ইসলামের অভ্যুদয়ের পরই সর্বপ্রথম মানবেতিহাসের এই নজীরবিহীন ঘটনা ঘটলো যে, একজন সাধারণ প্রজা সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসকের [খলীফা উমার] কাছে প্রকাশ্যে সমাবেশে জিজ্ঞাসা করে বসলো যে, তিনি যে পোশাক পরেছেন, তা কোথা থেকে কিভাবে পেলেন? শাসক এই প্রশ্নকারীকে ফাঁসিও দিলেন না, জেলেও পাঠালেন না, নির্বাসিতও করলেন না। বরং সহজ-সরলভাবে সাফাই দিলেন এবং তাতে সবাই সন্তুষ্ট হবার পরই তিনি ভাষণ সম্পূর্ণ করলেন। [গনীমতের কাপড়ের যতটুকু অংশ অন্যরা পেয়েছিল, তাতে একটা পুরো জামা কারো হয়নি। হযরত উমারের জামা কিভাবে হলো এবং তিনি অন্যদের চেয়ে বেশী নিলেন কিনা– এটাই ছিল প্রশ্নের উদ্দেশ্য। হযরত উমার স্বীয় পুত্রের সাক্ষ্য সহকারে জানালেন যে, তিনি নিজেও সমান ভাগ পেয়েছেন। কিন্তু তার পুত্র নিজের অংশ পিতাকে দিয়েছে। এভাবে দুই অংশ মিলে জামা তৈরি হয়েছে।]

মানবেতিহাসে এ ঘটনাও প্রথম ঘটতে দেখা গেল যে, একজন নগণ্য প্রজা রাষ্ট্রপ্রধানকে 'আসসালামু আলাইকুম, হে বেতনভুক ভৃত্য' বলে সম্বোধন করলো এবং রাষ্ট্রপ্রধানও স্বীকার করলেন যে, যথার্থই আমি একজন বেতনভুক ভৃত্য। আমার কাজ একজন বেতনভুক ভৃত্যের ন্যায় একনিষ্ঠভাবে জনগণের সেবা করা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করা। ইসলামী সভ্যতা এই মূলনীতি শুধু পোষণই করেনি বরং বাস্তবায়িতও করেছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের আশপাশে যেসব জাতি-গোষ্ঠী বাস করতো, তাদের সবাই বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার এই একই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়। তারাও ক্রমশ: আন্দোলন করে, বিপ্লব করে ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তি লাভ করে। সমগ্র ইউরোপে এটা হয়েছে। তারা স্পেনেও দেখেছে যে, মুসলিম শাসকরা জনগণের সামনে দায়ী থাকে এবং জনগণ তাদের ওপর কঠোর দৃষ্টি রাখে। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় বিভিন্ন মুসলিম দেশে গিয়ে স্বচক্ষে এটা প্রত্যক্ষ করেছে। এসব দেখার পর স্বদেশে এসে তারা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও স্বাধীনতা লাভ করে। এই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই ফরাসী বিপ্লবও সংঘটিত হয় এবং এই বিপ্লব এমন কোন নতুন মূলনীতি উপহার দেয়নি, যা আমাদের সভ্যতা দেয়নি। আমাদের সভ্যতা যুদ্ধের বিজিত দেশগুলোর অধিবাসীদের মধ্যেও এমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধের সঞ্চার করেছে যে, মানবেতিহাস তার নজির ইতোপূর্বে আর কখনো দেখেনি। ইসলামী সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েই বিজিত মিশরবাসী প্রথমবারের মতো এই দৃশ্য দেখেছিল যে,

www.pathagar.com

অমুসলিম অধিবাসীদের এক ব্যক্তি সুদূর মদিনায় এসে রাষ্ট্রপ্রধান খলিফা উমারের [রা] কাছে মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং খলিফা তার সন্তোষজনক প্রতিকার করেন। ফরিয়াদী অভিযোগ করল যে, আপনার গভর্নরের ছেলে আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে লাঠিপেটা করেছে। রাষ্ট্রপ্রধান এ অভিযোগ শোনামাত্র গভর্নর ও তার ছেলেকে মদিনায় ডেকে পাঠালেন এবং ফরিয়াদীর ছেলেকে দিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করালেন। সেই সাথে এই ঐতিহাসিক সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেন যে, "তুমি কবে থেকে মানুষকে গোলাম বানাতে শুরু করলে? অথচ তারা তাদের মায়ের পেট থেকে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছিল।"

এ ছিল আমাদের সভ্যতার সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নতুন এক প্রেরণা। নচেৎ যে পিতা অভিযোগ করেছিল, সে এবং তার ছেলে আমাদের সরকার ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অনেক মারপিট খেয়েছে, অনেক লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সহ্য করেছে, তার সম্পদ-সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হতো এবং ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি করা হতো। অথচ বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা, প্রতিবাদ বা অভিযোগ করা তো দূরের কথা, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতেও পারতো না; এমনকি আত্মসম্ভ্রমের অনুভূতিও তারা হারিয়ে বসেছিল। আমাদের সভ্যতার সূর্য যখন তার মাথার ওপর কিরণ ছড়াতে শুরু করলো, কেবল তখনই সে আওয়াজ তোলার সাহস পেল যে, "হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আল্লাহর কাছে আপনার যুলুম থেকে পানাহ চাই।" এই যুলুমটা কী ছিল? রক্তপাতও নয়, ধর্ষণও নয়, সম্পদ লুণ্ঠনও নয়, ধর্মীয় বলপ্রয়োগও নয়– কেবল এক ছেলে অন্য এক ছেলেকে দুটো পিটুনি দিয়েছিল।

পাশ্চাত্যবাসী আমাদের সভ্যতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিল মধ্যযুগে সিরিয়া ও স্পেনের মাধ্যমে। এর আগে শাসকরা ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে এবং জনগণ শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করতে পারতো না। শাসকের সমালোচনা বা মযলুমকে সাহায্য করা যে একটা মৌলিক অধিকার, সেই অনুভূতি তাদের ছিল না। তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, নিছক ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে একে অপরকে ছাগল-ভেড়ার মতো যবাই করে দিত। যখন তারা আমাদের সংস্পর্শে এল, তখনই তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হলো এবং এই অনুভূতিই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে স্বাধীন করলো। এরপরও স্বাধীনতা ও মানবতার ব্যাপারে আমাদের সভ্যতা যে ভূমিকা পালন করছে, তা অস্বীকার করা কি সম্ভব? জীবনের পাঁচটা প্রধান বিভাগে এই যদি হয়ে থাকে আমাদের সভ্যতার অক্ষয় অবদান ও নিদর্শন, তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আমাদের সভ্যতা যে জাতি-গোষ্ঠীগুলোকে স্বাধীনতার প্রেরণা যুগিয়েছে, তারা আমাদের কাছে ঋণী। কিন্তু আমরা অন্যায় আশা ও দম্ভ দেখিয়ে এই উপকারের বদলা নিতে চাই না। কেবল এইটুকু চাই যে, আমাদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি জন্মুক, আমরা আমাদের সভ্যতা ও উত্তরাধিকারের মূল্য উপলব্ধি করি এবং আরেকবার সেই 'মধ্যবর্তী উম্মাত' হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, যা পৃথিবীতে সত্যের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে এবং বিশ্ববাসীকে সত্য, ন্যায়, সততা ও সৌজন্যবোধের পথ দেখাতে পারে। ইনশাআল্লাহ, আমরা তা পারবো বলে আশা করি। ■

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মাদের [সা] নবুয়াত

তরজমা : সৈয়দ আবদুল মান্নান

এমন এক সময় এলো, যখন সারা দুনিয়ার ও মানবজাতির সকল কওমের জন্য এক পয়গাম্বর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে আল্লাহ তা'য়ালা আরব দেশে পয়দা করলেন এবং তাঁকে ইসলামের পূর্ণ শিক্ষা ও পূর্ণাংগ বিধান দান করে তা সারেজাহানে প্রচার করার মহাকর্তব্যে নিযুক্ত করেন।

দুনিয়ার ভূগোল পর্যালোচনা করলে প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় যে, সারা দুনিয়ার পয়গাম্বরীর জন্য যমীনের বুকে আরবের চেয়ে অধিকতর উপযোগী আর কোন স্থান হতে পারে না। এ দেশটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইউরোপও এখান থেকে অত্যন্ত নিকটবর্তী। বিশেষ করে তখনকার দিনে ইউরোপের সভ্য জাতিসমূহ ইউরোপের দক্ষিণ অংশে বাস করতো এবং সে অংশটি আরব থেকে হিন্দুস্তানের মতই নিকটবর্তী ছিল।

আবার তখনকার দিনের দুনিয়ার ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে যে, এ নবুয়াতের জন্য তখনকার দিনে আরব কওমের চেয়ে উপযোগী আর কোন কওম ছিল না।

www.pathagar.com

আর সব বড় বড় কওম তখন দুনিয়ার বুকে নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আরবরা ছিল তখনো তাজা তারুণ্যের অধিকারী কওম।

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে অন্যান্য কওমের চালচলনে এসেছিল বহুবিধ বিকৃতি : কিন্তু আরব কওমের উপর তখনো তেমন কোন সভ্যতার প্রভাব পড়েনি, যার ফলে তারা আরাম প্রয়াসী, আয়েশ-প্রিয় ও হীন স্বভাব সম্পন্ন হতে পারে। ঈসায়ী ছয় শতকে আরব ছিল সে যুগের সভ্যতাগর্বিত জাতিসমূহের দুষ্ট প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে জাতির মধ্যে সভ্যতার হাওয়া লাগেনি তার মধ্যে মানবীয় গুণরাজির জৌলুস যতটা থাকা সম্ভব, তা আরবদের মধ্যে ছিল। তারা ছিল বীর্যবান, নির্ভীক ও মহৎপ্রাণ; তারা প্রতিশ্রুতি পালন করতো, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন জীবন ভালবাসতো তারা, অপর কোন জাতির গোলামী তারা স্বীকার করতো না। আপনার ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে তারা কুণ্ঠিত হতো না। তারা অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতো এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি তাদের কোন আসক্তি ছিল না। নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে নানা প্রকার দুষ্কৃতির অস্তিত্ব ছিল তার বিবরণ পরে জানা যাবে, কিন্তু তাদের সে দুষ্কৃতির কারণ ছিল এই যে, আড়াই হাজার বছরের মধ্যে তাদের দেশে কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয়নি,[১] তাদের মধ্যে নৈতিক সংস্কৃতির সাধন ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা দানের যোগ্যতা নিয়ে কোন সংস্কারক আসেননি। বহু শতাব্দী ধরে রুক্ষ ঊষর মরুর বুকে স্বাধীন জীবন যাপনের ফলে তাদের মধ্যে মূর্খতা ও জাহেলী ভাবধারা প্রসার লাভ করেছিল এবং তারা তাদের অজ্ঞতা প্রসূত চালচলনে এতটা কঠোর ও দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর সাথে সাথে তাদের মধ্যে অবশ্যি এমন এক যোগ্যতা সঞ্চিত ছিল যে, কোন প্রতিভা-দীপ্ত মানুষ তাদের জীবন সংস্কার সাধনের জন্য এগিয়ে এলে এবং তাদেরকে কোন মহান লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়ে প্রবুদ্ধ করলে তারা সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সারা দুনিয়াকে ওলট পালট করতেও পশ্চাৎপদ হতো না। সারাজাহানের পয়গাম্বরের শিক্ষার প্রসার সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক তারুণ্য-দীপ্ত শক্তিশালী কওমের।

এরপর আরবী ভাষাও লক্ষ্যণীয়। আরবী ভাষা পাঠ করলে এবং তার সাহিত্য সম্পদের পরিচয় লাভ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, উচ্চ চিন্তাধারার প্রকাশ এবং আল্লাহর জ্ঞানের মাধুর্য সূক্ষ্মতাপূর্ণ রহস্য বর্ণনা করে মানব-অন্তরকে প্রভাবিত করার জন্য এর চেয়ে উপযোগী আর কোন ভাষা হতে পারে না। এ ভাষায় ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত কথা বা বাক্যের মাধ্যমে বিরাট বিরাট ভাব প্রকাশ করা যায় এবং তার প্রকাশভংগি এত বলিষ্ঠ যে, তীর বা বর্শার মতো তা মানুষের অন্তরকে বিদ্ধ করে। এ ভাষার মাধুর্য মানব-কর্ণে মধু বর্ষণ করে। তার মধুর সুর-লহরী মানব অন্তরকে অলক্ষ্যে ছন্দ-পাগল করে তোলে। কুরআনের মতো মহাগ্রন্থের বাহন হবার জন্য এমনি এক ভাষারই প্রয়োজন ছিল।

এখানেই আল্লাহ তা'য়ালার মহাজ্ঞানের প্রকাশ যে, তিনি তাঁর সর্বশেষ বিশ্বনবীকে

www.pathagar.com

প্রেরণের জন্য এ আরব ভূমিকেই মনোনীত করেছিলেন। যে পবিত্র সত্তাকে আল্লাহ তা'য়ালা এ মহত্তম কর্তব্যের জন্য মনোনীত করেছিলেন, তিনি কেমন অতুলনীয় ছিলেন, এখন তারই বর্ণনা পেশ করব।

নবুয়াতে মুহাম্মাদীর প্রমাণ : আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক। দুনিয়ায় তখন না ছিল তারবার্তার ব্যবস্থা, না ছিল টেলিফোন, না ছিল রেলগাড়ী, না ছিল ছাপাখানা, না ছিল পত্র-পত্রিকা, না ছিল বই-পত্র, না ছিল বিদেশ সফরের সুযোগ-সুবিধা যা আমরা আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি। এক দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে হলে অতিক্রম করতে হতো কয়েক মাসের পথ। তার আশেপাশে ছিল ইরান, তুরস্ক ও মিসর এবং সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কিছুটা ছিল। কিন্তু প্রকাণ্ড বালুর সমুদ্র সেসব দেশ থেকে আরবকে আলাদা করে রেখেছিল। আবার সওদাগররা মাসের পর মাস উটের পিঠে পথ চলে সেসব দেশে তেজারতের জন্য যেতো কিন্তু তাদের সে সম্পর্ক কেবল পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরব ভূমিতে তখনো কোন উচ্চাংগের সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে না ছিল বিদ্যালয়, না ছিল গ্রন্থাগার, না ছিল সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে লেখা-পড়ার চর্চা। সারা দেশে গণনা করার মতো স্বল্প সংখ্যক লোক ছিল, যারা কিছুটা লেখা-পড়া জানতো, কিন্তু তাও সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কোন সুগঠিত সরকারের অস্তিত্ব ছিল না সেখানে। কোন আইন-কানুন ছিল না। প্রত্যেক গোত্র তার নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাতন্ত্র চালিয়ে যেতো। সারা দেশে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট লুট-তরায চলতো। খুন-খারাবি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল সেখানকার নিত্য প্রচলিত ব্যাপার। মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না সেখানে, যার উপর যার কোনরূপ আধিপত্য চলতো তাকে হত্যা করে সে তার সম্পত্তি দখল করে বসতো। তাদের ভিতর কোন নীতিবোধ বা সভ্যতার সংস্পর্শ ছিল না। দুষ্কৃতি, শরাবখোরী ও জুয়া ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। একে অপরের সামনে নিরাবরণ হতে তাদের দ্বিধা ছিল না। এমন কি আরব-নারীরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করত। হারাম ও হালালের কোন পার্থক্য ছিল না তাদের জীবনে। আরবদের আযাদী এতটা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, তারা কোন নিয়ম, কোন আইন, কোন নৈতিক পদ্ধতি মেনে চলতে তৈরি ছিল না। কোন নেতার আনুগত্য তারা কবুল করতে পারতো না। আরবদের অজ্ঞতা এমন চরম রূপ গ্রহণ করেছিল যে, তারা পাথরের মূর্তিকে পূজা করত। পথ চলতে কোন সুন্দর পাথরের টুকরা পাওয়া গেলে তা তুলে এনে সামনে বসিয়ে তারা পূজা করত। যে শির কারো কাছে অবনমিত হতে রাজী হতো না, সামান্য পাথরের সামনে তা ঝুঁকে পড়তো এবং মনে করা হতো যে, সেই পাথরই তাদের সকল মনষ্ককামনা পূর্ণ করতে পারে।

এমন অবস্থায় এক জাতির মধ্যে একটি মানুষের আবির্ভাব হলো। শৈশবেই পিতা-মাতা ও পিতামহের স্নেহের ছায়া থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। অতীতের সেই অবস্থার মধ্যে যেটুকু শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছিল তাও তাঁর ভাগ্যে জুটলো না। বড় হলে তিনি আরব

www.pathagar.com

শিশুদের সাথে ছাগল চরাতে লাগলেন। যৌবনে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন বাণিজ্যে। তাঁর উঠা-বসা, মেলামেশা সবকিছুই হতে লাগলো সেই আরবদের সাথে, যাদের অবস্থা আগেই বলা হয়েছে। শিক্ষার নাম গন্ধ নেই, এমন কি সামান্য পড়াশুনাও তিনি জানেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চালচলন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র তাঁর চিন্তাধারা ছিল অপর সবার চেয়ে আলাদা। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, কারো সাথে দুর্বাক্য উচ্চারণ করেন না, কঠোর বাক্যের পরিবর্তে মধু বর্ষিত হয় তাঁর মুখ থেকে, আর তাঁর প্রভাবে মানুষ মুগ্ধ হয়ে আসে তাঁর কাছে। কারো একটি পয়সাও তিনি অবৈধভাবে গ্রহণ করেন না। তাঁর বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ মানুষ তাদের বহু মূল্যবান সম্পত্তি রেখে দেয় তাঁর হেফাযতে এবং তিনি প্রত্যেকের সম্পত্তি হেফাযত করেন নিজের জীবনের মতো। সমগ্র কওম তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'আল-আমিন' নামে আখ্যায়িত করেন। তাঁর লজ্জাশীলতাবোধ এমন প্রখর যে, শৈশব থেকে কেউ তাঁকে কোন দিন নিরাবরণ দেখেনি। তিনি এমন সদাচারী যে, দুরাচারী ও দুষ্কৃতি পরায়ণ জাতির মধ্যে প্রতিপালত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্ববিধ অসদাচরণ ও অশোভন কার্যকলাপকে ঘৃণা করেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি কার্যে পাওয়া যায় পরিচ্ছন্নতার পরিচয়। চিন্তাধারার পবিত্রতার দরুন তিনি নিজ জাতির মধ্যে লুট-তরাজ ও খুন-খারাবি দেখে অন্তরে গভীর দুঃখ অনুভব করেন এবং লড়াইয়ের সময়ে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর কোমল অন্তর প্রত্যেক মানুষের দু:খ-বেদনার শরীক হয়। ইয়াতিম ও বিধবাকে তিনি সাহায্য করেন, ক্ষুধিতের মুখে খাদ্য তুলে দেন, মুসাফিরদেরকেও সাদরে ঘরে ডেকে নিয়ে খেতে দেন। তিনি কাউকেও দুঃখ দেন না, নিজে অপরের জন্য দুঃখ বরণ করেন। নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী তিনি, মূর্তিপূজারী কওমের মধ্যে থেকেও মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করেন।

কখনো কোন সৃষ্টির সামনে তাঁর মাথা নত হয় না। তাঁর অন্তর থেকে স্বতঃই আওয়াজ আসে যমীন-আসমানের যা কিছু দেখা যায়, তার মধ্যে কেউ নেই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। তাঁর দিল আপনা থেকেই বলে ওঠে ঃ আল্লাহ্ তো একজনই মাত্র হতে পারেন এবং তিনি অদ্বিতীয়, এক। এক বর্বর জাতির মধ্যে এ মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো, যেন এক প্রস্তর স্তূপের মাঝখানে এক দীপ্তিমান হরীকখণ্ড, যেন ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝখানে এক প্রদীপ্ত দীপশিখা।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এমনি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন উচ্চাংগে মহৎ জীবন যাপনের পর তিনি চারিদিকের ঘনিভূত ঘনঘোর অন্ধকার দেখে হাঁপিয়ে ওঠেন, অজ্ঞাত, নীতিহীনতা, পাপাচার, দুর্নীতি, শির্ক ও পৌত্তলিকতার ভয়াবহ সমুদ্র বেষ্টন থেকে তাঁর অন্তর চায় মুক্তি, কারণ সেখানকার কোন কিছুই তাঁর মনোভাবের অনুকূল নয়। অবশেষে তিনি জনতা থেকে দূরে এক পর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জনতা ও প্রশান্তির দুনিয়ায় কাটিয়ে দেন দিনের পর দিন। অনাহারে থেকে থেকে তিনি আরো পরিশুদ্ধ করে তোলেন তাঁর আত্মাকে, তাঁর চিত্তকে, তাঁর মস্তিষ্ককে। সেখানে তিনি ভাবেন, চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন

www.pathagar.com

হয়ে থাকেন, সন্ধান করেন এক নতুন আলোকের, যে আলোর দীপবর্তিকা ধারণ করে তিনি দূর করতে পারেন তাঁর চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকার। তিনি সন্ধান করেন এক শক্তির উৎস, যা দিয়ে তিনি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবেন। এ বিকৃত দুনিয়াতে কায়েম করবেন মানবতার সুষ্ঠু ও সুন্দর কাঠামো।

এ ধ্যান-তন্ময়তার মাঝখানে তাঁর জীবনে এলো এক বিপুল আত্মিক পরিবর্তন। তাঁর প্রকৃতি এতকাল ধরে সন্ধান করেছিল যে আলোক, আর অন্তরে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলো তার দীপ্তরশ্মি। অকস্মাৎ তাঁর অন্তরে এলো এমন এক শক্তি, যার প্রকাশ তিনি আর কোনদিন অনুভব করেননি। পর্বত গুহার নির্জন পরিবেশ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে জনতার সামনে, আপন কওমের কাছে এসে তিনি তাদেরকে জানালেন : প্রস্তর মূর্তির কোন শক্তি নেই, তার পূজা বর্জন করো। এ যমীন, এ চাঁদ, এ সূর্য, এ যমীন ও আসমানের সকল শক্তি এক আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টি, তিনিই তোমাদের সকলের স্রষ্টা, তিনিই রিয্কদাতা, জীবন-মৃত্যু সবকিছুই তার নিয়মের অধীন। সবাইকে ছেড়ে একমাত্র তাঁরই উপাসনা করো, তারই কাছে মনোবাসোনার সিদ্ধি কামনা করো। চুরি, ডাকাতি, লুট-তরাজ, জুয়া, প্রতারণা—যা কিছু করছো তোমরা, এসব পাপ। আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী এসব দুস্কৃতি পরিত্যাগ করো। সত্য কথা বল, ন্যায়-বিচার করো, কারো প্রাণনাশ করো না, কারো সম্পত্তি হরণ করো না, যা কিছু গ্রহণ করো সত্যে পথে গ্রহণ করো, যা কিছু দান করো সত্যের পথে দান করো। তোমরা সবাই মানুষ সকল মানুষ পরস্পর সমান। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব [শরাফত] তার বংশ মর্যাদার নয়-বর্ণ, রূপ ও সম্পদের নয়। সৎকর্ম ও পবিত্র জীবন যাত্রাই হচ্ছে মানুষের শরাফতের নিদর্শন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করে, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করে, সে-ই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ। যে ব্যক্তি তার ব্যতিক্রম করে তার কোন গৌরবই নেই। মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে হাজির হতে হবে স্রষ্টার সামনে। চূড়ান্ত বিচারদিনের সেই সত্যিকার ন্যায়বিচারকের সামনে গ্রাহ্য হবে না কোন সুপারিশ অথবা উৎকোচ। সেখানে প্রশ্ন উঠবে না কোন বংশ মর্যাদার। সেখানে হবে কেবল ঈমান ও সৎকর্মের হিসেব। যার কাছে এসব সম্পদ থাকবে তার বাসভূমি হবে জান্নাত এবং যার কাছে এর কোন কিছুই থাকবে না তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে হতাশা ও দোযখের শাস্তি।

তখনকার আরবের জাহেল কওম ও পূণ্যাত্মা মানুষটির উপর দুর্ব্যবহার করে তাঁকে হয়রান করেছে কেবলমাত্র এ অপরাধে যে, তিনি তাদের বাপ-দাদার আমলে প্রচলিত কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন এবং পূর্বপুরুষদের অনুসৃত জীবন পদ্ধতির খেলাফ শিক্ষা দান করেছেন। এ অপরাধে তারা তাঁকে অকথ্য গালি দিতে লাগল, পাথর মেরে মেরে তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুললো। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। একদিন দু'দিন নয়, ক্রমাগত তের বছর ধরে তাঁর উপর চালিয়ে গেল কঠিনতম নির্যাতন, অবশেষে

www.pathagar.com

তাঁকে স্বদেশের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে হলো বিদেশে। দেশ ছেড়ে যেখানে তিনি আশ্রয় নিলেন, সেখানেও তাঁকে তারা কয়েক বছর ধরে পেরেশান করতে লাগল।

এতসব দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন তিনি কেন সহ্য করলেন? তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর কওমকে সত্যের সহজ-সঠিক পথ নির্দেশ করা। তাঁর জাতি তাঁকে বাদশাহের মর্যাদা দান করতে প্রস্তুত ছিল, তাঁর পায়ের উপর ঢেলে দিতে চেয়েছিল সম্পদের স্তুপ। তারা চাইত কেবল তাঁকে সত্য প্রচার থেকে বিরত রাখতে। তিনি তাদের সকল প্রলোভনকে অকাতরে উপেক্ষা করে আপন লক্ষ্যে অবিচল রইলেন। যে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য নয়, অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য ক্রমাগত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে যান, তার চেয়ে বড় মহৎ অন্তঃকরণ ও সততার কল্পনা আর কারো মধ্যে করা যায় কি? যাদের কল্যাণের জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারাই তাঁকে পাথর মেরে আহত করছে আর তিনি প্রতিদানে তাদের কল্যাণই কামনা করছেন। মানুষতো দূরের কথা, ফেরেশতাও এমনি সততার নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়।

বিশেষ করে দেখা দরকার যে, এ মানুষটি যখন পর্বত গুহা থেকে এ সত্যের বাণী নিয়ে বেরিয়ে এলেন মানব সমাজের সামনে, তখন তাঁর মধ্যে ঘটে গেল কত বড় বিপ্লব। যে বাণী তিনি মানুষকে শুনাতে লাগলেন, তা এমন স্বচ্ছ-সাবলীল, ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ডে এতই উচ্চাংগের ও অলংকারপূর্ণ যে, তাঁর আগে অথবা পরে এমন কথা কেউ কোন দিন বলেনি। কাব্য, বাগ্মিতা ও ভাষার স্বচ্ছতা নিয়ে আরবরা গর্ব করে বেড়াত। আরবের জনগণের সামনে তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন কালামে পাকের সূরার মতো একটি মাত্র সূরা পেশ করতে, কিন্তু তাঁর সে চ্যালেঞ্জের সামনে সবারই মাথা নত হয়ে গেল। এ বিশেষ কালামের [কুরআন শরীফ] ভাষা যেমন ছিল, তাঁর সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতার ভাষা কিন্তু তেমন উচ্চাংগের ছিল না। আজও যখন আমরা তাঁর নিজস্ব অন্যান্য বাণীর সাথে এ কালামের তুলনা করি, তখন তার মধ্যে ধরা পড়ে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য।

এ মানুষটি–এ আরব মরুর অক্ষর জ্ঞান বর্জিত মানুষটি যে জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করলেন, তাঁর আগে আর কোন মানুষ এমন কথা বলেনি, তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কেউ তেমনটি বলতে পারেনি; এমন কি, চল্লিশ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত তাঁর মুখে কেউ এমন কথা শুনেনি।

এ উম্মী [নিরক্ষর] মানুষটি নৈতিক-জীবন ও সামাজিক-জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও মানব-জীবনের অন্যান্য সকল দিক সম্পর্কে এমন সব বিধান রচনা করে গেছেন যে, বড় বড় বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বহু বছরের চিন্তা-গবেষণা ও সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বহু কষ্টে তার নিগূঢ় তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে এবং দুনিয়ার মানবীয় অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা যত বেশী করে প্রসার লাভ করছে, ততোই তার নিগূঢ় তাৎপর্য মানুষের কাছে সুস্পষ্টতর হয়ে উঠছে। তেরশ' বছরের অধিক কাল

www.pathagar.com

অতীত হয়ে গেছে; কিন্তু আজো তাঁর রচিত বিধানের মধ্যে কোন সংশোধনের অবকাশ অনুভূত হচ্ছে না। দুনিয়ার মানব-রচিত বিধান ইতিমধ্যে হাজার হাজার বার রচিত হয়েছে ও বাতিল হয়ে গেছে; প্রত্যেক পরীক্ষায় এসব বিধান ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বার তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছে। কিন্তু এ নিরক্ষর মরুবাসী অপর কোন মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে যে বিধান মানুষের সামনে পেশ করে গেছেন, তার একটি ধারাও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি।

নবুয়াতের ২৩ বছরের মধ্যে তিনি নিজস্ব চরিত্র মাধুর্য, সততা, মহত্ত্ব ও উচ্চাংগের শিক্ষার প্রভাবে দুশমনদেরকে বানিয়েছিলেন দোস্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিদেরকে পরিণত করেছিলেন সহযোগিতে। বড় বড় শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে। বিজয়ী হয়েও তিনি কোন দুশমনের উপর তার দুশমনির বদলা নেননি, কারুর প্রতি তিনি কঠোর আচরণ করেনি। যে ব্যক্তি তাঁর আপন চাচাকে হত্যা করে তার কলিজা বের করে চিবিয়েছিল, তার উপর বিজয়ী হয়েও তিনি তাকে মা'ফ করেছিলেন, যারা তাঁকে পাথর মেরেছিল, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল, তাদেকে হাতে পেয়েও তিনি মার্জনা করেছিলেন। তিনি কারো সাথে প্রতারণা করেননি, কখনো কোন প্রতিশ্রুতি ভংগ করেননি। লড়াইয়ের মধ্যেও তিনি কোন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেননি; তাঁর কঠিনতম দুশমনও কোনদিন তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ ও যুলুমের অপবাদ আনতে পারেনি। তাঁর এ অতুলনীয় সততার প্রভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত সারা আরবের অন্তর জয় করেছিলেন। উপরের বর্ণনায় যে আরবদের অবস্থার পরিচয় পাওয়া গেলো, নিজস্ব শিক্ষা ও হেদায়াতের প্রভাবে তিনি সেই আরবদেরকে বর্বরতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুসভ্য জাতিতে পরিণত করলেন। যে আরব কোন আইনের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী ছিল না, তাদেরকে তিনি এমন আইনানুগ করে তুললেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এমন আইনানুসারী কওম আর দেখা যেত না। যে আরবদের মধ্যে অপরের আনুগত্য প্রবণতা মোটেই ছিল না, তাদেরকে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অনুগত করে দিলেন। যে মানুষের গায়ে কোন দিন নীতিবোধের হাওয়া পর্যন্ত লাগেনি তাদেরকেও তিনি এমন নৈতিক-চরিত্রসম্পন্ন করে তুললেন যে, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে আজ দুনিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যায়। তখনকার দিনে যে আরবরা দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে হীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল, এ একটি মাত্র মানুষের প্রভাবে তেইশ বছরের মধ্যে তারা এমন প্রবল শক্তিমান হয়ে উঠলো যে, তারা ইরান, রোম ও মিশরের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদের সিংহাসন উলটিয়ে দিলো; দুনিয়াকে তারা দিলো তাহযিব-তামাদ্দুন, নৈতিক জীবন ও মানবতার শিক্ষা; ইসলামের এক শিক্ষা ও এক শরীয়াত নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়লো এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সুন্দরতম এলাকা পর্যন্ত।

এতো গেলো আরব কওমের উপর ইসলামের প্রভাব। এর চেয়ে বেশী বিস্ময়করভাবে

www.pathagar.com

নিরক্ষর আরব-নবীর প্রভাব পড়েছিল তামাম দুনিয়ার উপর তিনি সারা দুনিয়ার উপর সারা দুনিয়ার প্রচলিত চিন্তাধারা, আচরণ-পদ্ধতি ও আইন-কানুনের মধ্যে আনলেন এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। যারা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল, তাদের কথা ছেড়ে দিলেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা তাঁর বিরোধিতা করেছে তাঁর সাথে দুশমনী করেছে, তারাও তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি। দুনিয়া তাওহীদের শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল, তিনি মানুষকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন সেই শিক্ষা এবং এমন জোরের সাথে সত্যের ভেরী বাজালেন যে, আজ বুতপরস্ত ও মুশরিকদের ধর্ম পর্যন্ত তাওহীদের স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি এমন বলিষ্ঠ নৈতিক শিক্ষা মানুষকে দিয়ে গেছেন যে, তাঁর বিধিবদ্ধ নীতি আজ তামাম দুনিয়ার প্রচলিত নৈতিক শিক্ষায় প্রসার লাভ করেছে ও করছে। আইন, রাজনীতি, সভ্যতা ও সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে নীতি তিনি নির্ধারণ করে গেছেন, তা এমন সত্যাশ্রিত ও সর্বকালে প্রযোজ্য যে, তাঁর বিরোধী সমালোচকরা পর্যন্ত নীরবে তা থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে।

আগেই বলেছি, এ অসাধারণ মানুষটি জন্ম নিয়েছিলেন এক জাহেল কওমের মধ্যে এক ঘনঘোর তমসাচ্ছন্ন দেশে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পশুচারণ ও সওদাগরী ছাড়া আর কোন বৃত্তি তিনি অবলম্বন করেননি। কোন রকম শিক্ষা-দীক্ষা তিনি লাভ করেননি। ভেবে দেখবার বিষয়, চল্লিশ বছর বয়সের পর তাঁর মধ্যে আকস্মিকভাবে এতটা পূর্ণতা এলো কোত্থেকে? কোত্থেকে তাঁর মধ্যে এলো অপূর্ব জ্ঞানসম্ভার? কোত্থেকে তিনি পেলেন এ বিপুল শক্তি? একটিমাত্র মানুষ–কখনো তিনি এক অসাধারণ সিপাহসালার, কখনো এক অতুলনীয় জ্ঞানসম্পন্ন বিচারপতি, কখনো মহাশক্তিধর বিধানকর্তা, কখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক, কখনো নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অতুলনীয় সংস্কারক, আবার কখনো বিস্ময়কর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন নেতা! জীবনের বহুমুখী কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও রাত্রিকালে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন আল্লাহর ইবাদাতে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক আদায় করেন, গরীব ও বিপন্ন মানুষের খেদমত করেন। এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করেও ফকীরের মতো জীবন যাপন করেন; মাদুরের উপর শয়ন করেন, মোটা কাপড় পরিধান করেন, গরীবের মতো খাদ্য গ্রহণ করেন, এমন কি কখনে অনশনে অর্ধানশনে কেটে যায় তার দিন।

এমনি বিস্ময়কর অতি-মানবীয় পূর্ণতার পরিচয় দিয়ে তিনি যদি দাবী করতেন যে, তিনি অতি মানবীয় অস্তিত্বের অধিকারী, তাহলে কেউ তাঁর সে দাবী অগ্রাহ্য করতে পারত না, কিন্তু তার বদলে তিনি কি বলেছেন? তাঁর সে পূর্ণতাকে তিনি নিজস্ব কৃতিত্ব বলে দাবী করেননি, বরং তিনি হামেশা বলতেন :

আমার কাছে আপনার বলতে কিছুই নেই; এর সব কিছুর মালিক আল্লাহ এবং আল্লাহর তরফ থেকেই এসব আমি পেয়েছি, যে বাণী আমি পেশ করছি এবং যার অনুরূপ বাণী

www.pathagar.com

পেশ করতে সকল মানুষ ব্যর্থ হয়েছে, তা আমার নিজস্ব বাণী নয়, তা আমার মস্তিষ্ক প্রসূত রচনা নয়। এ হচ্ছে আল্লাহর কালাম এবং এর সবটুকু প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আমার যা কিছু কার্যকলাপ, তাও আমার নিজস্ব যোগ্যতা দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, কেবলমাত্র আল্লাহরই নির্দেশে তা সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহর কাছ থেকে যে ইংগিত আমি পাই অনুরূপভাবেই আমি কাজ করি এবং কথা বলি।

এমনি সত্যনিষ্ঠ মানুষকে আল্লাহর পয়গাম্বর না মেনে পারা যায় কি করে? তিনি এমন পূর্ণতার অধিকারী যে, তামাম দুনিয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর মতো একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর সত্যনিষ্ঠা এমন অসাধারণ যে, সেই পূর্ণতার গর্ব তাঁর ভিতরে মোটেই নেই। সেই পূর্ণতার জন্য তিনি কোন প্রশংসা অর্জন করতে চান না। সকল প্রশংসা সুস্পষ্টভাবে তাঁরই প্রতি আরোপ করেন, যিনি তাঁকে সবকিছু দান করেছেন। কি করে তাঁকে সত্য বলে স্বীকার না করে পারা যায়? তিনি নিজে যখন তাঁর সবটুকু শ্রেষ্ঠত্বকে আল্লাহর বলে স্বীকার করেন, তখন আমরা কেন বলব : না, এর সবকিছু তোমার আপন মস্তিষ্কের সৃষ্টি? মিথ্যাচারী কিন্তু এ মানুষটি যেসব কৃতিত্বকে সহজেই আপনার বলে দাবী করতে পারতেন যেসব কৃতিত্ব অর্জন করার কারণ কারো জানা ছিল না এবং যা প্রদর্শন করে তিনি অতিমানবীয় মর্যাদা দাবী করলেও কেউ তা অগ্রহ্য করত না, সেসব কৃতিত্বকেও তিনি তার আপনার দিক টেনে নেবার চেষ্টা করেননি। তাহলে তাঁর চেয়ে অধিকতর সত্যাশ্রয়ী মানুষ আর কে হতে পারে?

এ মানুষটি–এ অসাধারণ কৃতিত্বসম্পন্ন মানুষটি ছিলেন আমাদের নেতা, তামাম জাহানের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা [সা]। তাঁর নিজস্ব সত্যনিষ্ঠাই হচ্ছে তাঁর পয়গাম্বরীর আকাট্য প্রমাণ। তাঁর গৌরবময় কার্যকলাপ তাঁর স্বভাব-চরিত্র, তাঁর পবিত্র জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সবকিছুই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি স্বচ্ছ অন্তঃকরণে সত্যানুসন্ধিৎসা ও ন্যায়ের মনোভাব সহকারে তাঁর সে বিবরণ পাঠ করবে, তাঁর অন্তর স্বতঃই সাক্ষ্য দান করবে যে, তিনি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর পয়গাম্বর। যে বাণী তিনি পেশ করেছিলেন, তা-ই হচ্ছে কুরআন, তা-ই আমরা পাঠ করে থাকি। যে ব্যক্তি এ অতুলনীয় কিতাব হৃদয়ংগম করে মুক্ত অন্তরে পাঠ করবে, তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ নিশ্চিতরূপে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ এবং কোন মানুষের মধ্যে নেই এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষমতা।

খতমে নবুয়াত : একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ যুগে ইসলামের সত্য সহজ ও সঠিক পথের নির্দেশ জানার জন্য হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা [সা]-এর শিক্ষা ও কুরআন মজীদ ছাড়া আর কোন মাধ্যম নেই। মুহাম্মাদ [সা] সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর পয়গাম্বর। তাঁর মধ্যেই পয়গাম্বরীর ধারা শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে মানুষকে হেদায়াত করতে চান, তার সবকিছু নির্দেশ তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর আখেরী পয়গাম্বরের মাধ্যমে। এখন যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী ও আল্লাহর মুসলিম বান্দাহ হতে

www.pathagar.com

ইচ্ছুক, তার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর আখেরী পয়গাম্বরের উপর ঈমান আনা, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা মেনে নেয়া এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলা।

খতমে নবুয়াতের প্রমাণ : পয়গাম্বরীর তাৎপর্য আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই কথাগুলো বুঝে নিলে এবং তা নিয়ে চিন্তা করলে সহজেই জানা যাবে যে, পয়গাম্বর রোজ রোজ পয়দা হয় না, প্রত্যেক কওমের মধ্যে সব সময় পয়গাম্বরের আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজনও নেই। পয়গাম্বরের জীবনই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াতের জীবন। যতক্ষণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত জীবন্ত থাকে ততক্ষণ তিনি জীবিত থাকেন। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের মৃত্যু ঘটেছে, কারণ যে শিক্ষা তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন দুনিয়ার মানুষ তা বিকৃত করে ফেলেছে। যেসব গ্রন্থ তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তা কোনটিই আজ অবিকৃত অবস্থায় নেই। তাঁদের অনুগামীরাই আজ দাবী করতে পারছে না যে, তাদের পয়গাম্বরের দেয়া আসল কিতাব তাদের কাছে মওজুদ রয়েছে, তারাই ভুলিয়ে দিয়েছে তাদের পয়গাম্বরের দেখানো পথ। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের মধ্যে একজনেরও নির্ভুল-নির্ভরযোগ্য বিবরণ আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রত্যয় সহকারে আজ বলা যায় না, কোন্ জামানায় তিনি পয়দা হয়েছিলেন? কি কাজ তিনি করে গেছেন? কিভাবে তিনি জীবন যাপন করেছিলেন? কি কি কাজের শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন এবং কি কি কাজ থেকে মানুষকে বিরত করতে চেয়েছিলেন? এমনি করেই হয়েছে তাঁদের সত্যিকার মৃত্যু।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ [সা] আজো রয়েছেন জীবিত, কারণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যে কুরআন তিনি দিয়ে গেছেন, তা আজো তার মূল শব্দ-সম্ভারসহ অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে। তার একটি হরফ, একটি নোকতা, একটি যের-যবরের পার্থক্যও হয়নি কোথাও। তাঁর জীবন-কাহিনী, তাঁর উক্তিসমূহ ও কার্যকলাপ সবকিছুই সুরক্ষিত হয়ে আছে। তেরশ' বছরের ব্যবধানে আজো ইতিহাসে তাঁর বর্ণনা এমন সুস্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই, যেন তাঁকে আমরা দেখেছি প্রত্যক্ষভাবে। হযরত [সা]-এর জীবন-কাহিনী যেমন সুরক্ষিত হয়ে রয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোন ব্যক্তির জীবন-কাহিনী তেমন অবিকৃতভাবে সুরক্ষিত হয়নি। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতি মুহূর্তে হযরত [সা]-এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাতেই প্রমাণিত হয় যে হযরত [সা]-এর পরে আর কোন পয়গাম্বরের প্রয়োজন নেই।

এক পয়গাম্বরের পর অপর কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাবের কেবল মাত্র তিনটি কারণ থাকতে পারে :

এক : যখন পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শিক্ষা হেদায়াত নিশ্চিত হয়ে যায় এবং পুনরায় তা পেশ করার প্রয়োজন হয়।

দুই : যখন পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং তাতে সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

তিন : পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শিক্ষা যখন কোন বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং অপর জাতি বা জাতিসমূহের জন্য অপর কোন পয়গাম্বরের প্রয়োজন হয়।[২]

উপরিউক্ত তিনটি কারণের কোনটিই বর্তমানে প্রযুক্ত হতে পারে না, কারণ:

এক : হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো জীবন্ত রয়েছে এবং সেসব মাধ্যম এখন পুরাপুরি সংরক্ষিত রয়েছে, যা থেকে প্রতি মুহূর্তে জানা যায়, হযরতের দ্বীন কি ছিল, কোন্ জীবন পদ্ধতির তিনি প্রচলন করেছিলেন এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতি মিটিয়ে দেবার ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো মিটে যায়নি, তখন আবার তা নতুন করে পেশ করার জন্য কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই।

দুই : হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর মাধ্যমে দুনিয়াকে ইসলামের পূর্ণাংগ শিক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন তার মধ্যে যেমন কিছু কম-বেশী করা প্রয়োজন নেই, তেমনি তার মধ্যে এমন কোন ঘাটতি নেই, যা পূরণ করার জন্য আর কোন নবী আসার প্রয়োজন হবে। সুতরাং দ্বিতীয় কারণটির কোন অস্তিত্ব নেই।

তিন : হযরত মুহাম্মাদ [সা] কোন বিশেষ কওমের জন্য প্রেরিত না হয়ে তামাম দুনিয়ার জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর শিক্ষা যথেষ্ট। সুতরাং এখন কোন বিশেষ কওমের জন্য স্বতন্ত্র নবী আসার প্রয়োজন নেই। তাই তৃতীয় কারণটিও এ ক্ষেত্রে অচল।

এসব কারণে হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে বলা হয়েছে 'খাতেমুন্নাবীয়্যিন' অর্থাৎ যাঁর ভিতরে নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন আর দুনিয়ায় নতুন কোন নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন কেবল এমন মানুষের –যারা হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর পথে নিজেরা চলবেন ও অপরকে চালাবেন; যাঁরা তাঁর শিক্ষাধারাকে উপলব্ধি করবেন, তদনুযায়ী আমল করবেন এবং দুনিয়ায় যে আইন ও বিধান নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ [সা] তশরিফ এনেছিলেন, সেই আইন ও বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন। ■

উৎস : ইসলাম পরিচিতি

টীকা : ১. হযরত ইবরাহীম [আ] ও হযরত ইসমাঈল [আ]-এর জামানা হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর আড়াই হাজার বছর আগে অতীত হয়ে গিয়েছিল। তারপর এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরবে আর কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয়নি।

২. চতুর্থ একটি কারণ হতে পারে এই যে, কোন পয়গাম্বরের জীবদ্দশায় তাঁর সাহায্যের জন্য অপর কোন পয়গাম্বর প্রেরণ করা হয়; কিন্তু উপরে আমি তার উল্লেখ করিনি, কারণ কুরআন মজীদে এ ধরনের মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে এবং দু'টি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সাহায্যকারী পয়গাম্বর নাযিল করার কোন সাধারণ নিয়ম আল্লাহর কাছে রয়েছে।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] এবং বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিত

মার্টিন লিঙস্

অনুবাদ : জিয়াউল আহসান

'আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রভু।' শুধুমাত্র এই কথা বলার জন্যই অন্যায়ভাবে তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল। তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের ভুল ছিলো, তাই তাদেরকেই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল; এবং একমাত্র আল্লাহ্'ই তাদের বিজয় এনে দিতে পারতেন। মদীনায় পৌঁছানোর প্রায় সাথে সাথেই রাসূল [স] এই সংবাদ পেয়ে যান। তিনি ভালোভাবেই জানতেন, এই অনুমতির অর্থ আদেশ এবং আদেশে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সময়ের দাবী এমনই ছিলো, হঠাৎ আক্রমণ করা ভিন্ন অন্য কোনো প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশই ছিলো না। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাগুলো ছিলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অনেকটাই অরক্ষিত; বিশেষ করে বসন্ত এবং গ্রীষ্মের শুরুর মাসগুলোতে সিরিয়ার সাথে জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হতো এই সুযোগে মদীনা হতে আক্রমণ পরিচালনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। হেমন্ত এবং শীতের মধ্যে তাঁরা তাঁদের অধিকাংশ কাফেলা দক্ষিণে বিশেষ করে ইয়েমেন এবং আবিসিনিয়ায় [ইথিওপিয়া] পাঠিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

কখনো মদীনা থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে রাসূল [সা] তাঁর অনুপস্থিত-কালীন সময়ের জন্য নিজেই সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে একজনকে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে যেতেন এবং সর্বপ্রথম এই সম্মানের অধিকারী হন খাজরাযিত প্রধান সা'দ ইব্ন্ উবায়দা। হিজরতের এগারো মাস পর্যন্ত রাসূল [সা] নিজে কোনো যুদ্ধযাত্রায় অংশ নেননি।

যদিও তখনো পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ হয়নি এবং কুরাইশরা ইয়াসরিবের পথে সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক ছিলো। কিন্তু সম্ভবত তাদের মনে হয়েছিল, এইসব ঝুট-ঝামেলা দক্ষিণের সাথে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। কিন্তু অতিশীঘ্রই তাদের মোহমুক্তি ঘটেছিল। রাসূল [সা]-এর কাছে খবর এলো কাফেলাটি ইয়েমেন থেকে যাত্রা করে মক্কার পথে রয়েছে। রাসূল [সা] অনতিবিলম্বে তাঁর চাচাতো ভাই আব্দ্ আল্লাহ্ ইব্ন্ জাহ্স্'কে মক্কা হতে আগত আটজন সাহাবীসহ তায়েফ এবং মক্কা'র মধ্যবর্তী নাখলাহ্'র কাছে গোপনে অপেক্ষা করতে পাঠালেন। তখন রজব মাস, বছরের চারটি পবিত্র মাসগুলোর একটি। মহানবী আব্দ্ আল্লাহ্'কে কাফেলা আক্রমণের কোনো নির্দেশ দেননি, তিনি শুধুমাত্র কাফেলা সম্বন্ধে তাঁর কাছে যথাযথ খবর নিয়ে আসতে বলেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অবহিত হতে চেয়েছিলেন দক্ষিণের কাফেলাগুলোর প্রহরা ব্যবস্থা কতোখানি শক্তিশালী। ভবিষ্যতে এইসব কাফেলার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন তৎপরতা চালাতে এর প্রয়োজন ছিলো।

গন্তব্যে পৌঁছে তারা মূল পথের কাছাকাছি সুবিধাজনক স্থানে তাবু ফেললো। কুরাইশদের একটি ছোট কাফেলা তাদের অতিক্রম করে গেলো, কিন্তু কিছুটা দূর গিয়ে থামলো, তারাও তাদের কাছাকাছি শিবির স্থাপন করলো। তখনো পর্যন্ত কুরাইশদের দল তাদের উপস্থিতি টের পায়নি। তাদের উটগুলো কিশমিশ, চামড়া এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বহন করছিল। আব্দ্ আল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা উভয় সংকটে পড়লো, রাসূলুল্লাহ্ তাদের শুধুমাত্র খবর সংগ্রহ করে তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধ করতে নিষেধ করেননি কিংবা পবিত্র মাসের কথাও বলে দেননি। তখনো পর্যন্ত প্রাক-ইসলামিক রীতিনীতিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে মেনে চলা হতো। তারা সেই বাণী স্মরণ করলো: যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে.. .. .. অবিচার করে যাদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেহেতু তারা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং এই ছোট কাফেলায় মাখযুম গোত্রের অন্তত দু'জন বণিককে তারা চিনতে পেরেছিল। মক্কা'র গোত্রগুলোর মধ্যে তারাই ছিলো ইসলামের প্রতি সবচেয়ে বেশী শত্রুভাবাপন্ন। তখন সকাল এবং ঐদিনই রজব মাসের শেষ দিন। সূর্যাস্তের পরেরদিন শা'বান মাস, যা রজব মাসের মতো পবিত্র নয়। কিন্তু এরই মধ্যে ক্যালেণ্ডার বা দিনপঞ্জী তাদের সুরক্ষা দিতে না পারলেও তারা অনেকখানি পথ এগিয়ে যাবে অর্থাৎ দূরত্বই তখন তাদের রক্ষা করবে, এবং পবিত্র ভূমির সীমানায় পৌঁছে যাবে; আরো অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর তারা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের প্রথম তীর আবু শামস্ গোত্রের মিত্র হিসাবে পরিচিত কিন্দাহ্ গোত্রের একজনকে হত্যা করে।

www.pathagar.com

আক্রমণের আকস্মিকতায় মাখজুম গোত্রের উথমান এবং হাকাম নামে মুক্তিপ্রাপ্ত একজন ক্রীতদাস আত্মসমর্পণ করে; যদিও উথমানের ভাই নৌফেল পালিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে সমর্থ হয়।

আব্দ্ আল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের [কুরাইশ] বন্দী করে উটসহ মালামাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে। তিনি লুট করা মালের এক-পঞ্চমাংশ রাসূল [সা]-এর জন্য রেখে বাকিটা সঙ্গী-সাথী এবং নিজেরা ভাগ করে নিলেন। কিন্তু মহানবী কিছু নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন : “এই পবিত্র মাসে আমি তোমাকে যুদ্ধ করতে পাঠাইনি”, যারা এই নিয়ম ভাঙে তারা অভিশপ্ত হয়। রজব মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করায় মদীনায় তাদের ভ্রাতৃবর্গরা নিন্দামুখর হলো। অন্যদিকে ইহুদীরা বলে বেড়াতে লাগলো মহানবীর জন্য এটা একটি খারাপ পূর্বলক্ষণ। এবং কুরাইশরা দূরদূরান্তে এই খবর ছড়িয়ে দিয়ে বললো, মুহাম্মদ রজব মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে, তাই তিনি এই পবিত্রতা লঙ্ঘনের দায়ে দোষী। তখন আল্লাহ্'র তরফ থেকে এই বাণী নাযিল হলো : যারা তোমাকে পবিত্র মাস এবং যুদ্ধ করা নিয়ে প্রশ্ন করে, তাদেরকে বলো : পবিত্রতা লঙ্ঘন করা অপরাধ; কিন্তু যারা আল্লাহ্'র পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে, তাঁর পবিত্র মসজিদকে অসম্মান করে এবং তাঁর অনুসারীদের বিপথগামী করতে অত্যাচার করে, তা হত্যা করার চেয়েও বড়ো পাপ।

মহানবী তখন এর ব্যাখ্যা দিয়ে, পবিত্র মাসে যুদ্ধযাত্রাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করলেন; কিন্তু তিনি আরো বললেন, এই বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী নিষেধাজ্ঞা একটি ব্যতিক্রম বৈ, লঙ্ঘন নয়। এভাবে তিনি আব্দ্ আল্লাহ্ ও তার সঙ্গীদের কাঁধে অপরাধবোধের যে জোয়াল চেপে বসেছিল, তা থেকে তাদের মুক্ত করলেন এবং লুট করা মালের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করে সমাজ ও সম্প্রদায়ের সাধারণ কল্যাণার্থে বিলিয়ে দিলেন। দু'জন বন্দীর জন্য মাখযুম গোত্র থেকে মুক্তিপণ পাঠানো হলো; কিন্তু তাদের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হাকাম ফিরে যেতে শুধু অস্বীকারই করলো না বরং ইসলাম কবুল করে নিয়ে মদীনায় থেকে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলো। ফলে উসমানকে একাই ফিরে যেতে হলো।

সা'বান মাসের একই দিনে [আরবী মাস চন্দ্র পঞ্জিকা অনুসরণ করে] ধর্মানুষ্ঠানের মহান গুরুত্ববাহী একটি স্বর্গীয় বাণী নাযিল হলো। বাণীর শুরুতেই মহানবীকে সঠিকভাবে প্রার্থনা করার নির্দেশিকায় কঠোরভাবে দিক নির্দেশের কথা [যেদিকে মুখ করে দাড়াতে হবে] বলা হলো। মসজিদের ভেতর মেহ্‌রাবকে সামনে রেখে জেরুজালেমের দেয়ালের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে হবে; কিন্তু শহরের বাইরে থাকাকালীন দিনের বেলায় সূর্যের গতিপথ এবং রাতের বেলায় তারার অবস্থান নির্ণয় করে দিক ঠিক করতে হবে।

একটি মেহ্‌রাব তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করা হয়েছিল মসজিদটির দক্ষিণ দেয়ালে মক্কা'র দিকে মুখ করে। রাসূল [সা] ও তাঁর সঙ্গীরা এই পরিবর্তন আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। সেইদিন থেকে মুসলমানরা কা'বা'র দিকে মুখ করে সালাত আদায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

সিরিয়ায় সবক'টি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আবু সুফিয়ান ও তার অনুসারীরা তখন ফেরার পথে। মহানবী এই সংবাদ দ্রুত পাওয়ার জন্যে তাল্‌হা এবং সা'ঈদ'কে মদীনার পশ্চিম সমুদ্র উপকূল হাওরায় পাঠালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একজন ইহুদীর মাধ্যমে আবু সুফিয়ান খবর পেয়ে দিন-রাত দ্রুত ছুটে মক্কার দিকে এগোতে লাগলেন এবং কুরাইশদের কাছে সৈন্য চেয়ে খবর পাঠালেন। তখন রাসূল [সা]-এর অতিপ্রিয় কন্যা রুকাইয়া গুরুতর অসুস্থ। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত কারণকে বিবেচনায় না এনে দেরির কারণে পরিস্থিতি বিপজ্জনক দিকে মোড় নিতে শুরু করায় সাহাবী এবং সাহায্যকারীদের সমন্বয়ে যাত্রা শুরু করলেন। প্রথম যাত্রা বিরতি হলো এক মরুদ্যানে। প্রতিটি উটের পিঠে তিন-চারজন করে সত্তরটি উটের পিঠে যোদ্ধারা পালাক্রমে চড়ে যাচ্ছিল।

কুরাইশরা মক্কায় পৌঁছানোর কিছু আগে রাসূল [সা]-এর চাচী আতিকাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর ভাই আব্বাস'কে জানালে এই স্বপ্ন সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আবু জাহ্‌ল তখন রাগে-ক্ষোভে চিৎকার করে মহানবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে লাগলেন। আবু জাহ্‌ল পরদিন এসে বললো, ওটা ছিলো দম্‌দমের কণ্ঠস্বর। মিথ্যা কথা এবং অভিনয়ের জন্যে আবু সুফিয়ান তাকে প্রচুর অর্থ দিলো। আরো অর্থ লোভের আশায় তার জিন [অশ্ব বা উটের পিঠে বসার আসন] ঘুরিয়ে উটের মাথার দিকে পেছন ফিরে বসে দৈব-দুর্বিপাকের নিশানা বোঝাতে রক্ত বের করার জন্য তার উটের নাক চিরে ফেললো। তারপর নিজের জামা ফালি ফালি করে ছিঁড়ে ফিতা বানিয়ে চিৎকার করে বললো, "কুরাইশরা শোনো, আবু সুফিয়ানের কাফেলায় তোমাদের যেসব মালামাল আছে সেইসব উটগুলোকে আক্রমণ করতে মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গীরা আসছে। তোমরা সাহায্য করো!" শহরে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়লে ধনী ব্যক্তিরা সম্পত্তি ক্ষতির আশংকায় অল্প সময়ের ভেতরে প্রায় এক হাজার লোকের একটি সেনাদল তৈরি করে যুদ্ধযাত্রা শুরু করলো। কিন্তু বনী হাশিম এবং বনী আল-মুত্তালিব গোত্র এতে অংশ নিলো না।

রাসূল [সা] তখন মদীনা থেকে দক্ষিণে যাওয়ার সোজা পথ ছেড়ে বদরের পথে। ইতিমধ্যে খবর এলো কাফেলা রক্ষা করতে কুরাইশদের একদল যোদ্ধা রওনা হয়ে গিয়েছে। এ সম্ভাবনা বরাবরই ছিলো; কিন্তু রাসূল [সা] তাঁর নিজের লোকদের সাথে পরামর্শ করতে চাইলেন। তখন মিক্‌দাদ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : "হে আল্লাহ্‌র দূত, আল্লাহ্ আপনাকে দিয়ে যা করাতে চান, আপনি তা-ই করুন। মূসা [সা] কে ইসরাইলের সন্তানরা যা বলেছিল, আপনাকে তা বলবো নাঃ তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং যুদ্ধ করো; আমরা এখানে বসে থাকবো, বরং আমরা বলবো : আপনি এবং আপনার সৃষ্টিকর্তা যুদ্ধ করতে অগ্রসর হোন। আমরাও আপনার ডানে এবং বামে, আপনার সামনে এবং পেছনে থেকে একই সাথে যুদ্ধ করবো। এরপর সাহায্যকারীদের পক্ষ থেকে সা'দ ইব্‌নে মু'আয উঠে দাঁড়ালেন, সে বললো, "হে আল্লাহ্‌র দূত, আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে এবং আপনি আমাদের যা বলেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি। সর্বশক্তিমানের তরফ থেকে আপনি আমাদের জন্য যা এনেছেন, তার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। আপনার নির্দেশ শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি

www.pathagar.com

যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করুন। আমরা আপনার সাথে আছি। সেই মহান প্রতিপালকের নামে [বলছি], আপনি যদি আদেশ করেন সাগরে যেতে কিংবা নিজেদের তাতে নিক্ষেপ করতে; আমরা তা-ই করবো। আমাদের একজনও পেছনে থাকবে না। আগামীকাল আমাদের শত্রুর মুকাবেলা করতেও আমরা বিরত থাকবো না। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতার সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটাবো। হয়তো আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের মাধ্যমে তাঁর শক্তি দেখাবেন। তাই আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন।" সবাই লড়াই করতে একমত হলেন, হয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে, নয় কাফেলার বিরুদ্ধে; কিন্তু একই সাথে উভয়ের সাথে নয়। "এগিয়ে চলো," তিনি বললেন, "তোমরা অত্যন্ত খুশী হবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের জয়ের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; আমাদের শত্রুরা পরাজিত হবে।"

যদিও তারা সবচেয়ে খারাপ কিছুর জন্যে প্রস্তুত ছিলো কিন্তু কুরাইশ সৈন্যরা পৌঁছানোর আগেই কাফেলা আক্রমন করে অনেক সম্পদ ও মালামাল এবং বেশকিছু বন্দীসহ তারা মদীনায় ফিরে আসছে, এমন একটি আশা তারা মনের ভেতর লালন করে যাচ্ছিলো। তারা যাত্রাবিরতির জন্য একদিনেরও কম সময়ে বদরে পৌঁছানোর দূরত্বে এসে এক বৃদ্ধের কাছ থেকে জানলেন, মক্কার সেনাদল কাছেই অবস্থান করছে। শিবিরে ফিরে তিনি যখন রাত নামার অপেক্ষায়, তখন আলী, যুবায়ের এবং সা'দ এই তিনজনকে কিছু সঙ্গীসহ বদরের ঝর্নার কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য শত্রুরা ঝর্না থেকে পানি সংগ্রহ করছে কিনা এবং তাদের সম্পর্কে কোনো সংবাদ পাওয়া যায় কিনা। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেলো দু'জন লোক কুরাইশ সেনাদের জন্য উটে পানি বোঝাই করছে। তারা তাদের বন্দী করে রাসূল [সা]-এর কাছে নিয়ে আসলো। তখন তিনি কেবল নামাজে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করেই তারা লোক দু'টিকে জেরা এবং পেটানো শুরু করলো। তারা নিজেদের সেনাদের পানি-বাহক হিসাবে পরিচয় দিলেও জেরাকারীদের পছন্দ হলো না। তাদের আশা বন্দীরা বলবে, আবু সুফিয়ান তাদেরকে কাফেলার জন্য পানি আনতে পাঠিয়েছে। বন্দীরা প্রহারের যাতনায় অবশেষে তাই বলতে বাধ্য হলো। রাসূল [সা] নামায শেষ করে সবাইকে শান্তির শুভেচ্ছা জানালেন। তিনি প্রহারকারীদের বললেন, যখন তারা সত্য বলেছিল, তখন তোমরা তাদের মারছিলে। কিন্তু যখন তারা মিথ্যা বললো, তোমরা তা বিশ্বাস করে প্রহার বন্ধ করলে। তারা প্রকৃতপক্ষে কুরাইশ সৈন্য। তারপর তিনি ঘুরে বন্দীদের বললেন, কুরাইশ সৈন্যদের সম্পর্কে যা জানো বলো। উপত্যকার পরবর্তী ঢাল 'আকানকালে'র প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে তারা বললো, "পাহাড়ের পেছনেই তাদের শিবির।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাদের সৈন্য সংখ্যা কতো?"

"অনেক," এরচেয়ে সঠিকভাবে তারা উত্তর দিতে পারলো না। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন কয়টি পশু তারা জবাই করেছে?

www.pathagar.com

"কোনোদিন নয়টি, কোনোদিন দশটি।"

রাসূল [সা] বললেন, "তার মানে তাদের সৈন্য সংখ্যা নয়'শ থেকে এক হাজার।" "কুরাইশদের কোন কোন নেতা তাদের মধ্যে আছে?"

তারা পনের জনের কথা বললো; এদের ভেতর রয়েছে আবু শামস্-এর ভাইয়েরা, নৌফেলের উতবা এবং শাইবা, আব্দ্ আদ্-দারের হারিত এবং তু'আইমাহ্, নদ্র, যে কোরআনের বিরুদ্ধে ফার্সি ভাষায় গাঁজাখুরি গল্প রচনা করেছিল। আসাদ গোত্রভুক্ত খাদিজা'র [রা] সৎভাই নৌফেল; মাখজুমের আবু জাহল; জুমাহ্ গোত্রের উমাইয়া এবং আমির গোত্রের সোহাইল। শত্রুদের নামগুলো শোনার পর তিনি যখন তার সঙ্গীদের সাথে বসলেন, তখন তাঁর মন্তব্য ছিলো, "মক্কা তার যকৃতের সবচেয়ে ভালো অংশ তোমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে।"

মক্কা হতে হাজার সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনী পৌঁছানোর আগেই আবু সুফিয়ান নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেলো। তখন সে বলে পাঠালো, "তোমরা তোমাদের উট মানুষজন এবং মালামাল রক্ষার জন্যেই এসেছিলে; ঈশ্বরই সেসব রক্ষা করেছেন, তাই তোমরা ফিরে আসো।" কিন্তু বার্তাটি পৌঁছানোর আগেই তারা বদরের সামান্য দক্ষিণে জুহ্ফা'তে শিবির স্থাপন করেছে। এরচেয়ে বেশী অগ্রসর না হওয়ার পেছনে যুক্তি হলো একটি স্বপ্নের কারণে সৃষ্ট হতাশা। স্বপ্নটা ছিলো প্রায় প্রত্যক্ষ দর্শনের মতো; মুত্তালিব গোত্রের জুহাইম আধোঘুমের ভেতর যা দেখেছিলো, "আমি দেখলাম ঘোড়ার পিঠে বসে একজন লোক উট চালিয়ে এসে এক জায়গায় থেমে বললো, 'উতবা ও শাইবা এবং আবু আল্-হাকিম ও উমাইয়া'কে হত্যা করো'।" তারপর কুরাইশ দলনেতাদের কাছে গিয়ে উষ্ট্র সওয়ার নিজের নাম বললো। তারপর সে তার উটের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলো এবং শিবিরের মধ্য দিয়ে দৌড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলো। শিবিরে কোনো তাবু ছিলো না, তাই তার রক্ত লেগে নোংরাও হয়নি।" কিন্তু এই স্বপ্ন আবু জাহ্লকে জানানো হলে, সে উল্লসিত হয়ে বিদ্রুপ করলো, "এখানে মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে একজন নবী আছে।" সে বললো, "এখনো একজন", কারণ মুত্তালিব এবং হাশিম দুই গোত্রকে এখনো এক মনে করা হয়। শিবির থেকে অবসাদ দূর করতে সে সবাইকে ডেকে বললো : "প্রভুর কসম, বদরের প্রান্তরে না পৌঁছে আমরা ফিরে যাবো না। তিনদিন আমরা সেখানে থাকবো। উট জবাই হবে, আমরা উৎসব করবো, মদের বন্যা বইয়ে দেয়া হবে এবং মেয়েরা আমাদের জন্যে নাচবে, গাইবে। আরবরা শুনবে কতোটা শক্তি নিয়ে আমরা বদরে এসেছি। তখন তারা ভয়ে ভক্তিতে চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

আখ্নাস্ ইব্নে শারিক্ যুহ্রাহ্'র সাথেই মিত্রচুক্তি হতে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি আবু জাহ্ল-এর কথায় কর্ণপাত না করে নিজের লোকজন নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন। তালিবের সাথে অন্যান্য কুরাইশদের তর্ক হওয়ায় তিনিও তার অনুসারীদের একটা অংশ নিয়ে ফিরে এলেন। কুরাইশরা তাকে বলেছিল : "হাশিমের পুত্র, আমরা জানি তুমি আমাদের সাথে থাকলেও তোমার মন পড়ে আছে মুহাম্মাদের কাছে।" তাই কুরাইশরা

www.pathagar.com

অবশিষ্ট সৈন্যদের সাথে বদরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো এবং তিনি তার তিন ভাগ্নে আবু সুফিয়ান ও নৌফেল এবং আবু তালিবের পুত্র আকিলকে সাথে নিলেন।

পাহাড়ের পেছনে কিছুটা উত্তর-পূর্বদিকে মুসলমানরা শত্রুদের পূর্বে বদরের পানির কাছে পৌঁছুতে শিবির গুটিয়ে ফেলে রাসূল [সা]-এর নির্দেশে তৎক্ষণাৎ রওনা দিলো। যাত্রা শুরু করার কিছু পরেই শুরু হলো বৃষ্টি। বৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আনুকূল্য এবং নিশ্চয়তার প্রতীক মনে করে তিনি উদ্দীপ্ত হলেন। যোদ্ধারা সাফ-সুতরো হয়ে পুনরায় সজীব হয়ে উঠলো এবং ইয়ালইয়াল উপত্যকার নরম বালি শক্ত হয়ে তাদের চলাচলের সুবিধা করে দিলো; কিন্তু বৃষ্টি শত্রুদের জন্য বাধা হয়ে দাড়ালো। তারা তখনো বদর হতে দূরে উপত্যকার বিপরীত পার্শ্বে মুসলমানদের বামদিকে আকানকালে'র ঢাল বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু ঝর্নাগুলোর ধারা বয়ে যাচ্ছিলো পাহাড়ের ঢালের সমান্তরালে। রাসূল [সা] প্রথম ঝর্নার কাছে থামার নির্দেশ দিলে খাজরাজ গোত্রের হুবাব ইব্‌নে আল-মুনধির এগিয়ে এসে বললো: "হে আল্লাহ্‌'র প্রেরিত দূত, যেস্থানে এখন আমরা আছি, আল্লাহ্‌'ই আপনার কাছে কী তা প্রকাশ করেছেন? আমরা এখান থেকে এগোবো না পেছাবো?" তিনি বললেন, এটা শুধুমাত্র একটি মতামত। হুবাব আবার বললেন, "হে আল্লাহ্‌'র দূত এটা থামার জায়গা না, শত্রুদের কাছাকাছি বড়ো ঝর্নাগুলোর একটির নিকট না পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের সামনে নিয়ে চলুন। সেখানে পৌছার পর, ঝর্নাধারাগুলো বাধ দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে পানির প্রয়োজনে চৌবাচ্চা বানানো হবে। তারপর আমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবো। পান করার সমস্ত পানি আমাদের দখলে থাকায় শত্রুরা কিছুই পাবে না।" রাসূল [সা] তৎক্ষণাৎ তার কথা মেনে নিয়ে হুবাব-এর পরিকল্পনা অনুপুঙ্খভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিলেন।

তখন সা'দ ইব্‌নে মু'আয রাসূল [সা]-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহ্‌'র নবী, আমাদেরকে আপনার জন্য একটি ছাউনি তৈরি করতে দিন এবং আপনার উটগুলোকে তার পাশে সদাপ্রস্তুত রাখুন। তারপর আমরা শত্রুর মোকাবেলা করবো এবং আল্লাহ্‌ যদি আমাদের শক্তিশালী করেন, তবে আমাদের চাওয়ানুযায়ী জয়ী হয়ে এবং আমরা পেছনে যাদের রেখে এসেছি উটে করে তাদের কাছে যেতে পারবেন। যারা আমাদের সাথে আসে নাই, হে আল্লাহ্‌'র নবী, যদি তারা জানতে পারে আপনি যুদ্ধ করেছেন, আপনার জন্যে তাদের ভালোবাসা আমাদের চেয়ে কোনো অংশেই কম হবে না। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ আপনাকে রক্ষা করবেন। তারা ভালো পরামর্শ দেবে এবং আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবে।" রাসূল [সা] তার প্রশংসা করলেন এবং তার জন্যে আল্লাহ্‌'র দয়া কামনা করলেন। তালপাতা দিয়ে ছাউনি বানানো হলো।

সে রাতে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বিশ্বাসীদের শান্তিপূর্ণ ঘুম উপহার দিলেন এবং ভোরে ঘুম ভাঙার পর তারা নিজেদেরকে সতেজ অনুভব করলো। ঐদিন ছিলো শুক্রবার, ৬২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ মার্চ, হিজরী দ্বিতীয় সালের ১৭ রমযান। দিনের আলো ফুটতেই যতো শীঘ্র সম্ভব কুরাইশরা যাত্রা শুরু করলো এবং আকানকাল পাহাড়ে আরোহন করলো। যখন তারা পাহাড়ের চূড়ায়, তখন সূর্য মাথার ওপরে। রাসূল [সা] তাদের জাঁকজমকপূর্ণ ঘোড়া

www.pathagar.com

এবং উটের সারিকে ইয়ালইয়াল উপত্যকার ঢাল বেয়ে নেমে বদর প্রান্তরের দিকে যেতে দেখলেন। রাসূল [সা] আল্লাহ্'র দরবারে হাত তুললেন: "হে আল্লাহ্, কুরাইশরা এখানে পৌঁছে গেছে: তারা ঔদ্ধত্য এবং অহংকারে পূর্ণ হয়ে আপনার এবং আপনার রাসূলের বিরোধিতা করতে এসেছে; হে মালিক, যে ওয়াদা আপনি করেছিলেন, সেমত আমাদের ওপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন! হে প্রভু, এই প্রভাতে আপনি তাদের ধ্বংস করে দিন।"

তারা ঢালের পাদদেশে শিবির স্থাপন করেছিল। যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, মুসলমানদের সংখ্যা তাদের অনুমানের চেয়ে কম, তখন তারা জুমাহ্ গোত্রের উমাইরকে অশ্বারোহণ করিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা গণনা করার জন্য পাঠালো এবং সেই সাথে এটাও নিশ্চিত হতে বললো, পুনরায় শক্তি অর্জন করার জন্য দূরে তাদের কোনো সৈন্য মুতায়েন রয়েছে কিনা। উমাইর এসে জানালো, উপত্যকার বিপরীত দিক হতে এসে যোগ দেবে এমন আর কোনো সৈন্যদলের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। "কিন্ত হে কুরাইশগণ," তিনি আরো বললেন, "আমি মনে করি না তাদের [মুসলমানদের] কোনো লোক নিহত হবে, প্রথমে যে নিহত হবে সে তোমাদের লোক; কিন্তু যদি তোমাদের একজনও নিহত হয়, তা হবে তাদের [মুসলমানদের] সংখ্যার সমান। জীবনে এরচেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?" একজন ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে মক্কা জুড়ে উমাইরের কিছু খ্যাতি ছিলো। তাই তার কথাকে হালকা হিসাবে নেয়ার উপায় ছিলো না। তার কথা শেষ হতে না হতেই খাদিজা'র ভাগ্নে হাকিম শিবিরের ভেতর চলে গেলো; তারপর সে আবু শামস্-এর কাছে এলো। "ওয়ালিদের বাবা," সে উতবা'কে বললো, "আপনি কুরাইশদের ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাদের প্রভু। আপনাকে সবাই সম্মান করে। আপনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনেকের মধ্য হতে প্রশংসনীয়ভাবে তাদের স্মরণ করতে পারবেন?

"কীভাবে ?" উত্‌বা বললো।

"সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন," হাকিম বললো, "আপনার মিত্র আমর্-এর হত্যার বদলার দায়িত্ব আপনি নিজের কাঁধে নিন।" সে বোঝাতে চাইলো, যেসব প্রধান সমস্যাগুলোর জন্যে আজ এই যুদ্ধ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, উতবা'র পক্ষেই সম্ভব, এমন একটি প্রধান সমস্যাগুলোর একটির সমাধান করে যুদ্ধের প্রয়োজন বিনাশ করা। জ্ঞাতির রক্তের প্রতিশোধ বিষয়ে বলা যায়, নাখলাহ্'তে যাকে হত্যা করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তার ভাই আমির এসেছে, যুদ্ধের ময়দানে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। উত্‌বা তাকে জানালো' তার যুক্তির সাথে সে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তিনি আবু জাহ্‌লের কাছে গিয়ে তার সাথে এনিয়ে কথা বলতে অনুরোধ করলেন। কারণ সে-ই যুদ্ধের পক্ষে সবচেয়ে জোরদার সমর্থক। ইতিমধ্যে তিনি সৈন্যদের বলতে লাগলেন, "কুরাইশের মানুষ, মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের কোনো ফায়দা নাই। যদি তোমরা তাদের পরাভূতও করো, তবে তোমাদের প্রত্যেককে প্রতিপক্ষ

www.pathagar.com

এজন্যেই চিরদিন ঘৃণার চোখে দেখবে যে, তোমরাই তাদের চাচা কিংবা সম্পর্কিত ভাই ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর কারণ ছিলে। তাই, চলো ফিরে যাই এবং মুহাম্মাদের দায়িত্ব ছেড়ে দাও বাকি আরবদের ওপর। তোমরা যেমন চাইছো, আরবরা যদি তাকে হত্যা করতে চায়, করুক; কিংবা যদি না করে, তিনি জানবেন, তোমরা তাঁর প্রতি আত্ম-সংযম দেখিয়েছ।"

নিঃসন্দেহে তিনি তার সুপ্ত অভিপ্রায় আমির আল্-হাদরামির কাছে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যাতে, সে তাৎক্ষণিকভাবে তার [আমির আল্-হাদরামি] ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের ব্যাপারে তার [উত্বা] স্বমতে [অসহিংস পথে] আসতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু আবু জাহ্ল দ্রুত এই কথোপকথনে হস্তক্ষেপ করলো। সে তীব্র কটাক্ষ করে উত্বাকে কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে বললো, উত্বাহ্ নিজে এবং শত্রুবাহিনীতে যোগ দিয়ে ভালো মর্যাদায় আসীন তার পুত্র আবু হুদাইফাহ্'র মৃত্যু ভয়ে ভীত। তারপর সে আমিরের দিকে ফিরে তাকে এই বলে প্ররোচিত করলো, তোমার ভাইয়ের হত্যার বদলা নেয়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করো না। "ওঠো," সে বললো, "তোমার অঙ্গীকারের কথা মনে রেখ; ভুলে যেও না তোমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল।" আমির অকস্মাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাড়ালো এবং উন্মত্তভাবে তার পরিধেয় জামা-কাপড় খুলে ফেলতে শুরু করলো, এরপর যতোটা সম্ভব উচ্চস্বরে বিলাপ করে কান্না শুরু করলো, "হায় আমর্! হায় আমর্!" সুতরাং যুদ্ধের আগুন উস্কে দেয়া হলো এবং লোকদের হৃদয়-অন্তকরণ সহিংস প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। তাই উত্বাহ্ কিংবা অন্যান্য যারা ফিরে যাওয়ার পক্ষে ছিলো, তাদের সব উদ্যোগ নিষ্ফল হলো.।

যে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো, সে এখন যুদ্ধ শুরুর প্রতীক্ষায়; এজন্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছিল। এমন আশংকাও ছিলো, তার অনুপস্থিতিতে সে হয়তো পালিয়ে যেতে পারে। সুহাইল সাথে করে তার পুত্র আব্দ্ আল্লাহ্'কে বদর পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। জুমাহ্ গোত্র প্রধান উমাইয়াহ্'ও একই কাজ করেছিল। সে তার পুত্র আলীকে জোর করে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। আব্দ্ আল্লাহ্, আলীর মতো দুর্বল চিত্তের ছিলো না। সে তার বিশ্বাসে ছিলো অটল। সে সুযোগ মতো শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছোট একটি পাহাড়ের পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিলো। ত্বরিৎ সে তার গন্তব্য ঠিক করে ফেলে এবং অসমতল বালুপথ পেরিয়ে মুসলমান শিবিরে গিয়ে পৌঁছালো; সরাসরি সে গিয়ে দেখা করলো রাসূল [সা]-এর সাথে। তখন তাঁদের উভয়ের মুখমণ্ডল ছিলো হাস্যজ্জ্বোল। তারপর সে তাঁর দুই শ্যালক, আবু সারাহ্ এবং আবু হুদাইফাহ্'কে সোৎসাহে অভিনন্দিত করলো। কুরাইশদের ভেতর অনেকের চেষ্টা সত্ত্বেও বদর যুদ্ধ পরিশেষে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। ইসলামের ইতিহাসে তাই বদর যুদ্ধের তাৎপর্য অনেক। ■

www.pathagar.com

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য-সংস্কৃতি

অধ্যাপক আবু জাফর

বিষয়টি আলোচনার জন্য দৃশ্যত সহজ মনে হলেও, আসলে সহজ নয়। কারণ একদিকে 'মানবতা' নামক এই বহুল ব্যবহৃত কথাটিকে সর্বজন গ্রাহ্যরূপে সংজ্ঞায়িত [Define] করা যেমন দুরূহ; অপরদিকে 'সাহিত্য-সংস্কৃতির' মত বহুবর্ণিল ও বহুভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য একটি সদা-পরিবর্তনশীল বিষয়ের সঙ্গে মানবতাকে মিলিয়ে দেখা আরো অধিক দুরূহ। তবু যেভাবেই দেখা হোক, যেহেতু আধুনিক-বিশ্বে মানবতা আজ নিদারুণভাবে ভূলুণ্ঠিত; এবং যেহেতু একই সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি আজ এই আধুনিক বিশ্বের একটি প্রবল ও আধিপত্যবিস্তারী অবিচ্ছেদ্য অংশ, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমিকা কি অথবা কোন ভূমিকা আছে কিনা, থাকলে তা কতখানি ও কি ধরনের, এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা বর্তমান সময়ের একটি অপরিহার্য দাবি।

আলোচনার সুবিধার্থে 'মানবতা' বলতে আমরা মোটামুটি কি বুঝি, সে বিষয়টি কথঞ্চিত হওয়া আবশ্যক। মানুষ জন্মগতভাবেই একদিকে যেমন প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী দ্বিপদ জন্তু বিশেষ; আবার অন্যদিকে একই সঙ্গে ঐশী-প্রেরণা দ্বারা সমৃদ্ধ অনেক গুণ, অনেক মূল্য ও মহিমাও তার অন্তর্জগৎকে আলোকিত করে রেখেছে।

www.pathagar.com

বলাইবাহুল্য, এই আলো এবং অটকার, প্রবৃত্তি তাড়িত জা--বতা এবং মহত্তম চৈতন্য, এই বিপরীতমুখী দিমাত্রিকতার মধ্যেই মানব জীবনের অস্তিত্ব ও আবর্তন। যারা পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে আল্লাহ পাকের বিধান অনুযায়ী বৈধ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী; যারা স্বভাবের কুৎসিত চাহিদাগুলোকে পরাভূত করে জীবনের ক্ষেত্রে মহত্তম গুণাবলীকে বিজয়ী করে তুলেছে, আল্লাহ পাকের ভাষায় তারাই হলো 'আহসানি তাকবীম' উৎকৃষ্টতম অবয়বে উৎকৃষ্টতম মানুষ। আর যারা ইতর প্রবৃত্তির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে, তারা 'আসফালা সাফিলীন' নিকৃষ্টতম অক্ষেপাও হীন ও নিকৃষ্ট। অতএব, মানবতা বা ইনসানিয়াত মানে মনুষ্যত্বের যথাযথ বিকাশ ও জাগরণ; মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে মানব চৈতন্যের উধ্বর্মুখী অভিযাত্রা, উধ্বর্মুখী অবস্থান। বাহ্যিকভাবে দৃশ্যত মানবতার এই রূপ ও স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি তাদের মধ্যে, যারা ঈর্ষা অসুয়া ও মানব বিশেষকে পরিহার করে সর্বমানবিক দায়িত্ববোধ, সকল কুশ্রীতা ও অশ্লীলতার স্থলে শাশ্বত সৌন্দর্য চেতনা, যেকোন ধরনের অখণ্ড ও স্বার্থপরতাকে বর্জন করে ইনসাফ ঋদ্ধ মানব কল্যাণকে জীবনের আদর্শ করে তোলে। বলাবাহুল্য, এই ধরনের মানুষ যে দেশে ও সমাজে সংখ্যায় অধিক হয়ে ওঠে এবং নেতৃত্বে সমাসীন হয়, সেই দেশ ও সমাজই মানবতা সমৃদ্ধ নিরাপদ সমাজ। অতএব দেশ ও সমাজ ও বিশ্বের শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রশ্নে মানবতার বিজয় একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। কারণ প্রবৃত্তির ক্রীতদাসরূপী অমানুষদের দ্বারা পরিচালিত পৃথিবী কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা ও ইনসাফের পৃথিবী হতে পারে না।

এখন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। আমরা যে মানবতার কথা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করেছি, সেই মানবতা প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-সংস্কৃতি কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে অথবা আদৌ পারে কিনা, সেটাই আমাদের বর্তমান নিবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সাহিত্য-সংস্কৃতি একান্ত নিজের মত করে গড়ে ওঠে না, উঠতেও পারে না; গড়ে কোন না কোন ধর্ম বা মতবাদ বা জীবন দর্শনের আশ্রয় ও অবলম্বনে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, ভারতীয় সংস্কৃতির যেরূপ, তার প্রধান ভিত্তি হলো অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতি পূজা এবং তৎসঙ্গে অবতারবাদ নির্ভর মানবপূজা। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সাহিত্য গড়ে উঠেছে মার্কসীয় দর্শনপুঞ্জ সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে এবং আমরা এই কথাও জানি, একদা এই বাংলাদেশে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তারও মূল অবলম্বন ছিল বৌদ্ধ ধর্মদর্শন এবং পরবর্তী সময়ে বৈভব পদাবলী বা বাউল গানের যে প্রসার ঘটে, সে সবও ছিল যথাক্রমে বৈভব ও বাউল ধর্মাশ্রিত। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগীয় বৈভব গীতিকবিতা রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক অনেকটা মানবিক বটে কিন্তু তার মধ্য দিয়ে মুখ্যত একটা ঐশ্বরিক আবেদন সৃষ্টির প্রেরণা ছিল এবং একইভাবে বহু প্রচলিত বাউল গান হল যৌনতাশ্রয়ী দেহবাদ নির্ভর একটা আধ্যাত্মিক উপধর্ম। দৃষ্টান্ত আরো বাড়ানো যায় কিন্তু তার একটা আবশ্যকতা নেই। আমরা শুধু এ প্রসঙ্গে এইটুকু বলতে চাই যে,

www.pathagar.com

যে কোন সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে কোন না কোন ধরনের ধর্ম ও জীবন ধর্ম, বিশ্বাস ও মতবাদ। এমনকি সাহিত্য বা সংস্কৃতি যখন একেবারেই বিমূর্ত [Abstract], তখনো সে জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে জড়িয়ে পড়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও নান্দনিকতার আচ্ছাদনে একপ্রকার কুহক ও বিভ্রান্তিকর মতবাদের সঙ্গে। অর্থাৎ সাহিত্য-সংস্কৃতি এমন হতেই পারে না, যেখানে কোন না কোন ধর্ম ও বিশ্বাসের নিস্বন শুনতে পাওয়া যায় না।

এমতাবস্থায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধনে কতটা-কী ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ও করে, সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে আল-কুরআন এবং রাসূল [সা]-এর জীবনাদর্শের নির্ভুল পথ নির্দেশ ছাড়া আমাদের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আল্লাহ পাক বলেন, 'ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম' তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন বা ধর্ম হলো ইসলাম [সূরা আলে ইমরান : ১৯]। অর্থাৎ ইসলামের বাইরে অন্য যে সকল ধর্ম, তার কোনটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এই সকল প্রত্যাখ্যাত ধর্ম ও মতবাদকে আশ্রয় করে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই তারও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর এই অগ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি বা সাহিত্য যে মানব কল্যাণের প্রশ্নে আদৌ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়, বরং মানবতার অপকর্ষ সাধনই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এটা অস্বীকার করার কোন হেতু নেই, কোন যুক্তিও নেই। এই কথায় অনেকে বিস্মিত হতে পারেন, উদার ধর্ম নিরপেবাদীরা কষ্ট পেতে পারেন, কিন্তু এটাই সত্য ও নির্ভুল বাস্তবতা। সন্দেহ নেই, সাহিত্য-সংস্কৃতির রমরমা প্রসার দেখে আমরাও বিভ্রান্ত হতে পারি, কিন্তু সত্য যে, হোমার কি শেকসপিয়ার হোক, প্রাক ইসলামী যুগের ইমরুল কয়েস হোক, গোর্কি টলস্টয় মায়াকাভস্কি হোক, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস কি রবীন্দ্রনাথ লালন ফকির যেই হোক, আল-কুরআনের দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত কে অবহেলা করে কোন মুমিনের পক্ষে এইসব কবি ও কবিতার সমর্থনে মানব কল্যাণের আশা জাগিয়ে তোলার চিন্তা ও চেষ্টা করা শুধু অসম্ভব নয়, ঘোরতরভাবে নিষিদ্ধও বটে।

আসলে সাহিত্য-সংস্কৃতির যে রূপ ও সর্বগ্রাসী ভূমিকা দেখে পৃথিবী খুবই মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কল্যাণের গণ্ডমাত্র নেই; বরং যা আছে তার সারাংশ হল মানবতার অপমান ও মিথ্যাচার ও মুনাফেকি। এই জন্যই আল্লাহ পাক সূরা আশশুয়ারাতে পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। বলুন, আমি কি বলবো শয়তান কাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? তারা আসে অসৎ ও মিথ্যাবাদীর কাছে। এসে আজগুবি মিথ্যা সরবরাহ করে এবং তারা অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদী?। কিন্তু এই অসৎ ও মিথ্যাবাদী আসলে কারা? কোন সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি না হয়, আল্লাহ এ জন্য সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী আয়াতে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'আর পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই কবিদেরকে অনুসরণ করে। তোমরা কি দেখ না, তারা নানা উপত্যকায় উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের কথার সাথে কাজের কোন মিল নেই।' [সূরা আশশুয়ারা : ২২০-২২৬] আল্লাহর রাসূলও [সা] এই রকমই বলেছেন : মানুষের ভেতরটা কবিতার চেয়ে বরং নোংরা পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়াও অনেক ভালো। অতএব এই

www.pathagar.com

সকল বক্তব্যের পরও কি এই কথা আদৌ বিশ্বাস করা চলে যে, প্রচলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি মানবতার প্রকৃত কল্যাণ ও উৎকর্ষ-সাধনে কোনরূপ কাজে আসতে পারে! পারে, এই রকম আস্থা পোষণ করলে তার অর্থ হয়, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল [সা] যা বলেছেন, তা ঠিক নয় [নাউযুবিল্লাহ]।

এখন প্রশ্ন হল, ইসলাম কি তাহলে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে? ইসলামে কাব্য কবিতার স্থান কি একেবারেই নেই? আছে কি নেই, সিদ্ধ কি নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে একটু পরেই আমরা আমাদের আলোচনা পেশ করবো। তবে তার আগে একটি জরুরি কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। বস্তুতপক্ষেই মানবতা একটি অত্যন্ত বড় জিনিস। মানবতা হলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজের সর্বোচ্চ উত্তরণ, এবং মনুষ্যত্বের মহত্তম জাগরণ ও মহত্তম অভিব্যক্তি। দৃশ্যত আমরা যাকে সাহিত্য বলি, শিষ্ট সংস্কৃতি বলি, সেই কবিতা নাটক গীত নৃত্য আমাদের আনন্দ কি বিনোদনের উপকরণ হতে পারে; কিন্তু মানুষকে তার আত্মিক ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে তুলতে সম, এমন ধারণার মধ্যে আবেগ যাই থাক, যুক্তি ও বাস্তবতার কোন স্থান নেই। বস্তুত, বিষয়টা এমন যে, বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিরাও তাদের সংস্কৃতি চিন্তা ও সাহিত্য-দর্শনকে আপন চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম ও একমুখী রাখতে ব্যর্থ হন। অতএব স্বাভাবিকভাবেই একটি অনভিপ্রেত দ্বিমুখিতা চিরদিনের সাহিত্য-সংস্কৃতির কমবেশি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর রাসূল [সা] বলেছেন : যে ব্যক্তির চিন্তা কর্ম ও অক্ষর সৎ নয়, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সৎ নয়। অর্থাৎ সততা কখনো আংশিক হয় না : সততা হল মনপ্রাণ ও চিন্তা কর্মের সার্বিক ও সর্বতোমুখী পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য যে, তথাকথিত সাহিত্য-সংস্কৃতি মানব চরিত্রে এই সততা, এই অখণ্ডতা ও পরিচ্ছন্নতাকে দারুণভাবে বিপন্ন করে তোলে, যা থেকে এমনকি পৃথিবী বিখ্যাত সৎ সংস্কৃতিসেবীরাও আত্মরা করতে পারেন না। বাণ্ডাট রাসেলকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি তো বিবাহ প্রথার অনাবশ্যক অপকারিতা নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন; অথচ আপনি নিজে একাধিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এটা কেমন হল? রাসেল সাহেবের সপ্রতিভ জবাব, 'একটি হল আমার জীবন, অপরটি দর্শন'। এ রকম প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকেও করা যেতো। যদি কেউ বলতেন, 'আপনি তো বিশ্ব মানবতার কবি। দুই বিঘা জমিতে দরিদ' অসহায় উপেনের প্রতি আপনার কী অপরিসীম দরদ ও সহমর্মিতা! কিন্তু শিলাইদহে দরিদ্র মুসলমান প্রজাদেরকে নিগ্রহ নিপীড়নের জন্য এই আপনিই নমঃশুদ্ধ লাঠিয়াল বাহিনী নিয়োগ করেছিলেন!' সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথও বাল্ডাট রাসেলের মতই জবাব দিতেন, 'এক জায়গায় আমি কবি, অন্য জায়গাটিতে আমি জমিদার।' মোম জবাব; কিন্তু এর মধ্যে যে একটি গুরুতর আত্মবিভক্তি বড় হয়ে উঠছে, তার তো কোন জবাব নেই। আসলে রাসেল কি রবীন্দ্রনাথের দোষ নয়, এদের চিন্তা ও চরিত্র এমন এক জীবনদর্শন দ্বারা লালিত অথবা আচ্ছাদিত, যা তাদের কথা ও কর্মকে অখণ্ড থাকতে দেয় না, গুরুতরভাবে দ্বিমুখী এবং দ্বিধাবিভক্ত হতে বাধ্য করে। অতএব এটা না মেনে উপায় নেই যে, এই দ্বিমুখিতা

www.pathagar.com

চিরদিনের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি দুরারোগ্য ব্যাধি ও বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই আল্লাহ পাক বলেন, 'তাদের কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই।' [সূরা আশশুয়ারা] এবং এই জন্য রাসূল [সা] বলেছেন, 'পানি যেরূপ শস্য উৎপাদন করে, গান বাজনা সেইরূপ কপটতা জন্মায়।' অতএব অশ্লীল কাব্য কবিতা গান বাজনা নৃত্যগীত ইত্যাদি নিয়ে আবহমান পৃথিবীর যে জমজমাট সাহিত্য-সংস্কৃতি, তার দ্বারা উৎকর্ষ তো দূরের কথা, মানবতার সীমাহীন তিক্ত ও অপকর্ষই বরং সাধিত হয়েছে।

যাই হোক, আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যা বলতে চাই তা হলো, মানবতার উৎকর্ষ সাধন যদি আমাদের কাম্য হয়; আমরা যদি চাই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও মহত্তম মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ একটি সুস্থ সমাজ ও নিরাপদ পৃথিবী, তাহলে ইসলাম যা বলে সেই দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। ইসলাম বলে, পূর্ণ ইনসানিয়াত হাসিলের মূল শর্ত হলো তাওহীদ, আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় এবং রাসূল [সা]-এর জীবনাদর্শ। যে সাহিত্য, যে সংস্কৃতি এই তিনটি শর্তকে মানব চরিত্রে ইতিবাচক প্রতিশ্রুতির আলো ছড়িয়ে দেয়, সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি মানবতার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। উদারহণস্বরূপ ফররুখের কবিতা, ইকবালের কাব্যসমগ্র, নজরুলের অনেক কবিতা ও গান আমাদের তাওহিদী চেতনার পক্ষে অনুকূল ও উপকারী। বাস্তবিক পক্ষে কথার মত কবিতারও ভালো-মন্দ আছে এবং এই জন্যই রাসূল [সা] কবিতা রচনায় অনেক উৎসাহও দিয়েছেন। তাঁর অনেক সাহাবী [রা] ছিলেন যারা অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেছেন; এমনকি আমাদের জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও [রা] ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট কবি। কিন্তু সাহিত্য কি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যদি তাওহীদ ও আখেরাতকে বিস্মৃত হয়ে পৌত্তলিকতা ও অশ্লীলতা ও অর্থহীন হাস্যরসের সমর্থক হয়ে ওঠে, যদি নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী করে তোলে, করে তোলে কুৎসিত স্বার্থপরতার অক্ষম ক্রীতদাস তবে সেই সাহিত্য, সেই সংস্কৃতি কখনো আমাদের কাড়িত মানবতার পাথেয় হতে পারে না। পৃথিবীর বড় বদনসীব, এই ধরনের সাহিত্য ও সংস্কৃতিই আজ বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করে আছে; যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে শুধু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শয়তানের উল্লসিত কণ্ঠস্বর। আমরা চাই এমন সাহিত্য এবং এমন সংস্কৃতির সরব ও অপ্রতিহত বিস্তার, যা সকল দুষ্টতান্ত্র ও কুশ্রীতাকে পরাভূত করে মানুষে মানুষে ভালোবাসায় সমৃদ্ধ এক নিরাপদ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাতে পারে, আল্লাহর ভয় দ্বারা পরিচালিত একটি সুস্থ ও সুষম সমাজ গঠনকে নিশ্চিত করে তোলে। এই ধরনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের তাওহিদী জীবন দর্শনের প্রকৃত রূপ যেমন বাড়ময় হয়ে ওঠে, একই সঙ্গে মানবিক মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা নিয়ে শাশ্বত মানবতাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিরক ও অশ্লীলতাপূর্ণ তথাকথিত ললিতকলা, গীতবাদ্য ভাস্কর্য প্রকৃতি পূজা ইত্যাদি ধরনের ইবলিসী নান্দনিকতা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন।■

www.pathagar.com

রাসূল [সা] নির্দেশিত আমাদের সংস্কৃতি

হাশিম হায়দার

এক.

'সংস্কৃতি' শব্দটি যদিও ব্যাপক অর্থ ধারণ করে তবুও এই মুহূর্তে একটি বিষয়ে আমাদের স্পষ্টত ধারণা থাকা উচিত, সেটা হলো মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতি। আজকের বহমান মুসলিম সমাজের সংস্কৃতির অনেকাংশের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং যোজন ব্যবধানকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সুতরাং মুসলিম সমাজে প্রচলিত প্রতিটি সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতির আয়নায় দেখতে চাওয়া বাতুলতা মাত্র। হোক না সে মুসলিম বিশ্বের যে কোনো দেশ। এই দুই-এর মধ্যে মৌল পার্থক্য নিরূপণকারী একমাত্র তাওহীদভিত্তিক সংস্কৃতি ও জীবনাচার। এর বাইরে ইসলামী সংস্কৃতি খুঁজতে চাওয়া অর্থহীন। কথাটি রূঢ় হতে পারে। কিন্তু এটাই বাস্তবসম্মত।

ইসলামী সংস্কৃতির কালবিন্যাসে সর্বপ্রথমে উঠে আসে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] আলোকিত অধ্যায়। তিনিই কুফরী, শিরক ও ফাসিকী অপসংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাওহীদভিত্তিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি। রাব্বুল আলামীন যেমনটি চেয়েছিলেন, যেমনটি ছিল তাঁর মর্জি, ঠিক তেমনি একটি

www.pathagar.com

সমাজ-সংস্কৃতি বিনির্মাণের জন্য রাসূল [সা] তাঁর গোটা জীবনকেই উৎসর্গ করলেন।

রাসূলের [সা] পরে তাঁরই আদর্শ গড়ে ওঠা সাহাবায়ে কিরাম এবং সেখান থেকে ক্রমধারায় আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের সাথে তাদের জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি সতত বহমান।

আমরা জানি আর্যরা ইরান থেকে ভারতে প্রবেশের পর রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিজয় লাভের জন্যও মরিয়া হয়ে ওঠে। 'বাংলাদেশ সংস্কৃতি কশিমনের' ভাষ্য মতে– "আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল একটি নতুন সংস্কৃতি নিয়ে। সমগ্র উত্তর-ভারত তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। তাদের প্রভাব ও অহমিকায় ভারতবর্ষে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। তারা আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছিল সকল জাতিকে। যে জাতি তাদের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বঙ্গ জাতি।"

শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনও যে হতে পারে সাহস ও আত্মমর্যাদার উপমা– সেই প্রমাণ রেখে গেছে আমাদের এই জাতি। আমরা তার গর্বিত উত্তরাধিকার।

দুই.

আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে রয়েছে ব্যাপক ধোঁয়াশা। রয়েছে আমাদের বিশ্বাস এবং কর্মে সুবিশাল পার্থক্য। কখনো মনে হয় সংস্কৃতি বিষয়টিই আমরা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারিনি। কি বা কেমন হতে পারে আমাদের সংস্কৃতি, এর প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য কি? বিষয়টি কিঞ্চিৎ জানা যাক 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' থেকে। এখানে সংস্কৃতির মূল ভাবনাটি উঠে এসেছে। এ জন্যই অধ্যায়গুলো তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এখানে বলা হয়েছে :

"মানুষ মনে করে যে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় কোন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, শিল্প-কারিগরী, ললিত কলা, সামাজিক রীতি, জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলো সংস্কৃতির আসল প্রাণসত্তা নয়, তার ফলাফল ও বহি:প্রকাশ মাত্র।" [পৃষ্ঠা : ২]

এরপর বলা হচ্ছে–

"সংস্কৃতির ভেতর প্রথমে যে জিনিসটি তালাশ করতে হবে তা হচ্ছে এই যে দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে তার ধারণা কি? এই দুনিয়ায় সে মানুষকে কি মর্যাদা প্রদান করে? এর দৃষ্টিতে দুনিয়াটা কি? এই দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এই দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কিভাবে? বস্তুত জীবন দর্শন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে মানব জীবনের তামাম ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর এইগুলো গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এই দর্শন বদলে গেলে সংস্কৃতির গোটা স্বরূপই বদলে যায়।" [পৃষ্ঠা : ৩]

"এই সাথে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত তা হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুনিয়ায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এতো ব্যস্ততা, এতো চেষ্টা-প্রয়াস, এতো মেহনত, এতো সংগ্রাম কিসের জন্য? কোন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুবার জন্য আদম সন্তানের চেষ্টা-সাধনা করা কর্তব্য? কোন্ পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে স্মরণ রাখা উচিত? প্রকৃতপক্ষে এই লক্ষ্যই মানুষের বাস্তব জীবনের গতিধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।" [পৃষ্ঠা : ৩]

www.pathagar.com

এরপর বলা হচ্ছে :

"ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা। তা হলো এই যে, এই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়, বরং তাকে এখানে বিশ্ব প্রভুর তরফ থেক প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হিসেবে আপন স্রষ্টা ও মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করা মানব জীবনের স্বাভাবিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে– প্রথমত আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ।

দ্বিতীয়ত শুধু আল্লাহকেই আদেশ ও নিষেধকারী, আইন ও বিধানদাতা, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করা এবং নিজের যাবতীয় ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়া।

তৃতীয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতিগুলো জানা।

চতুর্থত আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের সুফল ও অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া।" [পৃষ্ঠা : ২৬০]

ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য কি? এ সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে সুস্পষ্ট মন্তব্য :

"এই সংস্কৃতির [ইসলামী সংস্কৃতির] মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের [আখিরাতের সাফল্যের] জন্য প্রস্তুত করা। এই সংস্কৃতি দৃষ্টিতে এই সাফল্য অর্জন বর্তমান জীবনের মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ কাজ উপকারী, আর কোন্ কোন্ কাজ অপকারী তা নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত, বরং আখিরাতে ফয়সালাকারী আল্লাহই তা ভালোভাবে অবহিত। এই কারণেই এই সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার ও নিজের কর্ম-স্বাধীনতাকে আল্লাহর শরীয়াহ দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মানুষের কাছে দাবি জানায়। অনুরূপভাবে এই সংস্কৃতি হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার মহোত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা-সামাজিকতা সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত। আর এইসব বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারই নাম দীন ইসলামী বা ইসলামী সংস্কৃতি। [পৃষ্ঠা : ২৬৩]

এরপর আমরা আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে। বলা হচ্ছে :

"অন্যান্য সংস্কৃতি জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ইসলামের লক্ষ্য তার থেকে ভিন্ন ধরনের। অতএব ইসলাম তার ধারণা অনুযায়ী দুনিয়া ও তার ভেতরকার বস্তু নিচয়ের সাথে যে আচরণ ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আপন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্থিব জীবনে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে তাও মূলত অন্যান্য সংস্কৃতির গৃহীত আচরণ ও কর্মপন্থা থেকে ভিন্ন ধরনের। মনের অনেক চিন্তা-কল্পনা ও ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তির অনেক কামনা-বাসনা ও ঝোঁক-প্রবণতা এবং জীবন যাপনের জন্য এমন বহু পন্থা রয়েছে

www.pathagar.com

অন্যান্য সংস্কৃতির দৃষ্টিতে যার অনুসরণ শুধু সঙ্গতই নয়, বরং কখনো কখনো সংস্কৃতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু ইসলাম সেইগুলোকে নাজায়েয, মাকরূহ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ সেগুলো ঐ সংস্কৃতিগুলোর জীবন দর্শনের সাথে একেবারেই সাদৃশ্যপূর্ণ ও তাদের লক্ষ্য অর্জনের পক্ষেও সহায়ক, কিন্তু ইসলামের জীবন দর্শনের সাথে ঐগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই অথবা তার জীবন লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায়স্বরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দুনিয়ার বহু সংস্কৃতির পক্ষে ললিতকলা হচ্ছে প্রাণস্বরূপ এবং চারুকলায় নিপুণ ও পারদর্শী ব্যক্তিরা জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু ইসলাম এর কোনোটিকে হারাম, কোনোটিকে মাকরূহ ও কোনোটিকে কিছু পরিমাণ জায়েয বলে ঘোষণা করে। তার আইন-কানুনে সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচর্যা ও কৃত্রিম সৌন্দর্য উপভোগের অনুমতি এতোটুকু রয়েছে যে মানুষ যেন তার সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে ও খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু যেখানে গিয়ে এই সৌন্দর্য-প্রীতি দায়িত্বানুভূতির চেয়েও প্রবলতর হয়, যেখানে আনন্দ উপভোগের আতিশয্য মানুষকে আল্লাহর পূজারী হওয়ার বদলে সৌন্দর্য পূজারী করে তোলে, যেখানে ললিতকলার স্বাদ থেকে মানুষকে বিলাস-প্রিয়তার নেশায় ধরে যায়, যেখানে ঐসব শিল্পকলার প্রভাবে ভাব-প্রবণতা ও প্রবৃত্তির তাড়না শক্তিশালী ও তীব্রতর হওয়ায় বুদ্ধির বাঁধন শিথিল হয়ে যায় এবং বিবেকের আওয়াজের জন্য হৃদয়ের কান বধির হয়ে যায় ও কর্তব্যের ডাক শুনার মতো আনুগত্য ও দায়িত্ব জ্ঞান বজায় থাকে না, ঠিক সেখানে পৌঁছেই ইসলাম অবজ্ঞা, অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়।" [পৃষ্ঠা : ৭৮]

ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস হচ্ছে :

"ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে কোনো ব্যক্তি এই সত্যটি স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারবে যে এর মাঝে যতোদিন পূর্ণাঙ্গ অর্থে সত্যিকার ইসলাম ছিলো ততোদিন এটা একটি নির্ভেজাল বাস্তব সংস্কৃতি ছিলো। এর অনুবর্তীদের কাছে দুনিয়া ছিলো আখিরাতের কৃষিক্ষেত্রস্বরূপ। তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এই ক্ষেত্রটির চাষাবাদ, বীজবহন ইত্যাদির কাজে ব্যয় করবারই চেষ্টা করতেন যাতে আখিরাতের জীবনে বেশি পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। তারা বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যবর্তী এমন এক সুষম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ভোগ-ব্যবহার করতেন অন্য কোনো সংস্কৃতিতে যার নাম নিশানা পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহর খিলাফতের ধারণা তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি লিপ্ত হতে এবং তার কায়কারবার পূর্ণ তৎপরতার সাথে আঞ্জাম দিতে উদ্বুদ্ধ করতো এবং সেই সঙ্গে দায়িত্ববোধ ও জওয়াবদিহির অনুভূতি তাদেরকে কখনও সীমালংঘন করতে দিতো না। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি [খলীফাহ] হিসাবে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন ছিলেন। আবার এই ধারণাই তাদেরকে দাম্ভিক ও অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখতো। তারা সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের [প্রতিনিধিত্বের] দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পার্থিব জিনিসের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সংগে যে সকল জিনিস দুনিয়ার ভোগাড়ম্বরে আচ্ছন্ন

www.pathagar.com

করে মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে ভুলিয়ে রাখে তার প্রতি তাদের কোনোই আসক্তি ছিলো না। মোটকথা, দুনিয়ার কায়কারবার তারা এইভাবে সম্পাদন করতেন যে তারা এখানে চিরদিন থাকবে না। এই ভোগাড়ম্বরে মশগুল হওয়া থেকে এই ভেবে বিরত থাকতো যে সাময়িক কিছুদিনের জন্য তারা এখানে বসতি স্থাপন করেছে মাত্র।"

উদ্ধৃতির সমাপ্তি টানছি এটুকু জানিয়ে যে, "পরবর্তীকালে ইসলামের প্রভাবহ্রাস ও অন্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় মুসলমানদের চরিত্রে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বৈশিষ্ট্য আর বাকি রইলো না। এর ফলে তারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামী ধারণার যা কিছু বিপরীত তার সব কিছুই করলো। তারা বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হলো। বিশাল বিশাল ইমারত তৈরি করলো। গানবাদ্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট হলো। সামাজিকতা ও আচার পদ্ধতি ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত ব্যয়বাহুল্য ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত হলো। রাষ্ট্রশাসন, রাজনীতি ও অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অ-ইসলামী পন্থা অনুসরণ করলো।" [পৃষ্ঠা : ৪৫-৪৬]

তিন.

'আমাদের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ও চিন্তাবিদ ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী স্পষ্টভাবে বলেন :

আমাদের পক্ষ থেকে একটা নতুন সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করার যে ধারণা আমি পেশ করছি, তা দু'টি গোষ্ঠীর গাত্রদাহের কারণ হতে পারে। প্রথমত: সেই গোষ্ঠী যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজের গোলাম বানিয়ে ফেলেছে এবং যাদের নিজ জাতি সম্পর্কে এতটুকুও আস্থা নেই যে, সে পাশ্চাত্যবাসীর সমকক্ষ হতে পারবে, বিশ্ব নেতৃত্বের বিশাল দায়িত্ব পালন তো দূরের কথা। মুসলিম উম্মাহ এ যাবত যত বিপদ-মুসিবত ও আদর্শিক পশ্চাদপদতার শিকার হয়েছে, তা মূলত এই গোষ্ঠীটার কারণেই হয়েছে। আল্লাহর শোকর যে, আমাদের উম্মাহর ভেতরকার এই গোষ্ঠীটি সংখ্যার দিক দিয়ে ক্রমেই কমে আসছে। এর কারণ প্রথমত: খোদ পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছু বোকামি এবং তার সেইসব সামষ্টিক অপরাধ, যা সে তার অনুসারী ও অন্যান্য দুর্বল জাতির বিরুদ্ধে করেছে। দ্বিতীয়ত: মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দিকে দিকে আত্মপ্রকাশকারী সেইসব আদর্শিক ও রাজনৈতিক জাগরণ, যা উন্নততর ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দিচ্ছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক গোলামির যুগের এখন অবসান ঘটেছে। আর সেই সাথে আমাদের সেইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তি ফুরিয়ে এসেছে, যা সাম্রাজ্যবাদের অবসানকে অসম্ভব মনে করতো। অনুরূপভাবে "সুসভ্য" পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক গোলামির যুগও অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং আমরা সেই সেকেলে ধাঁচের "উদারমনা ও স্বাধীনচেতা" নেতৃবৃন্দের কবল থেকেও মুক্তি লাভ করবো, যারা প্রকৃতপক্ষে মূর্খতা, মানসিক দাসত্ব ও স্থূল চিন্তার প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। তৃতীয়ত: সেই গোষ্ঠী, যারা একথা স্বীকার করে বটে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজের অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি, অপরাধ-প্রবণতা ও অরাজকতার ব্যাপকতার কারণে একদিন ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু তারা আমাদের মত এ কথা স্বীকার করে না যে, আমরা মুসলমানরা পাশ্চাত্য সভ্যতার

www.pathagar.com

ধ্বংসের পর তার স্থলে একটা নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। কেননা আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর সাথে আমাদের ব্যবধান অনেক। তাই নতুন সভ্যতার নেতৃত্ব দেয়ার কথাবার্তা তাদের কাছে আকাশ-কুসুম কল্পনার মত মনে হয়।

কিন্তু আমরা যখন এ বিষয়ে কথা বলি, তখন আমরা এ দাবি তো করি না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলুপ্তি এবং নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমাদের হাতে অর্পণ দশ, বিশ কিংবা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিভিন্ন সভ্যতার পতন ও প্রতিষ্ঠার কিছু অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম-রীতি রয়েছে। কোন মজবুত দুর্গের যখন ফাটল দেখা দেয় তখনো দর্শকদের চোখে দীর্ঘকাল যাবত মনে হতে থাকে যে, তা দৃঢ়ভাবে টিকে আছে। কিন্তু এই আপাতঃদৃশ্য সত্ত্বেও তা পতনোন্মুখ হয়ে থাকে এবং একদিন তার বিধ্বস্ত হওয়া অবধারিত।

আমাদের পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণের সূচনা হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে। তারপর থেকে আমরা বেশ কয়েকটা স্তর পার হয়ে এসেছি। এর প্রতিটি পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা খিলাফাতের পতনের পর দীর্ঘ নিদ্রা থেকে যখন জেগে উঠি, তখন দেখতে পাই আমাদের জাতি সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের কঠোর নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা অচিরেই বেশ কয়েকটা দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হই। ইনশাআল্লাহ বাদবাকি দেশগুলো থেকেও অচিরেই তাকে উৎখাত করে ছাড়বো। নয়া সভ্যতা যেসব রীতিনীতিকে অনিবার্য করে রেখেছে, সেগুলোকে আমরা রপ্ত করে নিয়েছি এবং তদনুসারে আমাদের জীবনকে সংগঠিত করতে শুরু করেছি। এ সকল রীতিনীতি অনুসরণ করেই এ সভ্যতা আমাদের ভাগ্যবিধাতা হয়ে জেঁকে বসেছিল এবং আমাদের দেশগুলোকে জয় করে আপন মুঠোয় পুরে রেখেছিল। ক্রমশ আমরা শক্তি অর্জনের পথে বা বাড়াতে শুরু করলাম, নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগালাম এবং সাধ্যমত চেষ্টা করলাম পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে। এখন আমাদের চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য হবে এই যে, আমরা সভ্য দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং অর্থনীতিতে তাদের সহযোগী হয়ে যাবো। এই স্তরে আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা নিজেদের জন্য এমন একটা সাংস্কৃতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করবো, যার আওতায় আধুনিক-সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যাবলী এবং আমাদের নিজস্ব প্রয়োজন ও পরিস্থিতি উভয়েরই দাবি পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে মেটানো হবে। অনুরূপভাবে আমাদের জন্য এটাও জরুরি যে, এই স্তরটি শেষ হওয়ার আগে পরবর্তী স্তরসমূহের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবো। আমাদেরকে এখনই এ প্রশ্নের সুরাহা করে নিতে হবে যে, আগামীতেও কি আমরা বর্তমান সভ্যতার অধীনেই জীবন যাপন করতে থাকবো এবং যারা আমাদের চেয়ে কয়েকশো বছরের অগ্রগামী, তাদের পেছনে পেছনেই দৌড়াতে থাকবো? না আমরা নিজেদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নেব? যদি প্রথম কাজটি করি, তাহলে জানা কথা যে, ব্যর্থতা ও অবসাদ আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে এবং আমাদের লক্ষ্য কেবল অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদেরই মত হয়ে যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যদি দ্বিতীয়

www.pathagar.com

কাজটি করি, তাহলে নতুন পথ আমাদের সামনে অগ্রসর হবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী শক্তির ভূমিকা পালন করতে পারে। সেই সাথে ঐসব সভ্য জাতির সমস্যাবলী, আধোগতি, অস্থিরতা ইত্যাদি থেকেও আমাদেরকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখতে পারে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বস্তুগত শক্তির দিক থেকে পাশ্চাত্য আজ যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, সে স্তরে আমরা আগামী কয়েক বছরেই পৌঁছে যেতে পারবো না। এত তাড়াতাড়ি কৃত্রিম উপগ্রহ বা আন্ত:মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র যোগাড় করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। আর যদি আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়ও তথাপি পাশ্চাত্য ইত্যবসরে আমাদেরকে পেছনে ফেলে আরো এগিয়ে যাবে। সুতরাং সঠিক কর্মপন্থা এই যে, আমরা শক্তির শূন্যতা পূরণের চেষ্টাও চালিয়ে যাবো, আর সেই সাথে নিজেদের জন্য এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য সভ্যতার নতুন মানদণ্ড তৈরি করবো। বস্তুত সভ্যতার ধন নির্বাচনে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বনের অবকাশ রয়েছে এবং আধুনিক সভ্যতার সমস্যা, ঝুঁকি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য হাতে যথেষ্ট সময় আছে। এ চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা বর্তমান স্তরেই তড়িঘড়ি এই সভ্যতার আধিপত্য থেকে অব্যাহতি পেতে চাই। কেননা সেটা আদতেই সম্ভব নয়। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, পরবর্তী স্তরে আমরা এই গলগ্রহ থেকে মুক্তি লাভ এবং তার প্রভাব থেকে অব্যাহতি লাভ করবো। এ উদ্দেশ্য সফল করার পথ আমাদের জন্য মোটেই কঠিন নয়, যদি আমরা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহের ওপর অটুট আস্থা রাখি এবং যে মূল্যবোধগুলোর সত্যতা ও শুদ্ধতা অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখি। কেননা এই সব আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই আমাদের সভ্যতার কাফেলা তৈরি হয়েছে। আমাদের মহান জাতির অন্তর থেকে সাহস, উদ্যম ও মাথা তুলে দাঁড়ানোর দুর্জয় আকাঙ্ক্ষার স্ফুলিঙ্গ এখনো নিভে যায়নি, প্রাণোৎসর্গ করার দৃপ্ত শপথের জ্বলন্ত আগুন এখনো প্রশমিত হয়নি। বিদেশী হানাদার ও স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের ক্রমাগত আগ্রাসী আঘাত সহ্য করা সত্ত্বেও তার টিকে থাকা ও বিজয়ী হওয়ার প্রেরণা ও উদ্দীপনা কিছুমাত্র অবদমিত হয়নি এবং যুলুম ও আগ্রাসনের সামনে এই জাতি কখনো মাথা নোয়ায়নি।

যদি আমরা অন্তত পরবর্তী পর্যায়ে এই সভ্যতার আধিপত্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, মানবেতিহাসের নতুন যুগকে আমরা বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছি। এভাবে আমরা অন্তত এশিয়া ও আফ্রিকা এই দু'টি মহাদেশে নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। ফলে এই দু'টি মহাদেশের মানুষ পৃথিবীর বাদবাকি সব দেশের চেয়ে সুখী, সমৃদ্ধ, নিরাপদ, নিশ্চিত ও নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। তখন উদভ্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত পাশ্চাত্য জগতও অনন্যোপায় হয়ে আমাদের দিকে মনোযোগ দেবে এবং আমাদের কাছ থেকে সেই জিনিস অর্জন করবে, যা তাদের উদ্বেগ ও অস্থিরতার উপশম ঘটাবে। সেই দিন বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি আমাদের হাতে আসবে এবং গুটিকয় বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার

www.pathagar.com

আগেই আমরা বিশ্বমানবতার গতিকে ভিন্নপথে প্রবাহিত করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

মাঝে মাঝেই আমার মাথায় এমন চিন্তা আসে যে, ইতিহাসের ঘটনাবলী লেখকদের মনের কল্পিত ধারাবাহিকতা অনুসারে সংঘটিত হয় না। কাল কি ঘটবে তা কেউ জানে না। পৃথিবী আকস্মিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর এক প্রান্তে একটা ঘটনা ঘটলে তা অপর প্রান্তের অধিবাসীদেরকে প্রভাবিত করে। তবে তাই বলে আমরা ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবো- তা হতে পারে না। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে আল্লাহ তায়ালা চিন্তাশীলদের ধ্যান-ধারণা এবং নবীগণের ও সংস্কারকদের দাওয়াতের সাথে সমন্বিত করে থাকেন।

আমার উদ্দেশ্য, সৎ মনোভাবাপন্ন লোকদের বিশেষত ঈমানদার যুবসমাজকে আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ও সজাগ করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান, সত্যের অনুসরণ, মনের পবিত্রতা, আত্মার ঔজ্জ্বল্য, চারিত্রিক সততা, মানবিক সমবেদনা ও ন্যায়পরায়ণসুলভ শাসনের অত্যন্ত মূল্যবান উদাহরণ আছে। তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ এবং জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে সক্রিয় থেকেও সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার দুর্লভ স্থাপন করে গেছেন। এদের মধ্যে রাজা-মহারাজা বা শাসক-সম্রাটও ছিলেন, আলেমও ছিলেন, দার্শনিক ও চিন্তানায়কও ছিলেন, ব্যবসায়ী ও প্রশাসকও ছিলেন, নারীও ছিল, পুরুষও ছিল, বৃদ্ধ ও তরুণও ছিল এবং ধনী ও দরিদ্র সবাই ছিলেন। তারা মনুষ্যত্বের এমন পূর্ণাঙ্গ নমুনা ছিলেন যে, শুধু দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কল্পলোকেই কেবল বিচরণ করতেন না, বরং এই ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে সাধারণ জনমানুষের সাথে অবস্থান ও ওঠাবসা করতেন।

ইতিবাচক আধ্যাত্মবাদের এই চিত্তাকর্ষক উদাহরণগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের সভ্যতা সমস্ত নতুন ও পুরনো সভ্যতার মধ্যে অনন্য ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করি না যে, ইসলামের বাইরেও ইতিহাস বেশ কিছু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব অতীতে বিভিন্ন জাতিতে, বিশেষত দূরপ্রাচ্যে ঘটেছে। আজও এমন বহু ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের ভেতর আধ্যাত্মিকতার এক মহৎ ও পবিত্র চেতনা প্রবলভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল ব্যক্তিবর্গের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য এই যে, সভ্যতার প্রতি তাদের মনোভাব একেবারেই নেতিবাচক। জীবনের বাস্তব তৎপরতা থেকে দূরে থাকা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ময়দান থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি থেকেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের জীবন প্রধানত মন্দিরে, আশ্রমে, পাহাড়-পর্বতে, জঙ্গলে ও মরুভূমিতে কেটেছে। কিন্তু আমাদের সভ্যতার ঐতিহাসিক নমুনাসমূহ এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেন্দ্রীভূত, যারা জীবনের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ময়দানে প্রবেশ করে তাকে সাজাতে ও গড়তে চেষ্টা করেছেন এবং এই চেষ্টা ও সাধনায় জান ও মালের সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক উদাহরণগুলো যে যথার্থই অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত, তার রহস্য এখানেই নিহিত রয়েছে।

বর্তমান সভ্যতার চেয়ে উন্নততর, মহত্তম ও পূর্ণতর সভ্যতা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা আমাদের

www.pathagar.com

মধ্যে রয়েছে। আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে এ দ্বারা এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা বর্তমান সভ্যতার চেয়ে হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকে পুন:প্রতিষ্ঠা ও পুনর্বহাল করার দায়িত্ব তাদেরই ওপর অর্পিত। এখনকার সময়টা একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার খুবই উপযুক্ত সময়। কেননা আমাদের জাতি পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ করতে চলেছে। একটা উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তারা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে তাদের পিতৃপুরুষদের মহৎ অভ্যাস ও চরিত্রের প্রভাব এখনো অম্লান। তারা যখনই তাদের পূর্ব পুরুষদের মহত্ত্ব, সততা ও মহানুভবতার কাহিনী শোনে, তখনই তাদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং তারা খুবই দ্রুততার সাথে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

চার.

আফসোসের বিষয়, আজ বিশ্বের নতমুখী মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা কোনোভাবেই আর নির্ভেজাল থাকছে না। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, অভ্যাসে কিংবা স্বার্থ চিন্তায়– যে কোনো কারণেই হোক না কেন আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে বহুমুখী অপসংস্কৃতি। এর মধ্যে শিরকের মত মারাত্মক বিষয়-আশয়ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমুপস্থিত। সুতরাং কোনো মুসলিম সমাজ,দেশ বা গোষ্ঠী সেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার লালন কিংবা অনুসরণ– যাই করুক না কেন এটা যে ইসলামী সংস্কৃতি কিংবা এর দূরবর্তী কোনো অর্থবোধক বিষয়ই নয়– সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে এটাই বিশ্বাসযোগ্য হবার সমূহ কারণ রয়েছে যে আজকের মুসলিম সমাজ অমুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে এক ধরনের অলিখিত সন্ধি কিংবা সমঝোতায় পৌছেছে। এক্ষেত্রে যিনি যতই কারণ এবং আবশ্যকতা তুলে ধরুন না কেন, যত প্রকার যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করুন না কেন– ইসলাম তার সিদ্ধান্তে অনড় এবং সুদৃঢ়। সূরা 'আল কাফিরূন'-এ ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংমিশ্রণ, ভেজাল এবং গোঁজামিলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে রাব্বুল আলামীন স্পষ্টত ঘোষণা করেছেন–

"আপনি বলে দিন যে, হে কাফির সম্প্রদায়! আমি তাদের ইবাদাত করি না, তোমরা যাদের ইবাদাত করো। আর তোমরাও তাঁর ইবাদাত করো না, যাঁর ইবাদাত আমি করি। আমি তাদের ইবাদাত করবো না, যাদের ইবাদাত তোমরা করো। আর না তোমরা কখনো তাঁর ইবাদাত করবে, যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের পথ তোমাদের জন্য আর আমার পথ আমার জন্য।"

সূরা 'আল কাফিরূন' সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে মুমিন ও মুশরিকের পথ। যদি কেউ এই সূরার অর্থ কাফির, মুশরকি ও বেদীনদের সাথে সমঝোতার অনুকূলে নিতে চায় কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল হিসাবে পেশ করতে চায়– তাহলে সে শুধু ভুলই করবে না, বরং সূরা 'আল কাফিরূনের' মূল বক্তব্য ও অর্থকেই বিকৃত করবে। যেটা কখনো কাম্য নয়।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে কোনোপ্রকার সমঝোতা বা সন্ধি হতে পারে না। বাতিল

www.pathagar.com

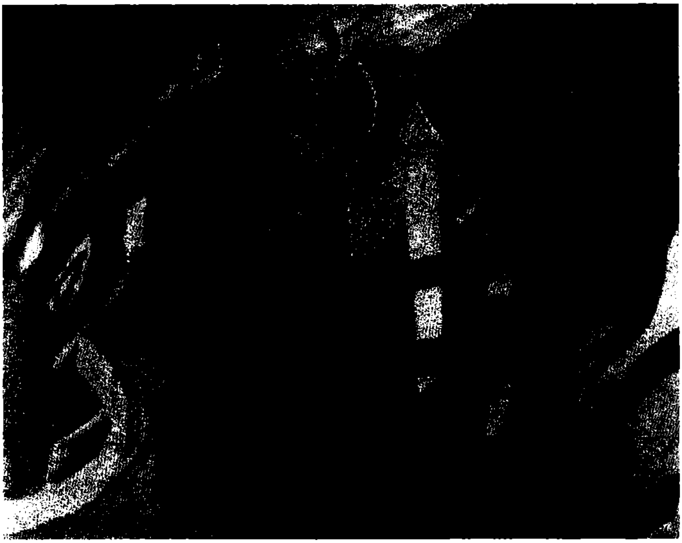

বা ভ্রান্তির সাথে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির কোনোপ্রকার আপোষ ও সমঝোতা হতে পারে না। রাসূলের [সা] সময়ও সেটা হয়নি, আজও সেটা হওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখা জরুরি, জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির আপোষ রফা করে চলা এটা নীতিশুদ্ধ তো নয়ই, মুমিনের কাজও নয়। সুতরাং যখন ইসলামী সংস্কৃতি মেনে চলার জন্য সর্বান্তকরণে সিদ্ধান্ত নেব, তখন অবশ্যই মুমিন বান্দা হিসাবে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলের [সা] যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট থাকতে হবে। কারণ সাময়িক সুখ, সমৃদ্ধি, যশ-খ্যাতি, সফলতা বা বিজয় আমাদের কাম্য নয়– আমাদের প্রত্যাশা অনন্তকালের বিজয়। যে বিজয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সা] প্রকৃত মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্যই সুসংবাদের বাহন হিসাবে গণ্য করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার [রহ] একটি আহ্বান এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি বলছেন : "তোমরা আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর দিকে ফিরে এসো। এর বাইরে রয়েছে বিদআত, ফিসক, শিরক ও কুফর।" সংস্কৃতির বর্তমান প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়টি আমাদের সামনে রাখা অত্যন্ত জরুরি ।

বলা বাহুল্য, মুমিন হিসাবে আমাদের সাংস্কৃতিক ও তামুদ্দনিক সফলতার মানদণ্ড সর্বোতভাবে তাওহীদভিত্তিক হতে হবে; অন্য কিছু নয়। সেই কাঙ্ক্ষিত সাংস্কৃতিক বিজয়ই প্রকৃত বিজয়। ■

www.pathagar.com

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] লালনে মা হালীমার অবদান

মুহাম্মাদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

■

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] জন্মগ্রহণের পূর্বেই তাঁর পিতা এ জগত ছেড়ে পরকালের মুসাফির হন। ফলে আমাদের প্রিয় নবী [সা] ইয়াতীমরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা শরীফের সম্ভ্রান্ত লোকেরা দুধের বাচ্চাদের লালন-পালন ও দুধ পান করানোর জন্য গ্রামের দুগ্ধবতী মহিলাদের কাছে দিয়ে দিতেন। এ কাজে কোন কোন গোত্রের বেশ খ্যাতি ছিল। বনী সাদ গোত্রও প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল। তাদের মেয়েরা ছেলের খোঁজে মক্কা শরীফে আসা-যাওয়া করতো। তারা খুঁজে খুঁজে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেত, লালন-পালন করত, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করে পরে বাচ্চাদেরকে তাদের মাতাপিতার কাছে দিয়ে যেত। ছেলেদের মাতা-পিতা সন্তুষ্ট হয়ে এসব মহিলাদেরকে টাকা-পয়সা হাদিয়া তোহফা আরো অনেক কিছু দিতেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর পবিত্র জন্মের মাস কয়েক পর বনী সাদ গোত্রের মহিলারা বাচ্চাদেরকে নেওয়ার জন্য মক্কা শরীফে আসলো। সকলেই নিজ নিজ পছন্দমত বাচ্চা পেলেন। এদের মধ্যে একজন গরীব মহিলা এসেছিলেন, তাঁর স্বামী হারিস ইবন 'আবদুল 'উযযাসহ। আশা ছিল কোন ধনী পরিবারের একটি শিশু লালন পালনের জন্য গ্রহণ করবেন এবং এতে তাদের অভাব-অনটনের সংসারে কিছু সচ্ছলতা আসবে। কিন্তু গরীব বলে কেউ তাদের বাচ্চা হালীমাকে দিতে রাযী হলো না। এদিকে শিশু মুহাম্মদকে কোন দুগ্ধবতী মহিলার লালনে দেওয়ার জন্য উম্মু আইমান অনেক চেষ্টা চালালেন। কিন্তু ইয়াতীম শিশুকে নিতে যেন সকলেই অনিচ্ছুক। তাঁর পিতা নেই। তাই হাদিয়া তোহফা বা কোন আর্থিক সুবিধা পাওয়ার আশা কম। হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর দাদা মক্কার

www.pathagar.com

মহাসম্মানিত লোক। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। উম্মু আইমান তাঁর পরিচয় দিয়েও চেষ্টা করলেন এ ইয়াতীম শিশুর দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করে কিনা। কিন্তু কোন ফল হল না। তাঁকে গ্রহণ করতে কেউই রাযী হলো না। কারণ এ শিশু ইয়াতীম।

একমাত্র হালীমাই এ শিশুকে গ্রহণ করতে রাযী হলেন। তাঁর এ ইচ্ছার কথা তিনি তাঁর স্বামীর কাছে ব্যক্ত করলেন। হারিস অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললো, এমনিতেই আমরা গরীব, অনাহারে তোমার স্তন দুধশূন্য, আমাদের বাচ্চাই অতৃপ্ত ও ক্ষুধার্ত, এমতাবস্থায় এ ইয়াতীম শিশু নিয়ে আমরা কি করবো, এতে আমাদের কি উপকার হবে?

হালীমা স্বামীকে শুধালো, "একটু ভেবে দেখো তো, আমি যদি এ শিশুকে না নিয়ে এমনি চলে যাই, তবে গোত্রের মহিলারা আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে। এ সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে ভবিষ্যতে আমি মক্কায় আর কোন শিশু পাব না।" হারিস বললো, "এর পূর্বে কতজনই তো বাচ্চা না পেয়ে এমনি ফেরত গেছে। এতে কি তাদের কোন বদনাম হয়েছে? শিশু না নিয়ে চলে গেলে বদনাম হবে– তোমার এ যুক্তি ধোপে টেকে না।"

হালীমাও জানে এ যুক্তি যে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনমতে যদি স্বামীকে ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতিশীল করানো যায়, তাই এ যুক্তির উপস্থাপনা। তিনি বললেন, "হারিস তুমি কি জান না ইয়াতীমের সেবা করা সওয়াবের কাজ? এতে আল্লাহ খুশী হন। গরীবের প্রতি কারো দৃষ্টি নেই, সকলের দৃষ্টি মালের দিকে। তোমার অন্তরে কি ইয়াতীমের জন্য সামান্য দরদও নেই?"

"না, না, হে হালীমা আমার অন্তরে ইয়াতীমের প্রতি মমতা যে নেই, তা নয়। তবে কথা হলো আমরা গরীব, আমরা কি ইয়াতীমের ঠিকমতো লালন-পালনে সক্ষম হবো? ভাবনা এ নিয়েই।" হালীমা বললেন, "দেখো, আমরা যদি এ শিশুকে গ্রহণ করি এতে একদিকে যেমন অসহায়ের প্রতি মমতা প্রকাশের সওয়াব হবে, অপরদিকে তেমনি আমাদের সুনাম ও খ্যাতি বাড়বে। লোকে বলবে, এরা কত ভাল লোক, কত দরদী, অর্থ-সম্পদের লিপ্সা না করে ইয়াতীম শিশুর প্রতি দয়া করেছে। ভবিষ্যতে আমাদের প্রতি লোক আকৃষ্ট হবে।"

কোন আপত্তি নেই, হালীমা এ শিশুকে গ্রহণ করো। হয়ত এতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বরকত দিবেন।

উম্মু আইমান অপেক্ষায় ছিলেন হয়তো কাউকে পাওয়া যেতে পারে এ শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করার মত। এমনি চলে গেলে মা আমিনা কি মনে করেন, মনে করতে পারেন আমি ভাল করে চেষ্টা না করে ফেরত এসেছি। না, এভাবে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। দেখি না কি হয়, আল্লাহর কি ইচ্ছা। তাই তিনি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময়ে হালীমা এসে তাঁর সাথে কথা বললেন, তাঁকে শিশুর মায়ের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। উম্মু আইমান খুশী হয়ে তাকে আমিনার কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে গিয়ে আনন্দে বললেন, বনী সাদ গোত্রের একজন মহিলাকে নিয়ে এসেছি। শিশুকে তাড়াতাড়ি সাজিয়ে প্রস্তুত করুন।

www.pathagar.com

আমিনা হালীমাকে সাদরে বসতে বললেন, পরিচিতি বিনিময় ও অন্যান্য আলাপের পর জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যিই কি আপনি এ শিশুকে গ্রহণ করার আগ্রহ রাখেন?"

"হ্যাঁ, আমি এতে আগ্রহী"।

আমিনা বললেন, "তবে দেখুন, আমার কাছে অর্থ-সম্পদ নেই, যা দিয়ে এ শিশুর পরচির্যা ও দেখাশুনার প্রতিদান দিতে পারি। আপনার এ মেহনত ও খিদমাতের প্রতিদান দেওয়ার জন্য আল্লাহই আমাকে তাওফীক দিবেন এ ভরসা আমার আছে।"

হালীমা বললেন, "চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহর রহমত অসীম, তাঁর বরকতের শেষ নেই। তিনিই আমাদেরকে প্রতিদান দিবেন।" আমিনা বললেন, "আল্লাহ তো বরকত দিবেন ঠিকই। তাঁর রহমত ও দয়ার কোন শেষ নেই। তবুও আপনি কষ্ট করবেন, শিশুর পরিচর্যা করবেন, আপনার এ আয়াসের জন্য কিছু দেওয়া তো আমাদের কর্তব্য।" হালীমা বললেন, আমি এ শিশুর প্রতি আকৃষ্ট, তাঁর প্রতি আমার মমতা রয়েছে। আমি অজানা এক আকর্ষণে আপনার এ মাণিককে নিতে এসেছি। আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় পাথেয় ও সুস্বাস্থ্যের জন্য দু'আ নিয়ে আমিনা কলিজার টুকরা শিশু মুহাম্মদকে হালীমার নিকট সোপর্দ করলেন।

হালীমা ও তাঁর স্বামী যে বাহন নিয়ে বনী সাদ গোত্র থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন, সেটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল, সবাই তাদের আগে অনেক দূর চলে যেতো। আর তারা পেছনে থাকতেন। এ জন্য তাদের আক্ষেপ ছিল, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। তারা অর্থ-সম্পদহীন, বাহনের খোরাক যোগাতে অপারগ। অতএব দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

কিন্তু এখন বরকতময় শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের অবস্থা অন্য রকম। এখন তাঁরা সকল কাফেলার চেয়ে অগ্রগামী। কারো বাহন তাদের বাহনের মত অত দ্রুত চলতে সক্ষম নয়। অতি দ্রুত বাহন চালিয়ে একজন মহিলা তাঁর বাহনের কাছে পৌছতে পারলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "একি তোমার সেই বাহন, যার উপর সওয়ার হয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছিল?" হালীমা বললেন, "হ্যাঁ, সে বাহনই।" "তবে ব্যাপার কি, আমাদের বাহন একে ধরতেই পারছে না!" ঈর্ষা থেকে রক্ষা পাবার জন্য হালীমা তার কারণ নিজে ব্যক্ত না করে বললেন, কিসে এ বাহনে পরিবর্তন আনলো, হয়তো সেই বলতে পারবে। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই চুপ হয়ে গেল। কাফেলা বনী সাদ গোত্রের মহল্লায় পৌছলে হালীমা নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর মনে এক অপূর্ব ও অব্যক্ত তৃপ্তি। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট হালীমা সাদিয়ার পরিবার খুব আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন। তাঁদের ঘরে-বাইরে বরকতের ছাপ। সচ্ছলতার লক্ষণ। তাঁরা সকলে অনুভব করতে পারলেন যে, এসব নবাগত মক্কী শিশুরই সৌজন্যে। এ শিশুকে কে

www.pathagar.com

কোলে নিবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা। এ ঘরে শিশুর আদর যত্নের কোন অভাব নেই। গোত্রের সকলের মধ্যেই শিশুর কদর ও মুহাব্বাত। নবাগত এ শিশুর বদৌলতে তাদের ক্ষেতের ফসলে বরকত দেখা দিল। বৃষ্টির কমতি নেই। সবদিকে রহমতই রহমত। বরকতই বরকত। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকল। দুগ্ধপোষ্যের সময়সীমা অতিবাহিত হল। হালীমা পুত্রকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবার চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন।

হারিস পরিবার এ পবিত্র শিশুকে মক্কায় পৌছানোর প্রস্তুতি নিতে লাগলো। কিন্তু তাদের জন্য এ বিদায় ছিল অতি বেদনাদায়ক। তাদের আদরের এ শিশুটি আজ তাদেরকে ছেড়ে মক্কায় চলে যাবে।

একথা মনে পড়তেই বিরহ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এ বিরহ কি তাঁরা সহ্য করতে পারবেন? সেদিন হালীমার ছোট শিশুটিও ঘুম থেকে জেগে মক্কী ভাইয়ের বিদায় ও বিরহ-চিন্তায় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। কান্না কিছুতেই থামতে চায় না। ভাবনা একটাই, আমাদের ভাই মুহাম্মাদ আমাদেরকে ছেড়ে মক্কায় চলে যাবে।

এ বিষয়ে যদি তাদের ইখতিয়ার থাকতো তবে তারা কিছুতেই তাদের এ ভাইকে যেতে দিতেন না। কিন্তু বাস্তব আর কল্পনা তো এক নয়। মুহাম্মাদকে তো তার মায়ের কাছে যেতে না দিয়ে পারা যায় না। তাই এ বিরহ কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতেই হবে।

হালীমা সাদিয়া মুহাম্মদকে বাহনে সওয়ার করলেন এবং মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। তাঁর স্বামী ও ছেলে-মেয়ে সকলেই বিদায় সংবর্ধনা জানাতে বের হয়েছে। তাদের কান্নার শব্দ আশেপাশে শোনা যাচ্ছে। তারা বাহনের পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত চললেন, সকলেই মুহাম্মাদকে স্পর্শ করলেন। সকলের চোখেই অশ্রু, অন্তরে বিরহের বেদনা। এক পর্যায়ে বাহন তাদের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে চলে গেল।

হালীমা শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং তাঁর মাতা আমিনার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি কী দিয়ে হালীমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। আনন্দে আজ তিনি আত্মহারা। শিশুকে বুকে লাগালেন, চুমু দিয়ে আদর করতে লাগলেন। এতদিন তিনি ছেলের জন্য কত ধৈর্য ধরেছেন, অপেক্ষায় কতইনা দিন কাটিয়েছেন। ছেলেকে ভাল করে দেখলেন, স্বাস্থ্য ভাল দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। হালীমা এ শিশুর লালন পালনে যে মেহনত করেছেন তার জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। ছেলের প্রতি স্নেহ প্রকাশের এ দৃশ্য হালীমা অবলোকন করছিলেন এবং আনন্দে আপ্লুত হচ্ছিলেন। হালীমার বাসনা ছিলো এ শিশুকে আবার নিয়ে যাবেন, আরো কিছুদিন তাঁর তত্ত্বাবধানে লালন পালন করবেন। এতে শিশুরও উপকার হবে এবং তাদেরও বরকত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আমিনার কাছে এ বাসনার কথা কিভাবে প্রকাশ করবেন তা ভাবছিলেন, এক পর্যায়ে বললেন : "আমিনা! আমাদের মধ্যে এ শিশু আমাদের সন্তানদের মতোই ছিল এবং আমাদের ছেলে-মেয়েরাও তাঁকে ভাইয়ের মত

www.pathagar.com

দেখেছে। এ শিশুকে গ্রহণের পূর্বে আমাদের জীবনে কতই না অনটন ছিল। ছিল ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালা। পার্শ্ববর্তী লোকেরা আমার সন্তানদের কান্নার শব্দ শুনতে পেত। কিন্তু এ শিশু আমাদের ঘরে প্রবেশ করার পর আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, আমার স্বামীর আয়ের পথ খুলে যায়। আমাদের ঘরে সবদিক থেকে প্রাচুর্যের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এসব ছিল আপনার এ শিশুরই বরকত। আমাদের গোত্রের লোকেরাও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। এখন মনে হয় আমরা বরকত থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি।"

"না, না, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এ বরকত সবসময় রাখুন।" হালীমা বললেন, "আমীন! আমাদের আশংকা এ শিশুর অবর্তমানে আমরা বরকত ও প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হব।" আমিনা জিজ্ঞেস করলেন, "তবে কি আরো কিছুদিন মুহাম্মাদকে তোমাদের মধ্যে রাখতে চাও?" "আমিনা! আমার এটাই 'আরয"।

"হালীমা! আমার নয়নমণি আমার থেকে দূরে থাকবে তা আমি কিভাবে সহ্য করতে পারি। হযরত মূসাকে [আ] বিদায় দেওয়ার সময়ে মূসা জননীর কী মনোকষ্ট হয়েছিল তা কি তোমার জানা নেই?" হালীমা বললেন, "জানি, তবে শিশু মুহাম্মাদের বিরহে আমার যে কি বেদনা সহ্য করতে হবে তা তো আপনি আন্দাজ করতে পারছেন না।"

"হালীমা, তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন করলে। আমি এতদিন আমার নয়নমণির বিরহ সহ্য করেছি। তুমি কি চাও যে, তাকে তোমার কাছে দিয়ে আমি আমার বিরহ বেদনা সহ্য করি?" হালীমা বললেন, "আপনি এ শিশুর জননী। তাকে ভালবাসবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন মক্কার আবহাওয়া ভাল নয়। এ শিশু গ্রামের খোলামেলা পরিবেশ ও আবহাওয়াতে প্রফুল্ল থাকবে। তার ভাষা শুদ্ধ হবে, চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটবে। আপনি কি ছেলের জন্য তা পছন্দ করেন না?"

আমিনা ভাবলেন, পুত্রের মঙ্গলার্থে আমি এতদিন যখন কষ্ট সহ্য করেছি, তবে আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরা কি সঙ্গত নয়, আর হালীমা তো তাকে মায়ের মতই স্নেহ করে থাকেন। তিনি বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি তাঁর পিতামহের সাথে আলাপ করে নিই। পিতামহ হালীমার প্রস্তাবে মত দিলেন। হালীমা কয়েকদিন আমিনার কাছে অবস্থান করার পর পবিত্র আমানত শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে বনী সাদ-এর দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর ভাগ্যে এ সৌভাগ্য নির্ধারিত ছিল।

ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন শিশু মুহাম্মাদকে লালনকর্ত্রী ও স্তন্য দানকারিণীরূপে। আরো বছর দুই বনী সাদ গোত্রে রাখার পর শিশু মুহাম্মাদকে আমিনার কাছে নিয়ে আসলেন হালীমা। আমিনা তাঁর নয়নমণি মুহাম্মাদকে নিয়ে মদীনায় গেলেন। ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত মুহাম্মাদ [সা] এখন পিতৃমাতৃহারা এক ইয়াতীম শিশু। পরবর্তীকালে যিনি হলেন মানব জাতির পথ প্রদর্শক ও সকলের জন্য রহমতের নবী [সা]।■

www.pathagar.com

বাংলাদেশের যুব সমাজ ও রাসূল [সা]-এর আদর্শ

আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

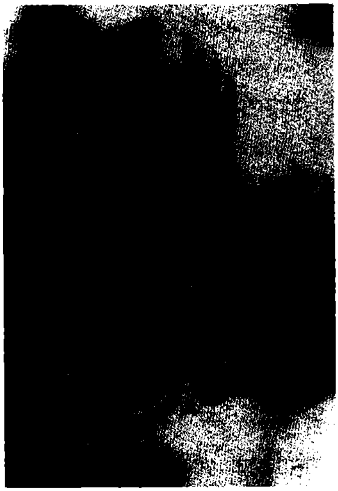

দেশ, জাতি ও মানবগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ যুবকেরা। যৌবনদীপ্ত তরুণ-তরুণীরা ভাঙ্গা ও গড়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কারিগর। বাংলাদেশের যে বিপুল জনশক্তি তার একটি বড় অংশ যুবশক্তি। আর এদের নিয়েই দুশ্চিন্তায় পড়ে আছেন সরকার, অভিভাবক মহল এবং তারা নিজেরাও। অধিকাংশ তরুণের মুখে চিন্তার বলিরেখা, হতাশার কালো মেঘ। তাদের অধিকাংশের ব্যস্ততা হতাশাজনিত নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত। এদের অলস, উৎপাদনহীন, অকর্মন্য সময় কাটে এমন কাজে বা সমাজ সভ্যতার জন্য যা কোন কল্যাণ আনতে পারে না। তরুণের এই যে দুরবস্থা, তারুণ্যের এই যে অবমূল্যায়ন এর জন্য কে দায়ী? এ অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনা কি অসম্ভব?

আমরা বলব এটি অবশ্যই সম্ভব এবং খুব সহজেই সম্ভব। আর এই সম্ভাব্য কাজটি করার জন্য প্রয়োজন সরকার, জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও তরুণ সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

www.pathagar.com

প্রত্যেক মানুষের জন্য চাই আদর্শ

বিশ্বাসী কিংবা অধিবাসী প্রতিটি মানুষের থাকা চাই একটি আদর্শ যার নিরিখে তার ব্যাষ্টিক সামষ্টিক ও জাতীয় জীবন পরিচালিত হবে। যারা কোন না কোন আদর্শকে নিজের জন্য মডেল করে নিতে পেরেছেন তারা জীবনে বহুদূর এগিয়ে যেতে পেরেছেন বা পারেন। আর যারা আদর্শ শূন্যতার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের জীবনে কোন লক্ষ্যই অর্জিত হয় না।

আজ যদি বাংলাদেশের তরুণদের জিজ্ঞেস করা হয় আপনার জীবনের আদর্শ কি? অধিকাংশ তরুণই কোন সচেতন মতামত দিতে পারবে না। কেউ কেউ আবেগ বশে কোন আদর্শ নাম উচ্চারণ করলেও পরমুহূর্তে সে আদর্শ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নেরই জওয়াব দিতে পারে না। আদর্শ সম্পর্ক অসচেতনতা কিংবা অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ। তার চেয়েও বড় কারণ আদর্শের প্রতি কমিটমেন্টের অভাব। অনেকেই আদর্শের ফাঁকাবুলি মুখে বললেও বাস্তব জীবনে আদর্শ চর্চার বিপুল ঘাটতি রয়েছে।

তারপরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে প্রচলিত প্রথাগত ধারণা আমাদের তরুণ সমাজকে করেছে আরও বিভ্রান্ত। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ধর্মের মতো ইসলামকেও শুধুমাত্র মসজিদ, মন্দির, গীর্জা খানকাহ'র বিষয়ে পরিণত করে রাখার একটি মানসিকতা আমাদের রয়েছে। যার জন্য জীবন হয়ে পড়েছে দ্বিখণ্ডিত। একটি ধর্মীয় জীবন আর একটি দুনিয়াবী জীবন। ফলে মসজিদে আল্লাহর সামনে একাগ্র ও বিনীত চিত্তে এবাদত রত তরুণকেই দেখা যায় ব্যবসায়ে ভেজাল দিচ্ছে। অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করছে, রাজনীতিতে খোদাহীন ও সেক্যুলার রাজনীতির অনুসারী হয়ে থাকছে এবং সমাজের অনেক অসাধু কাজেই দোসর হিসেবে কাজ করছে।

এসবই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল। আমাদেরকে আদর্শ সচেতন করে গড়ে তোলা এবং ইসলামের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ সম্পর্কে ও পরিষ্কার ধারণা দেয়ার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। এতে আছে সংশয় সৃষ্টির স্পৃহ আয়োজন, বিভ্রান্ত করার সমস্ত ব্যবস্থা।

রাসূলের [সা] আদর্শই সেরা আদর্শ

পৃথিবীর সেরা মানুষ সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা [সা]। তিনি উম্মী হয়েও সারা পৃথিবীর সর্বকালের সেরা শিক্ষক। তা সকল কালে, সকল দেশে সকল মানুষের জন্য সমান কার্যকর ও কল্যাণময়। তাঁর জীবনাচার যে কোন মানুষের জীবনেই আনতে পারে অভাবনীয় পরিবর্তন।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্যই তাঁর আদর্শ সেরা আর্দশ। শিশু-কিশোর যুবা-প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ সবার জন্যই তাঁর জীবনে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারী-কর্মকর্তা, সেনাপতি-সৈনিক, বিচারপতি, রাষ্ট্রপতিসহ সকল পেশার, সকল

www.pathagar.com

পর্যায়ের মানুষের জন্যই তিনি মডেল এবং এক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ও একক। আজকের তরুণেরা যে সংকট অতিক্রম করছে এমনি এক সংকটকালে হযরত মুহাম্মাদ [সা] অসভ্য, বর্বর, বিবদমান ও উচ্ছৃঙ্খল আরব জাতির একটি নেতৃত্বাধীন পরিবারের দরিদ্র পিতার ঘরে ইয়াতিম হিসেবে জন্ম লাভ করেন। তাদের মাঝেই তিনি লালিত-পালিত হন। তাদেরই একজন হয়ে বেড়ে উঠেন। জন্মে পিতৃহীন, শৈশবে মাতৃহীন এবং কৈশরে পিতামহহারা এই তরুণের তারুণ্য কাটে পিতৃব্য আবু তালিবের ব্যবসায়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে। তবে তিনি আশৈশব আল্লাহর সরাসরি হেফাজত লাভ করায় কখনোই ঐ ঘৃণ্য সমাজের কালিমা তাঁকে ছুঁতে পারেনি। তাদের একজন হয়েও তিনি তাদের মতো হননি।

যৌবনেই তিনি জনগণের মাঝে পরিচিতি লাভ করেন আল আমীন [বিশ্বাসী] ও আস সাদিক [সত্যবাদী] হিসেবে। নবুয়্যত প্রাপ্তির আগেই তিনি দারিদ্র্যের বন্ধু, মজলুমের সাহায্যকারী, আসহায়ের সহায়, জ্ঞানীর উত্তম সাথী আর মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন।

পরিপূর্ণ যৌবনে তিনি নবুয়্যত লাভ করেন। নবুয়্যত তাঁর সমস্ত ভালো গুণকে উত্তমে পরিণত ছিল। এক আল্লাহর আদিষ্ট পথেই তিনি নিজে চলতে লাগলেন এবং পথ নির্দেশ দিতে থাকলেন মানব জাতিকে। সেই পথ নির্দেশই এনে দিলো জুলুমের অবসান। মজলুমের মুক্তি ও সাম্যের সুন্দর সমাজ।

ফলে বার্ণাড'শ, মরিস বুকাইলী, উইলিয়াম পিকথল, লিও টলস্টয়, পণ্ডিত নেহেরু এমএন রাফ, সরোজীনী নাইডু সহ অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত মনীষী তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব মানবতার মুক্তির জন্য এ আদর্শের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য করে নিজেরা ধন্য হয়েছে।

মুহাম্মাদ [সা] যুবকদের এক চলাকার আদর্শ

আজকের যুকবরা যদি মুহাম্মাদ [সা]-এর অনুসরণীয় সুন্দর জীবন সম্পর্কে জানতো, যদি যুবকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও যৌবনের যে মর্যাদা তিনি তুলে ধরেছেন তা যদি তারা জানতো তাহলে প্রতিটি যুবকই তাঁরই মতো হতে চাইতো। প্রতিটি যুবকই আত্মশক্তির এমন এক পর্যায় পৌঁছাতো যা তাকে নিয়ে যেতো সুন্দরতম জীবনের দিকে।

যৌবনই শ্রেষ্ঠ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত– রাসূল [সা]-বলেছেন, 'পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত মানব সন্তানকে কিয়ামাতের দিন এক কদমও সামনে যেতে দেয়া হবে না।

১. তোমাকে যে জীবন দিয়েছিলাম তা কোন কাজে ব্যয় করেছ? ২. যে যৌবনকাল তোমাকে দিয়েছিলাম তা কোন কাজে অতিবাহিত করেছো? ৩. কোন পথে আয়

www.pathagar.com

করেছো ৪. আর কোন পথে তা ব্যয় করেছো ৫. যতটুকু জ্ঞান তোমায় দেয়া হয়েছিলো তা কোন কাজে লাগিয়েছো?

জীবনের ব্যাপারে প্রশ্ন করার পর আবার যৌবন সম্পর্কে প্রশ্ন করার মানেই যৌবনের বিশেষত্ব রয়েছে। যৌবনের ব্যাপারে আল্লাহ আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কারণ এটাই জীবনের সময়। হাদীসে রয়েছে যৌবনে যখন আল্লাহকে একবার ডাকা হয় তিনি চল্লিশ বার জবাব দেন আর আল্লাহর রাসূল [সা] বলেছেন, যৌবনের কুরবাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ কুরবাণী, আল্লাহ যৌবনের কুরবাণী বেশী পছন্দ করেন।'

আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকায়ও যুবকদের আলাদা স্থান।

হাশরের দিন যখন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না তখন যেসব ভাগ্যবান লোক আরশের নীচে আশ্রয় পাবেন তাদের মধ্যে ২ (দুই) শ্রেণী রয়েছে যুবক।

ঐ যুবক যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকে। ২. ঐ যুবক যাকে কোন সুন্দরী রমনী নির্জনে নিবেদন করার পর সে এই বলে বেঁচে থাকে 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

এভাবে যৌবনের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা আর কেউ কি দিয়েছেন? দেননি, যৌবন ও জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠতম উপযোগী বিধান আল ইসলামের নবীই এই মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন।

তরুণের তারুণ্যের এই ঘোষণার মধ্যেই আজকের তরুণ সমাজের মর্যাদার উৎস নিহিত রয়েছে। আর সে উৎস সমূহ হচ্ছে :

১. প্রতিটি যুবককে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে হবে, আর কারও নয়।

২. প্রত্যেক যুবক আল্লাহকে ভয় করে চলবে।

৩. যুবক হৃদয় মসজিদে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সচেতন থাকবে, মসজিদমুখী হবে।

৪. আল্লাহর ভয়ে পৃথিবীর যে কোন ধরনের মোহ থেকে মুক্ত থাকবে।

৫. আল্লাহর পথে জীবন কুরবাণী দেয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে।

৬. যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ব্যয় করবে।

এর ফলে দেখা যাবে জীবনের এক অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন এসে গেছে। এ বিষয়গুলোতে যে অভ্যস্ত হয়ে যাবে সে হবে অকুতোভয়। দুনিয়ার সবচেয়ে স্মার্ট লোক হবে অথচ তার কোন অহংকারবোধ থাকবে না। সে হয়ে যাবে নাজ্জাশীর দরবারের জাফর বিন আবু তালিব। নির্বাসিত জীবনেও সেখানে মাথা উঁচু থাকে সম্রাটের দরবারে, নির্ভয়ে বলে যায় হক ও বাতিলের কথা। সামান্য কম্পিত হয় না পা কিংবা বিচ্যুত হয় না নিজেদের বক্তব্য থেকে। সম্রাটের দরবারকে অভিভূত করে ফিরে আসে বিজয়ীর বেশে।

www.pathagar.com

এরি ফলে জন্ম নেয় নির্ভীক, দিগিজয়ী অথচ আনুগত্য পরায়ণ বীর। জন্ম নেয় খালিদ বিন অলিদ। জয় করে দেশের পর দেশ। জানেনা পরাজয় কাকে বলে। জনকণ্ঠে শ্রুতি উঠে খালিদ সাইফুল্লাহ, তার কোন পরাজয় নেই। আর তিনি তখন অহংকারের আশংকায় সেজদানত। এমনি সময়ে টগবগে যুবক সেনাপতির কাছে চিঠি আসে খলীফার। নির্দেশ দেয়া হয় সেনাপতিত্ব ত্যাগ করে নতুন সেনাপতির [তারই অধীন সৈনিকের] আনুগত্য করতে। সহাস্য বদনে সেনাপতি চলে যায় সৈনিকের কাতারে, সৈনিক তুলে নেয় সিপাহসালারের পতাকা।

এই রাসূলের নির্দেশ মেনে চললেই তৈরি হয় খাব্বাব আর বেলালের মতো যুবক। পৃথিবী যাদের ত্যাগের তুলনা খুজেঁ পায় না। আসে আম্মারের মতো তরুণ যার হৃদয় কাঁদে বাবা মার মুক্তির জন্য। অতঃপর রাসুলের পদাঙ্ক অসুরণ করে প্রস্তুতি নেয় জীবন বিলিয়ে দিতে। রাসূলের রেখে যাওয়া আদর্শই জন্ম দেয় মুসা আর আরিফের মতো সিপাহসালার জিব্রাল্টরের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সে সৈনিকদের বলতে পারে বন্ধুগণ! পিছনে ফিরে দেখো আমাদের ব্যয়ে আনা নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, সামনে সশস্ত্র শত্রু। সামনে গেলে মৃত্যুও হতে পারে বিজয়ও আসতে পারে আর পিছনে গেলে আছে ভয়ার্ত মানুষের আত্মহুতি। কোনটি চাও শাহাদতকে আলিঙ্গন, না ভীতুর মৃত্যু? আর সৈনকিরাও ঘোষণা দেয় 'শাহাদতই আমাদের কাম্য। এই প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকাই তাদের জন্য বয়ে আনে সৌভাগ্য ও বিজয়।

এ আদর্শ মেনে নিলে দিনে কমপক্ষে পাঁচবার সম্পর্ক হবে মসজিদের সাথে। পাঁচবার মসজিদে যাওয়া মানেই আমাদের আরো কিছু ভালো লোকের সঙ্গে দিনে কয়েকবার দেখা হওয়া। এভাবেই ব্যক্তি হয়ে ওঠে সামাজিক। সমাজ সম্পৃক্ততা তাকে দেয় ভাল ও সামষ্টিক কাজের প্রেরণা। প্রতিটি কাজে যখন সে আল্লাহর বিধানের কথা স্মরণ রাখে তখন স্বাভাবিকভাবেই কোন অন্যায় ও অসুন্দর কাজে সে জড়িত হতে পারে না। সে কেবলই ন্যায়, সুন্দর ও কল্যাণকর কাজে ব্যাপৃত থাকে। তার কোন বেকারত্ব থাকে না। হতাশা থাকে না। অন্যায় প্রবণতা থাকে না, কারণ তাকে এ আদর্শ অজস্র কাজের সন্ধান দেবে। ভিক্ষুকের চাইতে দাতার হাত বড়' 'আল্লাহ শ্রমিককে ভালবাসেন' এ ধরনের অনেক প্রেরণাদায়ক কথার সাথে পরিচিতি করাবে। তাকে শোনাবে ধ্বংস তার জন্য যার আজকের দিনটি গতকালের চাইতে সুন্দর হয়নি। সেখাবে 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের উপর ফরজ' 'জ্ঞান অর্জন করো যদিও চীনে যেতে হয়।' এসব দেখে শুনে, জানতে পেরে তার জীবনে আসবে আমূল পরিবর্তন।

আজকের যুবকরা যদি রাসূলের জীবন থেকে তাদের আদর্শ খুঁজে নিতো তাহলে সমগ্র সমাজ জীবনে নেমে আসতো কল্যাণের ফল্গুধারা। কারণ রাসূলের আদর্শে মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের করণীয় বর্জনীয় পরিষ্কার করে দেয়া আছে। তিনি যাই করতে বলেছেন

www.pathagar.com

তাই কল্যাণকর আর যা কিছুই বারণ করেছেন সেসবই অকল্যাণকর।

আজ যদি আমাদের তরুণদের ছোটবেলা থেকেই রাসূলের জীবনের সাথে পরিচিত করার কোন ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে অন্যায় অবিচার, দুর্নীতি, উশৃঙ্খলতা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং মাদকাসক্তি বন্ধের ব্যাপারে কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন আয়োজন আর লাগতো না। কারণ প্রতিটি যুবকই তখন তার আদর্শের ছোয়ায় সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক হয়ে যেতো।

আজ বাংলাদেশের যুব সমাজের যে অবস্থা এ অবস্থায়ও যদি সরকার উদ্যোগ নিয়ে সকলের জন্য রাসূলের জীবন পাঠ ও তাঁর অনুসরণের কার্যকর ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন, যদি আমাদের সমাজ পিছিয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভাগ্যেও নেমে আসবে বসনিয়া, সাইপ্রাস, কাশ্মীর আর ফিলিস্তিনের বিপর্যয়। সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়। সুতরাং সময় থাকতেই কার্যকর উদ্যোগ নেয়া দরকার। ■

www.pathagar.com

নাতে রাসূল ॥ নূ র-ই আ উ য়া ল

আমার গানের এই লিপিকায়
ঠিকানা মদিনা ধাম
নিবেদিত সুর সাধনে মধুর
মোহাম্মদেরই নাম।

গরিব নাদানে ওমরার টানে
হৃদয় গভীরে কাবা
জায়নামাজের শ্যামলিমা ঘের
সিজদা ও মোরাকাবা
বিফলে যদি না সুদূর মদিনা
পায় মেলে এহ্‌রাম ॥

দু'চোখের জলে বুকের অতলে
ঝিনুকে জমানো মোতি
তুফানের তোড়ে আঁধারে বে-ঘোরে
ঝলসে ওঠেনা জ্যোতি।
তপে জপনামে দরূদে সালামে
নাম-হারা ফুল ফোটে
শ্রাবণে ভাদরে ঝরে অনাদরে
খোশবু রহিত ঠোঁটে।
ফুটবে সে কবে গোলাপ গরবে
সুরভিত অভিরাম ॥

মায়ের আদেশ ॥ নূ রু জ্জা মা ন ফি রো জ

সে দিন সারা রাত ধরে
মা মনিটার হাত ধরে
ভেবেছিলাম আকাশ থেকে
আনবো সোনার চাঁদ ধরে।

মা ডেকে কন খোকন সোনা
চাঁদ মামাকে আর ডেকোনা

www.pathagar.com

চাঁদ হাসে ঐ দূর আকাশে
যায় না তাকে ধরা
পারলে লিখো চাঁদকে নিয়ে
একটি মজার ছড়া।

মুখ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করি মাকে
নিশূথ রাতে চাঁদ মামাটা কেমনে জেগে থাকে।

মা ডেকে কন খোকা
তুই দেখি এক বোকা
যার ইশারায় ফোটে হাজার
পুষ্প থোকা থোকা
তিনিই দিলেন চাঁদের হাসি
হাজার রকম ফুল
কুরআন হাতে পাঠিয়ে দিলেন
মুহাম্মদ রাসূল।
তাকে তোমার নিতে হবে চিনে
পুরো পুরি ঢুকতে হবে
আল্লাহ পাকের দ্বীনে।

মায়ের আদেশ
মানতে হলাম রাজী,
রাসূল পাকের
পথে আমার
জীবনটুকু বাজী।

মুহাম্মদ [সা] ॥ নি জা ম সি দ্দি কী

অতঃপর খুলে যায় দুয়ার দখিনা হাওয়ায়
অসীম জ্ঞানের গোলা তৃপ্তিতে যায় ভরে যায়
অশেষ হুঙ্কারে খেপে ওঠে সব শোষকের দল
জ্যোতিকে ঢাকিতে সবে সমবেত, করে কোলাহল।

অটল-অনড় তিনি আপন আপন কথা-কাজে
শোষিত-বঞ্চিত লোক সাজে এ কোন্ নতুন সাজে

www.pathagar.com

দিন যায় কষ্টে-ক্লেশে, যায় বছর অপাঙ্গ শেষে
অন্ধকার ছুটে যায় দূরে হেরার আলোর রেশে।

জমিনে প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম, ন্যায়ের প্রতীক
নারী-শিশু মূল্য পায় বেড়ে উঠে জীবনে অধিক
অজস্র কল্যাণে ভরে উঠে পৃথিবীর আলো-বায়ু
গভীর ভালোবাসার প্রাণরসে বেড়ে যায় আয়ু
আয় তোরা নাম শুন এ সুন্দর মানুষটির নাম
মুহাম্মদ নামে চিনে তারে সৃজিত এ ধরাধাম।

তাঁর দেখানো পথে ॥ গো লা ম ন বী পা ন্না

তাঁর জীবনের চলার পথে
আলোর জ্যোতি মেলে,
সারা জাহান আলোকিত
বাধার আঁধার ঠেলে।

সেই আলোতে আমরা সবাই
গতি পাবো ফিরে,
দোদুল্যমান তরী নিয়ে
ভিড়তে চা'বো তীরে।

কারণ হলো এ উম্মতের
ভুলে ভরা পথ,
তিনি নবী, আমরা হলাম–
তাঁর প্রিয় উম্মত।

তাঁর দেখানো পথে আছে
সরল সঠিক রেখা,
সেই রেখাতে মিলবে সবার
সফল আলো দেখা।

www.pathagar.com

নবী তায়েফ যায় ॥ শ ফি কু র র হ মা ন র ঞ্জু

সর্বনাশী
তায়েফবাসী
চিনলো নাকো নবী
অত্যাচারে
নবীর পরে
জুলুম করে সবি

দাঁড়িয়ে দূরে
পাথর ছুড়ে
কষ্ট দেবার ধারা
পাগল বলে
নানান ছলে
করতো মজা তারা
রক্ত ঝরে
পায়ে পরে
আটকে জুতা পায়
দাওয়া দিতে
সুপথ নিতে
নবী তায়েফ যায়
তায়েফ পাপী
পাহাড় চাপি
গজব দিতে লও
সুপথ নিবো
দাওয়া দিবো
মানুষ কোথা কও
এদের তরে
দরদ ভরে
দু'হাত তুলে নবী
ক্ষমা যাঁচে
খোদার কাছে
কী করুণার ছবি।

www.pathagar.com

আমাদের নবী ॥ মা লে ক মা হ মু দ

আরবের মেঠো পথে ধুলা বালি কণা
আঁধারে যে সাপগুলো ধরেছিলো ফণা।
বিষে বিষক্রিয়ায় কেঁপে উঠে পথ
মানুষের মনে ছিলো ভ্রান্তিক রথ।

ফুলে ফলে বলে কথা সূর্যকে দেখে
মানুষের মন যেন গেছে আজ বেঁকে
সূর্যের কিরণেই জাগো সরু চাঁদ
কমলের কমলতা বসুমতি হাট
হাট যেন হাট নয় নিষ্পাপ জমি
ফুলের পাপড়িতে জেগে উঠে মমি
মোমের যে মর্মতা আমাদের ছাদ।
সূর্যের কিরণেই হাসে মরুচাঁদ।

পাখিদের কলরব তাঁর কথা বলে
চাঁদ তারা জোসনায় থাকে এক দলে
গাছপালা নদী-নালা নতজানে মাতে
আমরাও হাসি দেই জোসনার রাতে।

দোল দোল দোলা দিয়ে জেগে উঠে রবি
আমেনা মায়ের কোলে আমাদের নবী।

ধর্ম ॥ জো না য়ে দ মা ন সু র

ডানা মেলে উড়তে পারা
স্বাধীনতার কর্ম
স্বাধীনতা রক্ষা করা
আজ মানুষের ধর্ম
স্বাধীনতা চাষার ছেলের
স্বাধীনতা মায়ের
স্বাধীনতা বাংলা গান আর
মাঝি মাল্লা নায়ের।

www.pathagar.com

নদীর কাছে আসি ॥ হা রু ন আ ল রা শি দ

আগে ছিলো ড্রইং রুমের
সাজানো ফুলদানি
এখন অনেক বেশি প্রিয়
দুধকমলের পানি।

যতই থাকুক কাজের তাড়া
মন হলে উদাসী,
সবকিছুকে ফেলে রেখে
নদীর কাছে আসি।

সৃষ্টি ধারার মূল ॥ না র্গি স চ ম ন

যাঁরই নামে এই ধরাতে
ফোটে হাজার ফুল
তাঁরই নামে গায় যে কোকিল
সৃষ্টি ধারার মূল।

তাঁরই নামে দোল খেয়ে যায়
আসমানের ঐ চাঁদ
ঝরণা ধারা উথলে পড়ে
মানে না যে বাঁধ।

সবার কাছে প্রিয় রাসূল
তাঁর কোন নেই ভুল
তাঁর নামে হন আল্লাহ খুশী
তিনিই সবার কূল।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ [সা.] ॥ জা লা ল খা ন ই উ সু ফী

আহ্মদ মোস্তফা রহ্মত বিশ্বের
শাফায়াত কান্ডারী পাপীতাপী নিঃস্বের।
আল্লার রহ্মত নিয়ে তিনি এসেছেন–
পাপীতাপী সব জীব-জাত ভাল বেসেছেন।

অবুঝের দ্বারে দ্বারে বারবার গিয়েছেন–
মনোনীত ধর্মের দাওয়াত দিয়েছেন।
পথহারা লোকদের ঠিক পথ দেখালেন
সত্য ও মিথ্যার ভেদাভেদ শেখালেন।

আল্লার সব সেরা প্রশংসাকারী সেই
তার মতো আল্লার প্রশংসাকারী নেই।
প্রশংসা করেছেন আল্লাহ্ নিজে যার
আল্লার পরে তিনি সমতুল নেই তাঁর।

তিনিও মানুষ তবে নবী ও রসূল শেষ
নবীজির শানে করি দরূদ সালাম পেশ।

প্রলয় ঘটানোর দায়িত্ব ॥ শা হ মু হা ম্ম দ মো শা হি দ

তপ্ত বালিতে ধূলিঝড়ের
প্রলয় ঘটানোর দায়িত্ব এখন আমাদের উপর

রবিউল আউয়ালের যে বার তারিখে
সূর্য ছড়িয়ে ছিলো কোমল আলো,
স্বচ্ছ পানির নিচে শৈবালের এ পাশ ওপাশ দুলে
নীরব হাসির মতো হেসেছিলো পৃথিবীর এপিঠ ওপিঠ
এবং স্বপ্নের বিক্ষিপ্ত সাদা কালো
রঙিন প্রাণের ছবি এঁকেছিলো পুণ্যবতীর মুঠোয়।

সে বার তারিখের ছটা চাপা পরে আছে
পনেরশ বছরের জমে উঠা বালির নিচে।

www.pathagar.com

শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ [সা]

মুহাম্মদ হামিদ হোসাইন আজাদ

১. পৃথিবী নামক গোল বৃত্তটি আজ বড় অশান্ত হয়ে পড়েছে। মানবতা বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, অপসংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক সয়লাভ আর অনৈতিকতার বিষাক্ত প্লাবন সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে যেন জাহান্নামের কুণ্ডলীতে পরিণত করেছে। ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, কাশ্মীর, সোমালিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিনাসহ সমগ্র বিশ্বে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিপীড়িত মানবতার করুণ আহাজারি সন্ত্রাস কবলিত নারী-পুরুষের গগণবিদারী আর্তনাদ পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলছে।

২. আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। তাওতো বিপর্যস্ত বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষতবিক্ষত একটি অংশ। এদেশের শিক্ষাংগনে শিক্ষা নেই- আছে লাশ আর রক্ত। বাণিজ্য অংগনে বাণিজ্য নেই- আছে অতি লোভ আর দস্যুতা। রাজপথে নিরাপত্তা নেই আছে সশস্ত্র খুনী হাইজ্যাকার। কারখানায় উৎপাদন নেই- আছে ধর্মঘট লে-অফ। কোথাও স্বস্তি নেই- সমৃদ্ধি নেই। তাই আজ বড় প্রয়োজন শান্তি ও স্থিতিশীলতা। কিন্তু শান্তি কোন পথে? স্থিতিশীলতা কিভাবে?

www.pathagar.com

৩. আজ থেকে পনের শত বছর পূর্বে এর চেয়েও কালো এক অধ্যায়ের মুখোমুখি হয়েছিলো মানবতা, মানবেতিহাসের সে অধ্যায় "আইয়ামে জাহেলিয়া" বা অন্ধকার যুগ হিসেবে কালো অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

৪. সেই সময় মরু পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত আরবজাতি ছিল দুর্ধর্ষ চরিত্রের অধিকারী। সংকীর্ণ গোত্রপ্রীতি ছিল তাদের চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তৃণভূমি, ঝর্ণা, পশু চারণ ইত্যাদি ছোট খাট বিষয় নিয়ে প্রায়শই গোত্রে গোত্রে সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।

অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা, অবাধ যৌনাচার, নারী নির্যাতন, নারী সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, দাস প্রথার নামে শোষণ নিপীড়ন, বণিকদের উপর হামলা, লুঠতরাজ, বেহায়াপনা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বর্বরতা ছিল আরব সমাজের নিত্যদিনের চিত্র।

৫. সেই কালে সারা দুনিয়া জুড়ে চলছিল দোর্দন্ড প্রতাপে রাজতন্ত্র। শক্তিধর রাজারা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতো অন্যায়ভাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো দখল করে। অতঃপর নিজ নিজ সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্রের স্টীম রোলার চালাতো রাজা সম্রাটরা। উদাহরণ স্বরূপ তৎকালীন ইরান সাম্রাজ্য ও ভারত সাম্রাজ্যের দুটি চিত্র এখানে তুলে ধরা যায়।

ইরান সাম্রাজ্যের মানুষ অভিজাত ও নীচু এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ, সেনানায়কগণ, আমাত্যবর্গ, বড় বড় জমিদার এবং ব্যবসায়ীগণ ছিলো অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক এবং দাসগণ ছিলো নীচু শ্রেণীর অন্তভুর্ক্ত। অভিজাত শ্রেণী বাস করতো সুরম্য অট্টালিকায়। নয়নাভিরাম ফোয়ারা, সুসজ্জিত গোসলখানা, ফুল-ফলের বিশাল বাগান এবং দাস-দাসী ও চাকরবাকরের আধিক্য তাদের আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করতো। অভিজাত্যের অন্যতম প্রতীক ছিলো কালো টুপি। কোন কোন ব্যক্তির টুপির দাম ছিলো এক লাখ দিরহাম, মূল্যবান মণিমুক্ত ছিলো তাদের টুপিতে। কেউ কেউ তাদের ঘোড়ার ক্ষুর সাজিয়ে নিতো মূল্যবান পাথর দিয়ে।

খৃষ্টীয় ৬০৭ সনে ইরানের সম্রাট দ্বিতীয় খসরু রাজধানী মাদাইন বা তেসিফোনে নবনির্মিত প্রাসাদে যাবার সময় যে স্বর্ণ স্থানান্তরিত করেন তার পরিমাণ ছিলো ৪৮৬ মিলিয়ন মিসকাল। রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বর্ষে তাঁর স্বর্ণের মওজুদ হয় ৮০০ মিলিয়ন মিসকাল। তাঁর মুকুট তৈরি হয়েছিলো দেড় মণ স্বর্ণ দিয়ে। ছাদ থেকে একটি মজবুত সরু শিকল ঝুলিয়ে তাতে বেঁধে সেই মুকুট সম্রাটের মাথার উপর রাখা হতো। ইরান সম্রাটের ছিলো এক বিশাল কার্পেট। এই কার্পেট দিয়ে প্রায় এক একর স্থান আবৃত করা যেতো। এতে ছিল বহু মণিমুক্ত দিয়ে তৈরি একটি বাগান চিত্র। ফুল ও ফলের গাছ ও ডাল তৈরি করা হয়েছিলো স্বর্ণ দিয়ে। পাতাগুলো তৈরি হয়েছিলো রেশমের সুতো দিয়ে। ফুলগুলো ছিলো স্বর্ণ ও রূপার। ফলগুলো ছিলো মণিমুক্তার। কার্পেটের চার ধারে যুক্ত ছিল হীরা খণ্ড। শরতকালে রাজকীয় মদপানের আসর বসতো এই

www.pathagar.com

জমকালো কার্পেটের উপর।

রাজকোষের অর্থের যোগান দিতো দেশের খেটে খাওয়া মানুষেরা। কৃষকদের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স বসানো হতো। করভারে জর্জরিত কৃষককুল চরম দারিদ্রে হাবুডুবু খেতো। করভার থেকে বাঁচার জন্য বহুকৃষক কৃষিকাজ পরিত্যাগ করে মন্দির ও মঠে আশ্রয় গ্রহণ করতো।

ইরানীদের নৈতিক চরিত্র এতই নিম্নমানের ছিলো যে, তারা মদপান করে উচ্ছৃংখল যৌনাচারে লিপ্ত হতো। মাজদাক নামক এক ব্যক্তি প্রচার করে যে, সকলের অধিকার রয়েছে অন্যান্য সকল ব্যক্তির সম্পদ ভোগ করার। তেমনিভাবে সকল নারীর সকল পুরুষের সাথে এবং সকল পুরুষের সকল নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সমান অধিকার রয়েছে। সম্রাট কোষাদ এই মতবাদের পৃষ্টপোষকতা করায় সারা দেশে যৌন উচ্ছৃংখলতার সয়লাব বয়ে যায়। খসরু পারভেজের প্রাসাদে তার যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য রক্ষিত ছিলো বার হাজার নারী।

৬. ভারত সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিলো আরো লোমহর্ষক, হৃদয় বিদারক ও বিস্ময়কর।

তৎকালীন ভারত সাম্রাজ্যে আর্যগণ নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য বর্ণ বা গায়ের রং এর ভিত্তিতে বর্ণভেদ প্রথা চালু করে। বর্ণভেদ প্রথা অনুযায়ী মানুষ চারভাগে বিভক্ত। যথা– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। 'দাস্য' গণই শুদ্র নামে আখ্যায়িত হয়। প্রথমোক্ত তিন বর্ণের লোকদের সেবা করাই শূদ্রদের কাজ, ধর্মগ্রন্থ পড়ার অধিকার ছিলো না শূদ্রদের। তারা অন্য কোন বর্ণের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতো না। অন্য বর্ণের লোকদের স্পর্শ করার অধিকারও ছিলোনা তাদের।

মনু স্মৃতিতে রয়েছে, "ব্রাহ্মণদের সেবা করাতেই শূদ্রদের সন্তোষ। এর জন্য কোন মজুরী বা পুরস্কারের প্রয়োজন নেই। তারা সম্পদ সংগ্রহও মজুদ করবে না কারণ এতে ব্রাহ্মণ দুঃখ পাবেন। কোন শূদ্র যদি কোন ব্রাহ্মণকে আঘাত করতে হাত বাড়ায় তবে শাস্তি হিসেবে তার হাত কাটা যাবে। রাগের অবস্থায় যদি ব্রাহ্মণকে লাথি মেরে থাকে তবে পা কাটা যাবে। যদি সে ব্রাহ্মণের সাথে বসে তাহলে রাজা তাকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেবেন। কোন ব্রাহ্মণকে গালি দিলে তার জিহ্বা উপড়িয়ে ফেলা হবে। সে যদি কোন ব্রাহ্মণের সাথে পরিচিত বলে দাবী করে তাহলে তাকে গরম তৈল পান করানো হবে। কোন শূদ্র নিহত হলে তার ক্ষতির পরিমাণ একটা কুকুর বা বিড়াল হত্যার ক্ষতি পূরণের সমান হবে।

ভারতের নারীরা ছিলো দুর্গত। পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাদের কোন অংশ স্বীকৃত ছিল না। স্বামী মারা গেলে তাদের চির বৈধব্য বরণ করতে হতো। কোন অবস্থাতেই আর বিয়ে করতে পারতো না। তখন তারা স্বামীর ভাই বা অন্যদের দাসীর মতই জীবন-যাপন করতো। অনেক নারী ভবিষ্যত দুর্গতির কথা চিন্তা করে এবং সমাজ প্রথাকে মেনে নিয়ে মৃত স্বামীর চিতায় দগ্ধ হয়ে প্রাণ দিতো। একে বলা হতো সতীদাহ। ভারতে তখন ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, অরুণ, বরু ইত্যাদি অসংখ্য কল্পিত দেব-দেবীর পূজা অর্চনা

www.pathagar.com

করা হতো। কল্পিত দেবতা শিবের যৌনাংগের পূজা করতেও মানুষ দ্বিধান্বিত হতো না। সাম্রাজ্যের রাজা প্রজাদের উপর নানাভাবে শোষণ নির্যাতন চালাতো। রাজারা ছিল প্রজাদের দন্ডমুন্ডের মালিক। প্রজাগণকে নীরবে হজম করতে হতো এদের সকল দুঃশমনী। এমনিভাবে সে যুগে আরবসহ সারা দুনিয়ায় বিরাজ করছিলো চরম অশান্তি, সীমাহীন বৈষম্য, বিভীষিকাময় শোষণ ও নিপীড়ন। স্বস্তি ও স্থিতিশীলতার বালাই ছিলো না কোথাও।

৭. দুনিয়া জোড়া যখন এই শিরকের প্লাবন, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য, অপসংস্কৃতির বিষাক্ত প্লাবন, নারীত্বে অবমাননা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার সর্বগ্রাসী সয়লাব, দাসত্বের শৃংখল এবং ধর্মীয় বিকৃতির অশুভ পরিণাম আদম সন্তানদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিলো, যখন সমগ্র পৃথিবী সুচিবেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঠিক এমনি সময়ে গাঢ় অমানিশার বুক চিরে মহামুক্তির জ্যোতির্ময় আলো নিয়ে এ ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হন মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ [সা]।

৮. মুহাম্মাদ [সা] জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারান। ৬ বছর বয়সে মাকে হারান। অতঃপর প্রথমে দাদা আবদুল মুত্তালিব ও পরে চাচা আবু তালিবের সাহচর্যে তিনি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন। বয়োবৃদ্ধির পর থেকেই একদিকে আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি সুষমা অপরদিকে চারপার্শ্বের শিরক মিশ্রিত বিষাক্ত সামাজিক পরিবেশ তাঁকে চরমভাবে ভাবিয়ে তোলে। মাঝে মধ্যে তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে যেতেন কিশোর বয়সেই। বয়স যতই বাড়তে থাকে অসাম্য, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং অংশীবাদিতার বিরুদ্ধে তাঁর হৃদয় মন ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে। চাচার সাথে এক সফরে থাকাবস্থায় খৃস্টান ধর্মীয় নেতা বাহিরা বার বছরের বালক মুহাম্মাদ [সা]-কে দেখেন। বাহিরা তাঁকে দেখেই বুঝেন যে, এ এক অসাধারণ বালক। তিনি এগিয়ে এসে মুহাম্মাদ-কে [সা] বলেন "ওহে বালক, আমি তোমাকে লাত ও উযযার কসম দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলছি।" মুহাম্মাদ [সা] বললেন, "আল্লাহর কসম আমাকে লাত ও উযযার কসম দিয়ে কিছু বলবেন না। ও দু'টোর চেয়ে আর কিছুই আমার কাছে বেশী ঘৃণিত নয়।" তারপর 'আল্লাহর কসম' দিয়ে বাহিরা প্রশ্ন করলে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন।

৯. অন্যায় ও অসত্যের প্রতি চরমঘৃণা, ন্যায় ও সত্যের ব্যাপারে আপোষহীণতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, ইনসাফ পরায়নতা ইত্যাদি বিরল গুণের অপূর্ব সমাবেশ অতি অল্প বয়সেই মুহাম্মাদ [সা]কে তাঁর সমাজে আল আমিন [বিশ্বাসী], আস সাদেক [সত্যবাদী] হিসেব প্রতিষ্ঠিত করে। সামাজিক অশান্তি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ক্রমেই প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী হয়ে উঠেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে হযরত [সা] সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং যুলুম ও অন্যায় প্রতিরোধের জন্য "হিলফুল ফুজুল" নামক কল্যাণ সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিম্নোক্ত দফা বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

১. আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।

২. আমরা পথিকবৃন্দের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো।

www.pathagar.com

৩. আমরা অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবো।

৪. আমরা মযলুমের সাহায্য করবো এবং

৫. আমরা কোন যালিম ব্যক্তিকে মক্কায় আশ্রয় দেবো না।

এমনিভাবে জুলুম নিপীড়ন ও অশান্তিতে অস্থির সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে অল্প বয়সেই সমাজ সংস্কার ও সেবার আদর্শ স্থাপন করেন যুবক মুহাম্মাদ [সা]। খানিকটা স্বস্তি ফিরে আসলো হিলফুল ফুজুলের ভূমিকায়। তবে এর দ্বারা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

১০. চল্লিশ বছর বয়সে মুহাম্মাদ [সা] নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। অতঃপর শুরু হয় কুসংস্কারাচ্ছান্ন ও অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলন।

ক. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা : স্বার্থবাদী নেতৃত্বের অবসান

নবুয়্যত প্রাপ্তির পর সংস্কার আন্দোলনের সূচনাতেই রাসূলুল্লাহ [সা] সমস্যার মূলে আঘাত হানেন। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব এবং অসংখ্য দেব-দেবীর পূজার মূল্যোৎপাটন করে তিনি আল্লাহর নির্দেশ ঘোষণা করলেন–

– বলো আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এতে তোমাদের কল্যাণ নিহিত।

– হে মানবজাতি তোমরা সে রবের দাসত্ব কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।

– আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর রাসূল।

এমনিভাবে অসংখ্য দেবতার পূজা বাদ দিয়ে এক আল্লাহর এবাদত করার জন্য মানবজাতিকে আহ্বান জানান। একই সাথে কায়েমী স্বার্থবাদী নেতৃত্বের নিগঢ়মুক্ত হয়ে তাঁর নেতৃত্বে মহামুক্তির মহান মনযিলে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

খ. দাসত্বের শৃংখল থেকে মানবতার মুক্তি

এ মহান আহ্বানের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় কায়েমী স্বার্থবাদী মানব প্রভু কাফির মুশরিকদের মাঝে। ওরা মরিয়া হয়ে উঠে মুহাম্মাদ [সা]-কে এ আহ্বান তথা মিশন থেকে নিবৃত করার জন্য। প্রথমে লোভ অতঃপর ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, হত্যা প্রচেষ্টা, কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তাঁর মহান মিশন থেকে মুহূর্তের তরে নিবৃত করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহর [সা] অনুসারী তথা মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রাও দিন দিন বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ [সা] মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন।

এমনিভাবে ধৈর্য্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সাথে সকল অবস্থার বীরোচিত মুকাবেলা করে অবশেষে মদীনায় কায়েম করলেন ইসলামী রাষ্ট্র। অতঃপর মহান আল্লাহর সেই ঘোষণার বাস্তব রূপায়ণ করলেন–

"আল্লাহর এই সৃষ্টি রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই, এ ব্যাপারে কেউই তাঁর

www.pathagar.com

শরীক নয়।"

"প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব এবং আইন রচনায় মৌলিক এবং চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র আল্লাহর।"

মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বকে উৎখাত করে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দাসত্বের শৃংখল থেকে মানবতাকে মুক্ত করলেন হযরত [সা]।

১১. ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

মদীনার স্বাধীন রাষ্ট্রে মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল [সা] আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। ফলে সুদূর মক্কা থেকে আসা ছিন্নমূল মুহাজিরগণ আপন ভাইয়ের সাথে আপন বাসভুমে অবস্থানের মতই আনসারদের সাথে বসবাস করতে শুরু কলেন।

রাসূলুল্লাহর আদর্শ আল ইসলামের বদৌলতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে এমন সৌহার্দপূর্ণ ও অভাবিতপূর্ব সুগভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল যে, তাঁরা একে অপরের সুখে-দুঃখে অংশীদার হতে শুরু করলেন। তাঁরা একে অপরের ব্যথায় ব্যথিত– অপরের আনন্দে আনন্দিত। প্রত্যেকে যেন একই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

বিশ্বব্যাপী অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ভ্রাতৃত্বের Model ঘোষণা করলেন–

"প্রত্যেক মুমিন পরস্পর ভাই ভাই।"

রাসূলুল্লাহ [সা] মানব সমাজে বিশেষতঃ ইসলামী সমাজে সামাজিক ভিত্তিকে মজবুত করার লক্ষ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করার স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন। এলক্ষ্যে তিনি ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করেন। হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত, চোগলখুরি ইত্যাদি সম্পর্ক বিনষ্টকারী কার্যকলাপগুলো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেন।

অপর দিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিশুদ্ধির জন্য এহতেসাবের [গঠনমূলক সমালোচনা] System চালু করেন। মুমিনদেরকে একে অপরকে ভালবাসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মুমিনদের পারস্পরিক ভালবাসাকে আল্লাহ ও রাসূলকে পাওয়ার এবং ঈমানকে পূর্ণ করার শর্ত হিসেবে আরোপ করেন। রাসূলুল্লাহ [সা] ঘোষণা করলেন–

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসলো আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করলো... সে তার ঈমানকে পূর্ণ করলো।" –আল হাদীস

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ [সা] হিংসা, হানাহানি, সংঘাত, সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসে পরিপূর্ণ একটি সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার এক অপরূপ ধারা সৃষ্টি করে এক শান্তিপূর্ণ অনাবিল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১২. হত্যা নির্যাতন নিষিদ্ধ, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত

রাসূলুল্লাহ [সা] মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেই মদীনা সনদ (Chartar of Medina)

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন। ঘোষণায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন–

"খোদাভীরু মুমিনগণ তাদের মধ্যকার বিদ্রোহী, জঘন্য নির্যাতক, অপরাধী, মুসলিম সমাজের স্বার্থের ক্ষতিকারক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে এবং এই ধরনের অপরাধীর বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ নেবে। চাই সে তাদের কারো ছেলেই হউক না কেন।

কোন কাফিরের স্বার্থে এক মুমিন অপর মুমিনকে হত্যা করবে না এবং কোন কাফিরকে কোন মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

মুসলিম রাষ্ট্রে অনুগত অমুসলিমদের অধিকার সমানভাবে নিরাপদ। একজন নগণ্যতম অমুসলিমকেও মুসলিমগণ পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দেবে। মুমিনগণ পরস্পরের মিত্র হয়ে থাকবে।–

আর ইহুদীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমাদের (ইসলামী রাষ্ট্রের) আনুগত্য ও অনুসরণ করে সে সমান অধিকার ও সাহায্য লাভ করবে। এই ধরনের লোকদের উপর কোন যুলুম চলতে দেয়া হবে না। তাদের উপর কাউকে হামলা চালাতে সাহায্য করা হবে না। মুমিনদের রক্ষাকবচ সবার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন।"

"যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ না করা সত্বেও হত্যা করবে এবং তা যথাযথভাবে প্রমাণিত হবে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে অন্য কোন উপায়ে খুশী করে থাকলে প্রাণদণ্ড হবে না। তবে সর্বাবস্থায় মুমিনগণ ঐ মুসলিম হন্তার বিরুদ্ধে থাকবে এবং তার পক্ষপাতিত্ব করা কোন মুমিনের পক্ষে হালাল হবে না।"

মদীনা সনদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ [সা] হত্যা, নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেন, সকল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করেন। চোরের হাত কাটা সহ হাইজ্যাক লুঠতরাজের কঠোর শাস্তি বিধানের মাধ্যমে এসব বিষাক্ত ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করেন এবং জনজীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও শংকামুক্ত করেন।

১৩. নারীর মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং যিনা ব্যভিচার এর মূলোৎপাটন

যে নারী দাসী ও ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যে নারী অবহেলা, ঘৃণা ও ভর্ৎসনার পাত্রী ছিল, রাসূলুল্লাহ [সা] সে নারীকে মা ও বোনের মর্যাদা দিয়ে অতি উঁচু মর্যাদার আসনে আসীন করেন। তিনি ঘোষণা করলেন–

মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত। –আল হাদীস

মায়ের সাথে উত্তম ব্যবহারকে অপরিহার্য করে দিয়ে রাসূল [সা] নারী সমাজকে মর্যাদার প্রতীকরূপে স্বীকৃতি দেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়– "কার সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে?" রাসূল [সা] বলেন– তোমার মায়ের সাথে। তারপর? তোমার মায়ের

www.pathagar.com

সাথে। তারপর? তোমার মায়ের সাথে। তারপর? তোমার পিতার সাথে।

নারী পুরুষের বিবাহকে অপরিহার্য করে এবং পিতা-মাতা ও স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে রাসূলুল্লাহ [সা] অবলা নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

একদিকে বিবাহ প্রথার প্রচলন অপরদিকে যিনার অপরাধে ছংগে ছার এর কঠোর শাস্তি র বিধান আরোপ করে রাসূলুল্লাহ [সা] সমাজ থেকে যিনা ব্যভিচার ও নারী নির্যাতনকে মূলোৎপাটিত করেন।

১৪. শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন

কল-কারখানা ও উৎপাদনযন্ত্রে শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণ ও শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে রাসূলুল্লাহ [সা] স্পষ্ট ঘোষণা করেন–

"শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তার মজুরী দিয়ে দাও।" –আল-হাদীস।

তিনি শ্রম ও উৎপাদন কার্যে উৎসাহিত করার জন্য নিজে কাঠ কেটে বিক্রি করেছেন।

তিনি নিজে ব্যবসা করেছেন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছেন। একই সাথে অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। অপরদিকে যাকাত ও সদকা দান প্রক্রিয়া চালু করে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করেন। দূর্নীতির সকল পথ বন্ধ করে নিষ্কলুষ লেনদেনের নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। এসব প্রসঙ্গে আল্লাহ ও রাসূলের [সা] নিম্নোক্ত ঘোষণাসমূহ প্রণিধানযোগ্য :

"আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন, ব্যবসাকে করেছেন হালাল" –আল-কুরআন।

"সুদ এমন একটি বিরাট গুনাহ যে, একে সত্তরটি ভাগে বিভক্ত করলে তার সবচাইতে হালকা অংশটিও নিজের মায়ের সাথে যিনা করার গুনাহের শামিল।" ইবনে মাজাহ, বায়হাকী।

–"ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়েই জাহান্নামী।" –আল হাদীস

এসব বিধি-বিধান কার্যকর করে রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রকে এতটুকু সমৃদ্ধ ও নিষ্কলুষ রূপে গড়ে তুলেন যে পরবর্তীতে তাঁর রাষ্ট্রে যাকাত নেয়ার মতো কোন দরিদ্র লোক ছিলেন না।

১৫. চরিত্র জ্ঞান ও ন্যায়ের উৎকর্ষ সাধন

সর্বোপরি মুহাম্মাদ [সা] নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ দিয়েছেন। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন– "নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।" –মুয়াত্তা ইমাম মালিক

অতঃপর মানব মন্ডলীকে নৈতিক চরিত্রে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য তিনি ঘোষণা করেন–

www.pathagar.com

"ঈমানদার লোকদের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ সেই হতে পারে যে তাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সকলের অপেক্ষা উত্তম।"

আবু দাউদ, দারেমী অপর এক হাদীসে রাসূল [সা] বলেন– "একজন মুমিন ব্যক্তি তার নৈতিক চরিত্রের সাহায্যে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে যে সারা দিন নফল রোযা রাখে আর সারারাত নফল নামায পড়ে।" আবু দাউদ

জ্ঞানের জগতে রাসূল [সা] শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর উম্মতগণকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।" –ইবনে মাজাহ।

তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। জ্ঞানকে কল্যাণের মূল হিসেবে আখ্যায়িত করে রাসূল [সা] বলেন– "আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দিতে চান তাকে দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সময় দান করেন।" –মুসনাদে আহমদ

এভাবে জ্ঞান ও চরিত্র বিকাশে উৎসাহিত করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ [সা] অসভ্য বর্বর আরবকে একটি সুসভ্য জ্ঞান সমৃদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত করেন। এর পাশাপাশি তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তার অনুসারীদের জন্যেও এ কাজকে অপরিহার্য করে ঘোষণা করেন– 'তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে অন্যায় হতে লোকদের নিষেধ করবে– লোকদের বিরত রাখবে।"– মুসনাদে আহমদ।

তিনি কেউ অন্যায় করতে দেখলে তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়া, তা না পারলে মুখ দ্বারা বাধা দেওয়া, তাও সম্ভব না হলে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করার (তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়) জন্য তার উম্মতগণকে তাগিদ দিয়ে সমাজে সকল অন্যায়ের পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন।

তাই আরব সমাজ অচিরেই একটি জ্ঞান সমৃদ্ধ সুসভ্য সমাজরূপে গড়ে উঠার সাথে সাথে একটি ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৬. উপসংহার :

রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ [সা]। তাঁর জীবনেই রয়েছে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। সেই আদর্শ দীপ্যমান তাঁর প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি চেতনায়, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি পদক্ষেপে। নীল আকাশে উজ্জ্বল তারকার মতো সেই আদর্শ ঝিকমিক করছে তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিক ও বিভাগে। ঝর্ণার মতো প্রতীয়মান সেই অমিত আদর্শ তাঁর প্রতিটি কর্মধারায়। রাসূলুল্লাহর [সা] সেই নিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ তেজস্বী ধারায় কায়েম হলো আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান, একটি ইসলামী রাষ্ট্র। খোদার

www.pathagar.com

বিধান মুখরিত হলো। দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি পেলো মানবতা। অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক পেলো তার ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা। সম্ভ্রমহারা অবলা নারী পেলো তার ইজ্জত ও অধিকারের নিশ্চয়তা।

জুলুমে ভরপুর সমাজ হয়ে গেলো ইনসাফের লীলাভূমি অন্যায়ের পংকে নিমজ্জিত সমাজে কায়েম হলো ন্যায়ের বিধান। অশান্ত দুনিয়ার চারিদিকে প্রবাহিত হলো শান্তির ফল্গুধারা। কি অপূর্ব সে আদর্শ! কি অনাবিল সেই শান্তি!!

কি সুন্দর সে সমাজ!!

অচিরেই সানা থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত কোন সুন্দরী রমণী একা একা হেঁটে চললো অথচ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ভয় তার মনকে শংকিত করলো না। সত্যিই মহান সে আদর্শ।

বিংশ শতাব্দীতে মানবতা শান্তি ও মুক্তির জন্য অসংখ্য মতবাদের দ্বারস্থ হয়েছে। বহু আদর্শ বা মতবাদের Practice- ও হয়েছে এই ধুলিধরায়। কিন্তু কোন মতবাদ শান্তি দিতে পারেনি। দেখাতে পারেনি মুক্তির রাজপথ। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অধঃপতন আর বিপর্যয়ই মানব রচিত মতবাদসমূহের নির্মম উপহার। অতএব মানব সভ্যতার এ ক্রান্তিলগ্নে একথা স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রমাণিত যে, বিপর্যস্ত এ পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল [সা] প্রদর্শিত জীবনাদর্শ আল ইসলামই স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

–আল কুরআন

তথ্যপঞ্জি

মহানবী- আবদুল হামিদ আল খতিব

বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা

মহানবীর মহান আন্দোলন- এ.কে.এম. নাজির আহমদ

রিয়াদুস সালেহীন- প্রথম খণ্ড

হাদীস শরীফ- ১ম খণ্ড

পরিবার ও পারিবারিক জীবন- মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

www.pathagar.com

সীরাত চর্চার ইতিবৃত্ত

নাসির হেলাল

■

'সীরাত' একটি আরবী শব্দ। এ শব্দের বহুবচন হচ্ছে 'সিয়ার'। এটির মূল শব্দ হচ্ছে 'সাইরুন'। এর অর্থ চাল-চলন, গতি ইত্যাদি।

'আল মুজাম আল আজম' ও 'মিসবাহুল লুগাত' নামক বিখ্যাত দু'টি আরবী অভিধানে 'সীরাত' শব্দের অর্থ করা হয়েছে–

১. যাওয়া, প্রস্থান করা, চলা; ২. গতি, পথ, পদ্ধতি, ধারা; ৩. আকার, আকৃতি, মুখবাবয়ব; ৪. চেহারা, আকৃতি; ৫. অবস্থা, ৬. কর্ম-নৈপুণ্য, ঢঙ, চাল; ৭. সুন্নাত, ৮. জীবন চলার ধরন, প্রকৃতি, কাজ-কর্ম করার ধরন, জীবন পরিচালনা, ঢঙ; ৯. অভ্যাস; ১০. কাহিনী, পূর্ববর্তীদের গল্প বা কাহিনী এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা ইত্যাদি।

অপরদিকে ইসলামী বিশ্বকোষ 'সীরাত'-এর অর্থ লিখেছে–

১. যাওয়া, যাত্রা করা, চলা; ২. মাযহাব বা তরিকা; ৩. সুন্নাহ; ৪. আকৃতি; ৫. কীর্তি; ৭. কাহিনী, প্রাচীনদের জীবন ও ঘটনাবলীর বর্ণনা; ৮. মুহাম্মদ [সা]-এর গাযওয়ার [যুদ্ধের] বর্ণনা; ৯. অ-মুসলিমগণের সাথে সম্পর্ক, যুদ্ধ এবং শান্তির সময়ে মুহাম্মদ [সা] যা বৈধ বা অবৈধ মনে করতেন তার বর্ণনা কিংবা মুহাম্মদ [সা]-এর জীবন চরিত; সম্প্রসারিত অর্থে বীর পুরুষদের কীর্তির বর্ণনা।

পবিত্র কুরআন মজীদে 'সীরাত' শব্দটি শুধুমাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা তাহা'র ঐ আয়াতে বলা হয়েছে– 'খুয হা ওয়ালা তাখাফা' সান ইদুহা সীরাতাহাল উলা।' অর্থাৎ 'তুমি তাকে ধর এবং ভয় পেয়োনা। আমি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব, যেরূপ প্রথমে এটি ছিল।' এখানে 'সীরাত' শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মোটকথা 'সীরাত'-এর

www.pathagar.com

আভিধানিক অর্থ হলো, কোন ভাল মানুষের বা নেককার মানুষের চাল-চলন, উঠাবসা, কাজ, মেজাজ-মর্জি। এক কথায় জীবন পদ্ধতি বা জীবন চরিত।

আর 'সীরাত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ বোঝান হয়েছে মহানবী [সা]-এর সার্বিক জীবন চরিতকে। রাসূল [সা]-এর বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থগুলোর নামের সাথে এই 'সীরাত' শব্দটি সম্পৃক্ত দেখা যায়। যেমন– সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাতে হালবিয়া, সীরাতে রাসূল, সীরাতে মুগলা তোয়াই, সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, সীরাতে সারওয়ারে আলম, সীরাতে মুহাম্মদীয়া, সীরাতে মুবারক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ [সা], সীরাতে মুহসীনে কায়েনাত [সা], সীরাতুন্নবী, সীরাতে মোস্তফা প্রভৃতি।

সীরাত চর্চায় সাধারণত– কুরআন, হাদীস, মাগাযী গ্রন্থাবলী, রাসূল [সা]-কে নিবেদিত কবিতা, প্রাচীন ইতিহাসমূলক গ্রন্থাবলী [যেমন মক্কা-মদীনার ইতিহাস], সাহাবীদের শামায়েল প্রভৃতি সহায়ক হিসেবে বিবেচিত।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় রাসূল [সা] সম্বন্ধে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য আছে। অন্যদিকে হাদীসে রাসূল [সা] জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের খুঁটি-নাটি কথা পর্যন্ত রয়েছে। রাসূল [সা]-এর সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীগণ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন [অবশ্য এসব কাজ ছিল বিচ্ছিন্ন, অগোছালো] তারা হলেন– উরওয়া ইবনে যুবায়ের [জ. ২৩- মৃ. ৯৪ হি.], আবান ইবন উসমান [জ. ২০- মৃ. ১০৫ হি.], ইমাম শা'বী [মৃ. ১০৯ হি.], ওয়াহাব ইবন মুনাব্বাহ [মৃ. ১১০ হি.], আসিম ইবন্ ওমর [মৃ. ১২১ হি.], শুরাহবিল ইবন্ সাদ [মৃ. ১২৩ হি.], ইবন শিহাব যুহরী [জ. ৫১- মৃ. ১২৪ হি.], আবদুল্লাহ বিন আবু বকর [মৃ. ১৩০ হি.], মূসা ইবন উকবা [মৃ. ১৪১ হি.], হিশাম ইবন উরওয়া [মৃ. ১৪৬ হি.], আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্ ইসহাক [জ. ৮৫- মৃ. ১৫১ হি.] প্রমুখ।

ইসলামের ৫ম খলীফা হযরত উমার ইবন আবদুল আযীযের পরামর্শক্রমে রাসূল [সা]-এর ওফাতের পঁচাশি বছর পর ইমাম শিহাব আল যুহরী [জ. ৫১- মৃ. ১২৪] সীরাত চর্চা শুরু করেন। তিনি যে সংক্ষিপ্ত জীবনীটি রচনা করেন এটি সীরাত বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ, যা বহুকাল পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শিহাব যুহরীর প্রিয় শিষ্য মূসা ইবনে উকবা [মৃ. ১৪১ হি.] দ্বিতীয় সীরাত গ্রন্থটি রচনা করেন কিন্তু এ গ্রন্থটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর শিহাব যুহরীর আরও কয়েকজন ছাত্র– ইবন ইসহাক, উমার ইবন রাশেদ, আবদুর রহমান ইবন্ আবদুল আযীয, ইবন সালেহ প্রমুখগণও সীরাত গ্রন্থ রচনা করেন।

তবে প্রথম সারীতকার হিসেবে বর্তমান বিশ্বে যাঁর নামটি সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন ইবন্ ইসহাক [জ. ৮৫- মৃ. ১৫১ হি.]। রাসূল [সা]-এর ওফাতের মাত্র ৭৪ বছর পর মদীনায় জন্মগ্রহণকারী ইবন ইসহাকের রচিত 'সীরাতু রাসূলিল্লাহ' সীরাত বিষয়ক সর্বাধিক প্রাচীনতম এবং পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ।

এরপর ইবন হিশাম তাঁর পূর্বসূরী ইবন ইসহাক রচিত 'সীরাতু রাসূলিল্লাহ' নামক গ্রন্থটির সংশোধিত, পরিমার্জিত রূপ দিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে 'সীরাতে নবুবিয়্যা' নামে প্রকাশ করেন

www.pathagar.com

যা সীরাতে ইবন হিশাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজ পর্যন্ত এ গ্রন্থটি প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থ হিসাবে সর্বাধিক সমাদৃত।

এছাড়া যিয়াদ ইবন আবদুল্লাহ আল বুকাই [মৃ. ১৮৩ হি.], মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ মাদায়েনী [জ. ১৩৫- মৃ. ২৫৫ হি.], মুহাম্মদ বিন আমর আল ওয়াকিদী [জ. ১৩০- মৃ. ২০৭ হি.] প্রমুখও সীরাত গ্রন্থ রচনা করে নিজেদেরকে খ্যাতিমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এরপর যাঁরা সীরাত গ্রন্থ রচনা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইবন হাজার, ইবন খাল্লিকান, ইবন সা'দ আল যুহরী, [জ. ১৬৮- মৃ. ২৩০ হি.], হাফিয যাহাবী মুহাম্মদ ইবন আল কাতিব, জালালুদ্দিন সুয়ূতী, আল বালাজুরী প্রমুখ। ইবন্ হিশামের পর মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ আয যুহরী সমধিক প্রসিদ্ধ। নির্ভরযোগ্যতায় তিনি আল-ওয়াকিদী'র চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি অমর হয়ে আছেন 'কিতাবুত তাবাকাত' নামক ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল সীরাত গ্রন্থটির জন্য।

এভাবে সীরাত চর্চার ধারা যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে। এ ক্ষেত্রে উপমহাদেশের লেখকগণও পিছিয়ে থাকেননি, তারাও সীরাতকার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এঁরা হলেন- আল্লামা শিবলী নোমানী [১৮৫৭-১৯১৪], সাইয়েদ সুলায়মান নদভী [১৮৮৪-১৯৫৩], কারী মোহাম্মদ তৈয়ব দেওবন্দী [জ. ১৩১৫ হি.] কারামত আলী জৌনপুরী [১২১৫-১২৯০ হি.], আমানুল্লাহ আজীমাবাদী [মৃ. ১৮১৭ খৃ.], আল্লামা আযাদ সুবহানী, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী [১৯০৩-১৯৭৯], মুফতী মুহাম্মদ শফী [১৮৯৭-১৯৭৬], মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ [১৮৬৮-১৯৬৮], ওবায়দুল হক সিলেটী [১৯২৮], কবি গোলাম মোস্তফা [১৮৯৭-১৯৬৪], এয়াকুব আলী চৌধুরী [১৮৮৬-১৯৪০], মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী [১৮৯৬-১৯৫৪], কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬], কবি ফররুখ আহমদ [১৯১৮-১৯৭৪], সৈয়দ আমীর আলী [১৮৪৯-১৯২৯], আবদুল আযীয আল আমান, [১৯৩২-১৯৯৪], আবুল হাসান আলী নদভী [১৯১৪-১৯৯১], কবি আল মাহমুদ [১৯৩৬], মাওলানা তফাজ্জল হোসাইন [১৯০৫-১৯৯৫], কবি নূরুল হুদা প্রমুখ।

এক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবীরা ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে অন্তত ৫০ [পঞ্চাশ] টির মত সীরাত বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ তাঁরা রচনা করেন। সেগুলো হল- রসূল বিজয়-জৈন উদ্দীন [১৩৭১-১৪৮১ খৃ.], রসূল বিজয়-শাহ বিরিদ খাঁ [১৫১৭-১৫৮৫ খৃ.], ওফাত-ইল রসূল, রসূল বিজয়, শবে মে'রাজ, রসূল চরিত, নবী বংশ, জয় কুমার রাজার লড়াই-সৈয়দ সুলতান [১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.], নূরনামা-শায়খ পরাণ [১৫৫০-১৬১৬ খৃ.], নূরকন্দিল বা নূরনামা-মীর মুহম্মদ শফী [১৫৫৯-১৬৩০ খৃ.], জঙ্গনামা-নসরুল্লা খাঁ [১৫৬০-১৬৪৫ খৃ.], রসূল বিজয়-শেখ চাঁদ [১৫৬০-১৬২৫], নূরনামা, রসূল বিজয়-আবদুল হাকিম [১৬২০-১৬৯০ খৃ.], নূরনামা-মুহাম্মদ খান [সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের একজন বিশিষ্ট মুসলিম কবি], নবী নামা-কাজী হেয়াত মামুদ [১৬৮০-১৭৬৩ খৃ.], নূরনামা-আবদুল করিম

www.pathagar.com

খন্দকার [১৭ শতক], নবীনামা-ফকির চান্দ [১৮ শতক], নবী নামা, নবী বংশ, দুল্লা মজলিস-ব্রাহানুল্লা [১৮ শতক), রসূল বিজয় ও ওফাত নামা-গোলাম রসূল [১৮ শতক], রসূল চরিত-মুহাম্মদ জমি, অভ্যুদয় আবির্ভাব শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ [সা], আবদুল হামিদ কাব্য বিনোদ [১৯ শতক], নবীনামা-মুন্সী আবদুর রহীম [মৃ. ১৯১৩], সাইয়েদুল মোমেনীন-মোঃ জহির উদ্দীন [১৯ শতক], খায়ের বরকত [নবীজীর জন্ম বৃত্তান্ত]-আবদুল গফুর [১৯ শতক], আহকামোন নবী-নবী নওজয়াজ খাঁ [১৯ শতক], হাজার মছেলা [প্রশ্নোত্তরে নবী জীবনী], আবদুল্লাহ্ বিন ছালাম [১৯ শতক], নূরে মোহম্মদী-দুদ্দু শাহ [দবির উদ্দীন মল্লিক-১৮৪১, ১৯১৯], হযরতের ধর্মরাজ্য জয়-কলিম উদ্দীন মাস্টার [১৯ শতক], কলমদারের জঙ্গনামা-মীর মনুহর [১৯ শতক], জঙ্গে খয়বর-মালে মোহাম্মদ [১৯ শতক], তরিকায়ে মোস্তফা-মুন্সী ফসিহ্ উদ্দীন [১৯ শতক], নূরনামা-দেবান আলী, জঙ্গে খয়বর-দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী, জঙ্গে খয়বর-মুন্সী জনাব আলী, রসূলের মেরাজ-কবি ফৈজুদ্দীন [১৮ শতক], মেহরাজ নামা-শাহ্ জোবেদ আলী, ছহিবড় জঙ্গে রসূল ও জঙ্গে আলী, জঙ্গে ওহুদ ও জঙ্গে আলী-মৌলভী আজহার আলী বখতিয়ারী, কেরামতে আহমদ-মৌলভী আবদুস সোবহান, রসূল বিজয়-আকিল মোহাম্মদ, রসূল বিজয়-শেখ সোলায়মান, নাজাতে কাওয়াসা, মাযার ফিরদাওস-সৈয়দ আবদুল কাদির, রসূলের কুরসীনামা-মুন্সী আজিম উদ্দীন [১৮৩৮-১৯২২ খৃ.], হালাতুন্নবী-মুন্সী সাদেক আলী [১৮০১-১৮৬৯ খৃ.] প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে শাহ মুহম্মদ সগীর [১৩৩৯-১৪০৯ খৃ.] থেকে শুরু করে মধ্যযুগের প্রায় সকল মুসলিম কবিই কিছু না কিছু রাসূল [সা]-কে নিবেদন করে লিখেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি রাসূল [সা]-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই নানাভাবে সীরাত চর্চা শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবে সীরাত বিষয়ক আকর গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় রচিত। পাঠকের সুবিধার্থে এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য আরবী সীরাত গ্রন্থ ও উক্ত গ্রন্থের লেখকের নাম উল্লেখ করছি– 'আনসাবুল আশরাফ'-আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল বালাযুরী [মৃ. ২৭৯ হি.], 'জাওয়ামেউস সীরাত'-আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ [৩৮৪-৪৫৬ হি.]। ইনি ইবনে হাযম নামে প্রসিদ্ধ। 'আদদরাবু ফি ইহতেসাবুল মাগাযী ওস্‌সীরাত'-ইবনে আবদিল বারর [মৃ. ৪৬৩ হি.], 'শাফা'-আবুল ফজল বিন আমর ছবতী মালেকী' [মৃ. ৫৪৪ হি.]। ইনি কাজী ইয়াজ নামে পরিচিত ছিলেন। 'রওজুল আনাফ'-আবুল কাছেম আবদুর রহমান মালেকী [মৃ. ৫৮১ হি.]। ইনি ছুহাইলী নামে পরিচিত ছিলেন। 'আল মুখতাসার ফিল সীরাতে সাইয়েদীল বাশার'-আবদাল মুমিন আল দিময়াতী [মৃ. ৫০৭ হি.], 'আল ইকতে ফাউ কি মাগাযী রসূলিল্লাহ'-সুলাইমান ইবনে মূসা আলা কালাই আল উন্দুলুসী [মৃ. ৬৩৪ হি.], 'উয়ূনুল আসার ফি ফুনুনিল মাগাযী ওয়া আল-শামাইল ওয়া আসসিয়ার'-ইবনে সায়্যিদুন-নাস [মৃ. ৭৩৪ হি.], 'যাদুল মায়াদ ফি হুদা খাইরিল ইবাদ'-হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম [মৃ. ৭৫১ হি.] এ সীরাত গ্রন্থটি যুগ যুগ ধরে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। 'আস সীরাতুন নাবুবীয়াহ'-ইবনে কাসীর [৭০০-৭৭৪ হি.], ইবনে কাসীরের প্রকৃত নাম-ইমাম

www.pathagar.com

হাফেয আল্লামা ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমার ইবনে কাসীর আল কারশী আল বসরী। তাঁর অন্য একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'। এটি একটি ইতিহাস গ্রন্থ, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এমনকি রাসূল [সা]-এর জীবন বৃত্তান্তও এতে রয়েছে। 'উয়ূনুল আসার'-ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ [মৃ. ৮৪১ হি.], 'ইমতাউল আসমায়া'-আল মাকারিযী [মৃ. ৮৪৫ হি.], 'ফতহুল বারী' ও 'আল ইসাবা'-হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী [মৃ. ৮৫২ হি.], তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন শাফেয়ী। "খাসায়েসুল কুবরা'-হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী [মৃ. ৯১১ হি.], উসুলে তাফসীরের ওপর তাঁর রচিত বিখ্যাত কিতাব 'আল-ইত্বকান ফী উলুমিল্ কোরআন', 'মাওয়াহিবে লাদুননিয়া'-আল-কাসতাল্লানী [১৪৪৮-১৫১৭ খৃ.], তাঁর প্রকৃত নাম আদ আল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর আল খতীব শিহাব আলদীন শাফেয়ী। কাসতাল্লানী রচিত সীরাত গ্রন্থটি শতাব্দীর পর শতাব্দী নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ছহীহ আল বুখারীর ব্যাখ্যা "আল ইরশাদুস্ সারী' তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে। 'সাবিলুল হুদা ওয়াল ইরশাদ ফি সীরাতে খাইরিল ইবাদ, সীরাতে শামীয়া-শামস আল-দ্বীন আল শামী [মৃ. ৯৪২ হি.], 'আসসীরাতুল হালবিয়্যা'-নূর আলদীন হালাবী [মৃ. ১০৪৪], 'মাদারিজুন নবুয়ত ও শরহে ছিফলুছ ছায়াদাত'-শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী [মৃ. ১০৫২ হি.], 'নজমুদ দুরারে ওয়াল মারজান'-মির্জা আওহাদুদ্দীন বারকী জলদঘরী [মৃ. ১১০০ হি.], 'শরহে মাওয়াহেবে লীদুন্নিয়া আল যারকানী [মৃ. ১১২২ হি.], 'তাইয়ে বুন নাগমা ফি মদহে সাইয়েদিল আরাবে ওয়াল আজাম' [রাসূলের শানে নিবেদিত কবিতা]-শাহ ওয়ালীউল্লাহ বিন আবদুর রহীম দেহলবী [১১১৪-১১১৬ হি.], তিনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী নামেই পরিচিত। 'শরফুল মুস্তফা'-হাফেজ আবদুর রহমান ইবনুল জওযী [মৃ. ৫৪৭ হি.], 'সীরাতে গাযরুনী' আলী ইবনু মোহাম্মদ গাযরুনী [মৃ. ৬৯৪ হি.], 'আল সীরাত আল খালাতিয়াহ'-আলাউদ্দীন আলী ইবনু মোহাম্মদ খালাতী হানাফী [মৃ. ৭০৮ হি.], 'আল সীরাহ আন নবভিয়াহ'-হাফেয যাহাবী [মৃ. ৭৪৮ হি.], 'সুবুলুল হুদা ওয়া আল রাশাদ ফি সীরাতে খাইরিল ইবাদ'-মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ আল দামিশকী [মৃ. ৯৪৩ হি.]। উল্লেখ্য যে এই নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থটি তিন শতের অধিক গ্রন্থের সহায়তায় রচনা করা হয়। 'সীরাত মোগল তাই'-শায়খ আলাউদ্দীন তায়ী হানাফী [মৃ. ৭৬২ হি.], 'আবকারিয়াত মুহম্মদ'-আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাছ, 'হায়াতু মুহাম্মদী'-ড. হুসাইন হায়কাল, গ্রন্থটি মাওলানা আবদুল আউয়াল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি প্রামাণ্য একটি সীরাত গ্রন্থ। 'আল সীরাহ আল নবভীয়াহ'-সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী [১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.], এ সীরাত গ্রন্থটি মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন 'নাবীয়ে রহমত' নামে। 'আল রাহীক আল মাখতূম'-শায়খ শফিয়ূর রহমান মুবারকপুরী, আধুনিক গবেষণা পদ্ধতিতে আরবী ভাষায় রচিত ৫১২ পৃষ্ঠার চমৎকার

www.pathagar.com

একটি সীরাত গ্রন্থ। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি রাবেতায়ে আলমে আল ইসলামী আয়োজিত বিশ্বব্যাপী সীরাত প্রতিযোগিতার ১১৮২ পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। আরবী ভাষায় লিখিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি লেখক নিজেই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে গ্রন্থটি খাদিজা আখতার রেজায়ী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৯৯৭ খৃ. আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন প্রকাশ করে। ক্রমবর্ধমান পাঠক চাহিদার কারণে এপ্রিল ২০০২ ইং তারিখের মধ্যে গ্রন্থটির ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনা জগতে ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বিরল। 'আল সীরাহ্ আল নবভিয়াহ'-ড. আকরাম দিয়া আল উমারী, লেখক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীরাতুন্নবীর অধ্যাপক, দুই খণ্ডে সমাপ্ত পূর্ণাঙ্গ একটি সীরাত গ্রন্থ এটি। 'ফিকহুস সীরাত'-ড. মুহাম্মদ সাঈদ রমযান আল বুওয়াইতি প্রভৃতি সীরাত গ্রন্থ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উপমহাদেশে উর্দু ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহ সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ও রাখছে। এসব গ্রন্থের একটা বিরাট অংশ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। এখানে উর্দু ভাষায় রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থের উল্লেখ করছি- "সীরাতুন্নবী'-আল্লামা শিবলী নো'মানী [১৮৫৭-১৯১৪ খৃ.] ও মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী [১৮৮৪-১৯৫৩ খৃ.] ৬ খণ্ডে সমাপ্ত এ বিশাল সীরাত গ্রন্থের দু'খণ্ডের কাজ শেষ না হতেই আল্লাম শিবলী নো'মানী ইন্তেকাল করেন। এপর সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ঐ অসমাপ্ত দ্বিতীয় খণ্ডসহ বাকী ৬ খণ্ডের কাজ সমাধা করেন। এ সীরাত গ্রন্থটিকে সীরাত বিষয়ক নির্যাস বলা হয়। 'সীরাতুন্নবী' আরবী, ইংরেজী, পশতু, তুর্কি, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মুহীউদ্দীন খানের নেতৃত্বে কয়েকজন উলামা প্রথমে এ সীরাত গ্রন্থের অনুবাদ করেন, যেটি প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ঢাকা প্রকাশ করে। পরে মাওলানা ফজলুর রহমান মুন্সীর অনুবাদ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী প্রকাশ করে। 'রহমাতুল্লিল আলামীন'-কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী। গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড ১৯১২ খৃ., ২য় খণ্ড ১৯২১ খৃ. এরও পরে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর আগে ১৮৯৯ খৃ. লেখকের সংক্ষিপ্ততম নবী চরিত 'মোহরে নবুওত' প্রকাশিত হয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো লেখক একজন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ, তিনি তৎকালীন সময়ে পাতিয়ালা রাজ্যের সদর সিভিল জজ ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে তিনি নবী [সা]-এর সঠিক জীবনপঞ্জী রচনার চেষ্টা করেন। গ্রন্থটি সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ সীরাতকার সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ভূয়সী প্রশংসা করেন, এমনকি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় নদভী সাহেবের একটি দীর্ঘ অভিমত সংযোজিত হয়। অপরদিকে গ্রন্থটি সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর 'কারওয়ানে মদীনা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'যে গ্রন্থের অবদান আমি ভুলতে পারবো না' শিরোনামে একটি ভিন্ন প্রবন্ধ লিখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'আসাহহুস সিয়ার'-হাকীম মাওলানা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী। মাওলানা দানাপুরী ছিলেন মুফতী মাওলানা আমীমুল

www.pathagar.com

ইহসানের উস্তাদ। মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী [র]-এর নিকট এ সীরাত গ্রন্থখানা এত প্রিয় ছিল যে, তিনি সফরে গেলেও এটি সঙ্গে নিতেন বলে জানা যায়। এ সীরাত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

'সীরাতুল মুস্তফা'-মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দাহলভী। গ্রন্থখানা ৩ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃ. ১৫৩৩। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে নানা ধরনের ভ্রান্তিরও তিনি অপনোদন করেছেন। 'আবতাবই নবুয়ত'-মাওলানা হাফেজ ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়ব দেওবন্দী [জ. ১৩১৫ হি.]। গ্রন্থটি 'নবী ভাস্কর' নামে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন জনাব হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল।

'সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া'-মুফতী মুহাম্মদ শফী [১৮৯৭-১৯৭৬ খৃ.]। গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মুহাম্মদ সিরাজুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম, মোঃ আলতাফ চৌধুরী। ছোটদের জন্য রচিত চমৎকার এ সীরাত গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও এমদাদিয়া লাইব্রেরী প্রকাশ করেছে।

তাযকিরায়ে মুহাম্মদী-মাওলানা আযাদ সুবহান। মাওলানা মুজিবর রহমান কর্তৃক অনূদিত হয়ে ষাটের দশকে 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকায়' ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। পরে 'বিপ্লবী নবী' নামে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রথম বই আকারে প্রকাশিত। এরপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এর আরও ৩টি মুদ্রণ প্রকাশ হয়েছে। এটি একটি অসাধারণ সীরাত গ্রন্থ।

'কাছিদায়ে উজমা'-মাওলানা আমীনুল্লাহ আজীমাবাদী [মৃ. ১২৩৩ হি.], 'নূরে মুহাম্মদী [সা]'-মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী [১২১৫-১২৯০ হি.]। এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন শাহ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। 'সীরাতে হাবীব ইলাহী'-মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী [জ. ১৯১১ খৃ.], 'সীরাতে পাক'-মাওলানা সৈয়দ আবদুল আহাদ কাছেমী [জ. ১৯২৯ খৃ.], 'সীরাতে মোস্তফা'-মাওলানা ওবায়দুল হক [জ. ১৯২৮ খৃ.], 'খুৎবাতে আহমদীয়া'-স্যার সৈয়দ আহমদ, 'রসূলে আকরাম কি সিয়াসী জিন্দেগী'-ডক্টর হামীদুল্লাহ। গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'আল-নবীয়্যুল খাতিম'-মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানী, 'খুৎবাতে মাদ্রাজ'-মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী। সীরাত বিষয়ে মাদ্রাজে প্রদত্ত ৮টি ভাষণ খুৎবাতে মাদ্রাজ নামে গ্রন্থাকারে ১৯২৫ খৃ., আজমগড় থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি পরবর্তীতে আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, তুর্কী, পশতু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত 'নবী চিরন্তন' নামে এ গ্রন্থটি বাংলাবাজারস্থ বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য 'পয়গামে মুহাম্মদী' নামে এর আর একটি অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত অনুবাদক, সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব, যার অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

'সীরাতে সারওয়ারে আলম'-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী [১৯০৩-১৯৭৯]। এ গ্রন্থটি মাওলানা মরহুম শেষ করে যেতে পারেননি। হিজরত পর্যন্ত লেখার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে নঈম সিদ্দিকী ও আবদুল ওকীল উলুবীর সম্পাদনায় এ বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুসাহিত্যিক মরহুম আব্বাস আলী খান। এতে নবুওয়াত, খতমে নবুওত, মুজেযা, ইহুদী, খৃস্টান প্রভৃতি জাতির বর্ণনা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে পেশ করা হয়েছে। আধুনিক চিন্তার খোরাক ও জবাব সম্বলিত এটি একটি মহামূল্যবান সীরাতগ্রন্থ।

'মুহসিনে ইনসানিয়াত'-নঈম সিদ্দীকী। ৭২০ পৃষ্ঠার নন্দিত-এ সীরাত গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী [র] ও মাহিরুল কাদিরী। গ্রন্থটি 'মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ [সা]' নামে বাংলা ভাষায়ও প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম।

'নশরুৎ তীব ফী যিকরীন নাবিয়্যিল হাবীব [সা]'-মাওলানা আশরাফ আলী থানভী [র], 'মাকালাতে সীরাত'-ডক্টর মুহম্মদ আসিফ কিদওয়াই', 'আখলাকুন নবী'-মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী। 'আখলাকুন্ নবী' নামেই বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করছে। 'তাওয়ারীখে হাবীবে এলাহী'-আন্দামানবন্দী মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরভী। 'হাদীয়ে আলম'-ওলী রাযী। লেখক মুফতী মুহম্মদ শফী [র]-এর পুত্র। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এ অনন্য সাধারণ সীরাত গ্রন্থটিতে একটিও নুকতাযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

'ফাতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন'-মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদ বাইয়মপুরী [র]। লেখক সিলেটের প্রখ্যাত আলেম ও পাকিস্তান জাতীয় সংসদের প্রাক্তন সদস্য। গ্রন্থটি 'ইসলামের রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার' নামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত অনুবাদক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী।

'হাদীছে দেফা' মেজর জেনারেল আকবর খান। 'ইসলামের প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনুবাদ করেছে এবং প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ফারসী ভাষায় খুব বেশী সীরাত সাহিত্য দেখা যায় না। এরপরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ এ ক্ষেত্রে হয়েছে। যেমন, 'শাওয়া হেদুন নবুয়ত'-মোল্লা নূরউদ্দীন জামী [জ. ১৪১৪ খৃ.], 'রিসালাহ বর কাইফিয়াতে লিবাসে পরগাম্বর ও জাজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব'-শায়াখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেলহভী [৯৫৮-১০৫২ হি.], 'কুররাতু আইনিল আশিকীন ফী দুনিয়াতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন'-মাওলানা ওয়াহিদুল ফুল ওয়ারভী [১১২৪-১২০০ হি.], 'দালাইলুল ঈমান'-মাওলানা শাহ আলী সাজ্জাদ ফুলওয়ারভী [১১৯৯-১২৭১ হি.], 'পয়গাম্বরে ইসলাম'-আবু আবদুল্লাহ জানজালী, 'রাওয়ায়ীহুল মুস্তাফা'-সদরুদ্দীন বুখারী, 'রওজাতুল আহবাব'-আতাউল্লাহ নিশাপুরী, 'সুররুল মাহযুন'-শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী [র], 'তাজাল্লী'-রাফীউদ্দীন খান

www.pathagar.com

মুরাদাবাদী, 'পয়গাম্বর মুহম্মদ [সা]'-জয়নুল আবেদনী রাহনুমা, গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় মাওলানা মহিউদ্দীন খান অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। 'আস সীরাতুল মুহাম্মদীয়াতু ওয়াত তরীকাইল আমদিয়া'-মুহাম্মদ কারামত আলী মুসাভী, 'নসবনামা রসূল-এ মকবুল'-মুহাম্মদ মুস্তাফা খান, 'খাতামু নবীঈন'-আব্বাস শাস্ত্রী প্রভৃতি। মুসলমান অমুসলমান অনেকেই ইংরেজী ভাষায়ও রাসূল [সা]-এর জীবন চরিত রচনা করেছেন। যেমন– The Ideal Prophet-Khawja Kamal Uddin, The Prophet of the Desert-K.L Gauba, Life of Muhammad-Sir William Muir, Life of Muhammad-Washington Irving, The Decline and Fall of the Roman Empire-Gibon, Muhammad-Margoliouth, Muhammad-Moulana Muhammad Ali, Essay on Muhammad & Islam-Sir Syed Ahmed, Muhammad-Golam Sarwar, Prophet in the World Scripture-A. Huq Vidyarathi, Mystical Elements in Muhammad-John Clerk Archer, The Life of Muhammad-Nayem Siddique, Encyclopaedia of Seerah, Afzalur Rahman, Seerah Foundation, The Prophet Mohammad his life and Eternal Message-W. Chowdhry, London, 1993 প্রভৃতি গ্রন্থ।

এছাড়া অহমিয়া, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম প্রভৃতি উপমহাদেশীয় ভাষায়ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীরাত সাহিত্য রচিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা কবে থেকে শুরু হয়েছে তা সন তারিখ ঠিক করে বলা অবশ্যই দুরূহ ব্যাপার। তবে একথা বলা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীনের খিলাফতকালে যখন বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয় তখন থেকেই মৌখিকভাবে সীরাত চর্চা শুরু। অবশ্য লিখিতভাবে খোদা, মহামদ, টুপি, পেকাম্বর, আদম্ফ, গাজী, কাজী, ফীকর, মলানা প্রভৃতি শব্দগুলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি রমাইপণ্ডিত তার 'শূন্য পুরাণ' কাব্যের 'নিরঞ্জনের রুশ্মা' কবিতায় প্রথম ব্যবহার করেন। যেমন–

ধর্ম হৈলা জবনরূপী মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান
চাপিয়া উত্তম হএ ত্রিভূবনে লাগে ভয়
খোদা এ বলিয়া এক নাম।

ব্রহ্ম হৈলা মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আনন্দ হৈল্যা শূলপানি
গণেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা যত মুনি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি হলেন– শাহ মুহাম্মদ সগীর [১৩৩৯-১৪০৯ খৃ.]। তিনি রসূল প্রশস্তি করে তাঁর কাব্য শুরু করেছেন। 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যে তিনি লিখেছেন–

www.pathagar.com

জিবাত্মা পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম
প্রথম প্রকাশ তথা হৈল য়নুপম ॥
যথ ইতি জিব আদি কৈল ত্রিভোবন।
তারপর মোহাম্মদ মাণিক্য সৃজন ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের দরবারে কবি জৈনুদ্দীন ও শাহ বিরিদ খান 'রসূল বিজয়' নামে আলাদা আলাদা কাব্য রচনা করেছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কবি জৈনুদ্দীন লিখেছেন–

তাঁর পাছে মাগে সাজ নবী রাজেশ্বর।
মুকুতা মণ্ডিত তাজ অতি মনোহর।
লাল যে কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সভা পরম সুন্দর।

শাহ বিরিদ খান তাঁর কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন–

সা বিরিদ খান কহে রসূল বিজয়।
শুনি বুধ কর্ণ পুরি সুধা বারি খায় ॥

১৮০২ খৃ. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা গদ্যে অজ্ঞাতনামা জনৈক লেখকের 'মহম্মদের বিবরণ' শিরোনামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটি মিশনারী ট্রাস্ট সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলা গদ্যে প্রকাশিত রাসূল [সা]-এর ওপর প্রথম এ প্রয়াসটি একটি কুৎসাপূর্ণ রচনা। অর্থাৎ রাসূল-এর বিরুদ্ধে খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীও রাসূল প্রশস্তি করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন–

'আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর যেমন তাঁর কবিতায় রাসূল প্রশস্তি করেছেন তেমনি প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীও [১৮০৮-১৮৭০ খৃ.] রাসূল প্রশস্তি করেছেন। 'ইউসুফ জোলেখা' মুসলমান রচিত প্রথম কবিতা গ্রন্থ, 'উচিত শ্রবণ' [১৮৬০] মুসলমান লিখিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ। অবশ্য এ গ্রন্থে পদ্যও কিছু কিছু আছে। এ রকম একটি পদ্যেই রাসূল প্রশস্তি রচনা করেছেন খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী–

নবীজীর নূরে সংসারে প্রচারে
প্রকাশিল দিবা নিশি
স্বর্গমর্ত্য আর কিরণ তাহার
দেখাছিল রবিশশী ॥
ছিদ্দিকী অধীনে সেগুন ব্যাখ্যানে
কেমনেতে পারে বলো।
নবীজী যে স্থানে ব্যাখ্যানিতে গুণে
সাধনে অক্ষম হলো ॥

www.pathagar.com

বাংলা গদ্যে সাহিত্যের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়, মাত্র দু'শ' বছরের কিন্তু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের। সেই চতুর্দশ শতাব্দীর 'ইউসুফ জুলেখা'র কবি শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভ পর্যন্ত যত বাঙালী কবি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কাব্য রচনা করেছেন তাদের প্রায় সবাই কোন না কোনভাবে রাসূল প্রশস্তি করেছেন, গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

যেহেতু বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন সেজন্য উল্লেখযোগ্য কিছু কবির কবিতার কিছু পংক্তি প্রথমে তুলে ধরছি। পূর্বে শাহ মুহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন ও শাবিরিদ খানের কবিতার পংক্তি পেশ করছি। এ ধারায় মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের কিছু পংক্তিমালা–

ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান [১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.] রচনা করেন– 'ওফাতে রসূল, 'রসূল বিজয়', 'নবী বংশ', 'জ্ঞান প্রদীপ', 'শাবে মিরাজ', 'রসূল চরিত', 'জয় কুমার রাজার লড়াই' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি সৈয়দ সুলতানের কাব্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাসূল [সা]-এর কর্মময় জীবন ও ইসলামের মর্মকথা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

'নবী বংশ' কাব্য গ্রন্থটির ভাষার সৌন্দর্য ও ভাবের মনোহারিত্বের কারণে ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক কাব্য গ্রন্থটিকে 'ম্যাগনাম ওপাস' [Magnum Opus] বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "ইহা বিষয়-বৈচিত্র্যে ও আকারে সপ্তকাণ্ড রামায়ণকেও হার মানাইয়াছে। এই কাব্যটিকে বাংলা মহাকাব্যের একটি আদর্শ বলা চলে।"

সত্যিই সুবিশাল 'নবী বংশ' কাব্য গ্রন্থে বিভিন্ন নবীদের ব্যক্তি সত্তা ও তাঁদের কাহিনীর বর্ণনার চমৎকারিত্ব একদিকে কবির অসাধারণ ধৈর্য, অপরদিকে তাঁর কবি শক্তির পরিচয় বহন করে।

নবী বংশের দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত মুহাম্মদ [সা] ও খাদিজা [রা]-র বিয়ে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যেন আমাদেরই পরিচিত পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন–

সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।
হীরা জরি চান্দোয়া যে মানিক্য পোখম ॥
চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর খোরমান।
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ অমৃত সমান ॥
খাসী বকরী দুম্বা আর উট যে প্রধান।
মেজায়ানী করিলেন্ত এবাজ সমান ॥

কবির কবিত্ব শক্তির প্রমাণ মিলে তাঁর 'শব-ই মিরাজ' কাব্যগ্রন্থেও। তিনি বোরাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন–

সেই তুরঙ্গের নাম বোরাক আছিল ॥
বোরাকের মুখমুণ্ড নরের আকার।

www.pathagar.com

চিকুর লম্বিত অতি নারীর বৈভার ॥
বোরাকের দুই কর্ণ উটের চরিত ॥
নরের বচন কহে অতি সুললিত ॥
অশ্বের আকার পৃষ্ঠ চলন গম্ভীর।
চলিলে বিজুলি যেন রহিতে সুধীর ॥
নীলা কষা জমরুদের বরণ তাহার।
দেখিতে সুন্দর অতি বড় শোভাকার।

'জ্ঞান প্রদীপ' কাব্যের শুরুতে রাসূল প্রশস্তি করেছেন এভাবে–

প্রথমে প্রভুর নাম করি এ স্মরণ
আঠার হাজার আলম যার সৃজন।
দ্বিতীয় এ লই মুস্তফা পয়গম্বর
যার সিফাত আছে রোজ মহাশর।
যতন করি ধরি এ রাসূল দুপা এ
আখেরে এড়াইয়া যদি হিসাবের দাএ।"

এমনিভাবে তিনি তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোতে কবিকৃতির ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কবি শেখ চান্দ [১৫৬০-১৬২৫] তাঁর 'রসূল বিজয়' কাব্যের শুরুতেই লিখেছেন–

"আল্লাহো গণি মোহাম্মদ নবী
রসূলনামা কিতাবখানি কহিলাম এবে
কা এয়া মন হইয়া সোন করিলাম সবে।"

সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওল লিখেছেন তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের শুরুতেই–

"পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নিরসিলা ॥
তাহার পিরিতে প্রভু সৃজিল সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার ॥"

কবি মুহাম্মদ খান 'মুক্তাল হোসেন' কাব্যের শুরুতে লিখেছেন–

"মুহাম্মদ নবী নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া
পাপীগণ পরিণামে যাইবে তরিয়া।

www.pathagar.com

দয়ার আধার নবী কৃপার সাগর।
বাখান করিতে তার সাধ্য আছে কার ॥
যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আপে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি করিলেন এ চৌদ্দ ভুবন।"

সৈয়দ হামজা [১৭৫৫-১৮১৫] রসূল প্রশস্তি এভাবে করেছেন–

মোহাম্মদ নামে নবী সৃজন করিয়া।
আপনার নূরে তাঁকে রাখিলা ছাপাইয়া।"

সৈয়দ মর্তুজা [১৫৯০-১৬৬২ খৃ.] তাঁর 'যোগ কালন্দর' পুঁথিটি এভাবে শুরু করেছেন–

"প্রথম প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিয়ে নবীর চরণ ॥"

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পাদে রাসূল [সা]-এর প্রসঙ্গ এসেছে আখ্যান কাব্য, খণ্ড কবিতা, গযল-গান ও দোয়া-দরুদ ইত্যাদির মাধ্যমে। ১৯০২ খৃ. মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় 'মৌলুদ শরীফ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এতে মীর মশাররফ হোসেন যে রাসূল প্রশস্তি করেছিলেন–

"তুমি হে এছলাম রবি
হাবিবুল্লাহ শেষ নবী
নতশিরে তোমার সেবি,
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ।
তুমি সত্য উদ্ধারিলে মহাতত্ত্ব প্রকাশিলে
প্রভু বাণী শুনাইলে
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ ॥"

মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা [১৮৬১-১৯০৭] লিখেছেন–

গাওরে মোস্লেমগণ নবী গুণ গাওরে
পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে।
যে দেশে যে ভেসে যে দেশেতে যাওরে
গাও গাও গাও সবে ছাল্লে আলা গাওরে ॥

মেহেরউল্লার শিষ্য ও সহকর্মী মুনশী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন [১৮৭০-১৯৩৭] লিখেছেন–

"তিনি সদ্য আদি নূরী
উজলিছে স্বর্গ পুরী
বাজাও আনন্দ ভেরী
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ।"

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগীয় পর্যায়েই ছিল কবিতা কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসেই বাংলা কবিতা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই এ পরিবর্তনের সূচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ-এর দশকের শেষ দিকে আধুনিক মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে। এরা হলেন– শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম। নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল [সা]-কে নিবেদিত প্রথম কবিতা শাহাদাৎ হোসেনের 'হজরৎ মোহাম্মদ [দ]' শিরোনামের কবিতাটি। এটি ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের মে সংখ্যা সওগাতে ছাপা হয়। কয়েকটি পংক্তি–

তুঙ্গ হেরার অন্ধ গুহায় মগ্ন রহিয়া গভীর ধ্যানে,
সাক্ষাত লাভি' স্বর্গ দূতেরে ধরিলে মহান সত্যজ্ঞানে।
পূজ্য নরের মাত্র সেজন জগৎ বিপুল সৃষ্টি যার
জানলে মানবে আল্লা ব্যতীত নাহিক তাহার নম্য আর।
'ঘুচিল আঁধার, হাসিল বিশ্ব, নূতন অরুণ আলোক-পাতে,
সত্য মহান ধর্মের জ্যোতিঃ হেরিল মানব জীবন-প্রাতে।

কবি গোলাম মোস্তফা [১৮৯৭-১৯৬৪ খৃ.] সেই সৌভাগ্যবান কবি ব্যক্তিত্ব যাঁর গদ্য-পদ্য দু'ধরনের রচনাই বাঙালী মুসলমান মনে রেখেছে এবং আজও সমানভাবে নন্দিত। 'বিশ্বনবী'র লেখক কবি গোলাম মোস্তফা রাসূল [সা]-কে নিবেদন করে চমৎকার গীতি কবিতা রচনা করেছেন। যেমন–

নিখিলের চিরসুন্দর সৃষ্টি
আমার মোহাম্মদ রসূল।
কুলমাখলুকাতের গুলবাগে
যেন একটি ফোটা ফুল ॥

বাংলা মিলাদ শরীফের ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য সাধারণ সংযোজন করেছেন তার তুলনা বিরল। বর্তমানে বাঙালী মুসলমানের গৃহে গৃহে বা যে কোন স্থানে মিলাদ মাহফিলে অনুষ্ঠিত হলে সুর করে যে কিয়ামটি পড়া হয় তা গোলাম মোস্তফারই রচনা। যেমন–

ইয়ানবী সালাম আলায়কা
ইয়া রাসূল সালাম আলায়কা

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি ॥"

www.pathagar.com

ঐ একই সময়ে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্লাবী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন কবি কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.]। উল্কার মত আবির্ভূত হয়ে একের পর এক হামদ-নাত ও ইসলামী গান ও কবিতা রচনা করে এ ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি করলেন, এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করলেন। মোসলেম ভারতে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় কবিতা 'খেয়া পারে তরণী'। লিখলেন–

পুণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল সাফ।
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও
কাণ্ডারী আহমদ; তরী ভরা পাথেয়?

সাথে সাথে সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। এরপর ১৯২০-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হল 'ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম– আবির্ভাব'। ঠিক এর এক বছর পর ঐ মোসলেম ভারতেই প্রকাশিত হল 'ফাতেহা-ই দোহাজ দহম– তিরোভাব' শিরোনামের অসাধারণ দু'টি কবিতা। প্রথম কবিতাটির [আবির্ভাব] প্রথম স্তবক এমন–

নাই তা-জ
তাই লা-জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ।
করে তসলিম হর কুর্ণিশে শোর আ-ওয়াজ
শোন কোন মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা- মাঝ!
উরজ্‌ য়্যামন নজ্‌দ হেজায্‌ তাহামা ইরাক্‌ শাম
মেসের ওমান্‌ তিহারান-স্মরি কাহার বিরাট নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।"
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী ফিরদৌসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর্, হাতে আব্ জম্ জম্ জাম্।
শোন দামাম কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।"

কবিতাটি সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন–

"পরবর্তী সময়ে গোলাম মোস্তফাকে 'বিশ্বনবী' [১৯৪২-এর প্রকাশিত] শিরোনামে দীর্ঘ

www.pathagar.com

কবিতা লিখতে দেখেছি; আবদুল কাদিরকে 'হযরত মোহাম্মদ', 'মিলাদুন্নবী', 'অন্তর্ধান' লিখতে দেখেছি এবং ফররুখ আহমদ কে লিখতে দেখেছি 'সিরাজাম মুনীরা'। কিন্তু 'ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম'-এর উজ্জ্বলতাকে কেউ ম্লান করতে পারেননি; এমনকি নজরুল ইসলামের স্বরচিত 'মরু ভাস্কর' [অসমাপ্ত] কাব্যগ্রন্থ যাদুকরী বহু পংক্তি উপহার দিলেও 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম'-এর চোখ ধাঁধানো প্রভাকে আড়াল করতে পারেনি।"

কাজী নজরুলের পর বিপুল প্রতিভা ও মমত্ব নিয়ে যিনি রাসূল [সা]-এর ওপর কবিতা লিখেছেন তিনি হলেন ফররুখ আহমদ [১৯১৮-৯৭৪ খৃ.]। তিনি 'সিরাজাম মুনীরা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থই রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন–

তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হত না লুট
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলত না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।

অবশ্য ত্রিশের দশকে জসীম উদ্দীন, বে-নজীর আহমদ, কাদের নওয়াজ প্রমুখ, চল্লিশের দশকে তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, রওশন ইয়াজদানী, মুফাখ্খারুল ইসলাম, আবদুর রশীদ খান'রা পঞ্চাশের দশকে- আবদুস সাত্তার, আল মাহমুদ, মাহফুজ উল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন; ষাটের দশকে আবদুল মান্নান সৈয়দ, আফজাল চৌধুরী, আবদুল মুকীত চৌধুরী, ফজল-এ-খোদা, মসউদ উশ শাহীদ, সত্তরের দশকে- আবিদ আজাদ, মুশাররফ করীম, মুস্তাফা মাসুদ; আশির দশকে- মতিউর রহমান মল্লিক, মোশাররফ হোসেন খান, আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম, মুকুল চৌধুরী, গাজী রফিক, গোলাম মোহাম্মদ, বুলবুল সরওয়ার, গাজী এনামুল হক, শরীফ আবদুল গোফরান, নাসির হেলাল, নব্বই দশকে- কামারুজ্জামান, জাকির আবু জাফর, মৃধা আলাউদ্দীন, রফিক মুহাম্মদ, আল হাফিজ, মহিবুর রহিম, ওমর বিশ্বাস প্রমুখ কবিগণ রাসূল প্রশস্তি করেছেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে রাসূল [সা]-কে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন শেখ আবদুর রহীম [১৮৫৯-১৯৩১ খৃ.]। গ্রন্থটির নাম "হযরত মুহম্মদের [দ] জীবন চরিত ও ধর্মনীতি।" ১৮৮৭ খৃ. প্রকাশিত ৪০৪ পৃ. এ গ্রন্থটির ভূমিকায় বলা হয়েছে– "ইহাতে হযরত নূহ [আ]-এর [নোয়ার] সময় হইতে আরব দেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং আধুনিক অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হিজরীর প্রথম অব্দ হইতে প্রত্যেক... বৎসরের ঘটনাবলী একেকটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে নিয়মিতরূপে লিখিয়াছি। প্রত্যেক সম্বন্ধে কুরআন শরীফের যে যে আয়াত অবতীর্ণ [নাযিল] হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত অনুবাদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি,... হযরত মুহাম্মদ তরবারীর বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ যে তাঁহার নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন এই পুস্তক পাঠ করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।"

www.pathagar.com

এরপর ১৮৯৬ খৃ. সিলেট থেকে নাগরী হরফে মুন্সী বুরহান উল্লা ওরফে চেরাগ আলী রচিত 'হালাতুন্নবী" কুষ্টিয়া থেকে ১৯০১ খৃ. আবদুল আজিজ খান [১৮৬৮-১৯০৩ খৃ.] রচিত 'সংক্ষিপ্ত মুহম্মদ চরিত', যশোর থেকে ১৯০২ খৃ. ডাঃ সুফী ময়েজউদ্দীন আহমদ [মধু মিয়া] রচিত 'ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ [সা]', শান্তিপুর নদীয়া থেকে ১৯০২ খৃ. মোজাম্মেল হক রচিত 'হযরত মোহাম্মদ [সা]', যশোর থেকে ১৯০৪ খৃ. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লার প্রকাশনায়, শেখ ফজলল করিম [১৮৮২-১৯৩৬ খৃ.] রচিত হযরত পয়গম্বরের জীবনী [নবীজীর যুদ্ধাবলী], কলকাতা থেকে ১৯০৮ খৃ. ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন [১৮৬২-১৯২৯ খৃ.] রচিত মোসলেম পতাকা; হযরত মোহাম্মদ [সা] জীবনী, ১৯১৫ খৃ. কলকাতা থেকে শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন [১৮৭০-১৯৩০ খৃ.] রচিত 'মাসুম মোস্তফা [সা]', ১৯১৬ খৃ. সারা তায়ফুর রচিত 'স্বর্গের জ্যোতি', ১৯১৮ খৃ. কলকাতা থেকে এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত 'নূরনবী' ও ১৯২২ খৃ. 'মানব মুকুট', ১৯২৫ খৃ. মোবিনুদ্দীন আহমদ জাঁহাগীর নগরী রচিত 'নবীশ্রেষ্ঠ', ১৯২৫ খৃ. কলকাতা থেকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরু ভাস্কর', ১৯৪২ খৃ. চুঁচুড়া থেকে কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী', ১৯৪৯ খৃ. কলকাতা থেকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'ছোটদের হযরত মোহাম্মদ', ঐ ১৯৪৯ খৃ. ঢাকা থেকে খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, রচিত 'শেষ নবী', ১৯৫১ খৃ. ঢাকা থেকে মাওলানা আবদুল খালেক রচিত 'ছাইয়েদুল মুরছালীন' [দু'খণ্ড]', ১৯৬০ খৃ. ঢাকা থেকে মুহম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত 'নবী গৃহ সংবাদ' ১৯৬৩ খৃ. 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ', ১৯৯৮ ঢাকা থেকে শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জাল হোছাইন রচিত 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা [সা] সমকালী পরিবেশ ও জীবন' ছাড়াও কয়েকটি সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ- ১৯৮০ খৃ. ই ফা বা থেকে অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত 'শাশ্বত নবী', ১৯৯২ খৃ. ই ফা বা থেকে হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত 'অনুপম আদর্শ', ১৯৯৭ খৃ, ই ফা বা থেকে ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত 'হযরত রাসূল করীম [সা] জীবন ও শিক্ষা', ১৯৯৪ খৃ. ইসলামিক একাডেমী থেকে, ইশারফ হোসেনের সম্পাদনায় 'মহানবী [সা] স্মরণে নিবেদিত কবিতা', ১৯৯৬ খৃ. প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা থেকে আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরীর সম্পাদনায় 'রাসূলের শানে কবিতা' শিরোনামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও সংকলনগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এবার বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত কয়েকটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও সংকলন সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করছি-

স্বর্গের জ্যোতি

গ্রন্থটির লেখিকা সারা তায়ফুর [জ. ১৮৯৩]। পুরো নাম হুরায়ুন্নিসা সারা খাতুন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনী লেখিকা সারা তায়ফুর-এর 'স্বর্গের জ্যোতি' গ্রন্থটি ১৯১৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৩৭১ বাংলা সনে বাংলা একাডেমী, ঢাকা-এর সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

www.pathagar.com

কাব্যিক গদ্যে রচিত– এ গ্রন্থের ভাষা সাবলীল। লেখিকা অত্যন্ত দরদ দিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে এ গ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখিকাকে চিঠি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন।

নূরনবী

আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত 'নূরনবী'র তুল্য ছোটদের জন্য তেমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। সুললিত ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি যে কোন বয়সী পাঠককে আকর্ষণ করতে সক্ষম।

গ্রন্থটি শুরু হয়েছে এভাবে–

"সে অনেক দিনের কথা। তেরশ' কি তারও আগে,
সেই-সাত সমুদ্র পার, তের নদীর ধার,
সেই সোনা হীরার গাছ, আর মুক্তা মণির ফুল–
সবাই তখন ভুল।
তখন না ছিল ফুলে ফুলে পরীর মেলা,
আর না ছিল সব দেশে দেশে রাজপুত্রের খেলা।"

এমনি প্রাণ কাড়া ভাষা দিয়ে পুরো বইটি রচনা করা হয়েছে। ১৯৯৫ খৃ. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

মানব মুকুট

'মহাপুরুষেরও শৈশব আছে, মানব শিশুর স্বাভাবিক সোহাগ-বিরাগ ও মান-অভিমান তাঁহারও জীবনে লালায়িত হয়। শৈশব স্মৃতির পুষ্প পরশে তাঁহারও প্রাণের কোমল পর্দায় ঝঙ্কার উঠে" [পৃ. ৩০]।

এয়াকুব আলী চৌধুরীর লেখার স্টাইলই আলাদা তাঁর ভাষা যেন বইতো নদীর মত– তর্ তর্ করে বয়েই চলে।

রাসূল [সা]-এর জীবন কেন্দ্রিক ৭টি প্রবন্ধ নিয়ে এ গ্রন্থ। লেখক দেখিয়েছেন মুহাম্মদ [সা] শুধুমাত্র একজন নবীই ছিলেন না– তিনি মানবতার মুক্তির দিশারী হিসাবে– পথপ্রদর্শক হিসাবে এসেছিলেন।

নবী শ্রেষ্ঠ

ঢাকা জেলার অধিবাসী মোবিনুদ্দীন আহমদ জাঁহাঙ্গীর নগরী রচিত 'নবী শ্রেষ্ঠ' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন। গ্রন্থটির ১৪টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত রাসূল [সা]-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে রাসূল [সা]-এর চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে সাথে সাথে গ্রন্থটি সম্পর্কে সমালোচকদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

সে সময়কায় একজন নামকরা সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র নাগ লিখেছিলেন, "আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আপনার গ্রন্থ পাঠে হযরত মুহাম্মদের চরিত্র ও শিক্ষা দীক্ষার প্রতি সহস্র গুণে অধিকতর শ্রদ্ধাবান হইয়াছি।"

মোস্তফা চরিত

মাওলানা আকরম খাঁ গ্রন্থটি সম্বন্ধে নিজেই লিখেছেন- "এই অসাধ্য সাধন করিতে আমাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অবিরাম নিভৃত সাধনায় সমাহিত থাকিতে হইয়াছে। আমার এ সাধনা কতটুকু সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, বিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন। এই ব্যাপারে আমাকে ইতিহাস, জীবনী, তাফসীর, হাদীস ও তাহার ভাষা প্রভৃতি হযরতের জীবনী সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইয়াছে।"

মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা থেকে ১৯২৫ খৃ. 'মোস্তফা চরিত' প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত প্রবর আকরম খাঁ তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুহাম্মদ [সা]-এর চরিত্রকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি সম্বন্ধে শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন-

"বাস্তবিকই প্রায় ন'শ' পৃষ্ঠার 'মোস্তফা চরিত' এর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ নবী করীম [সা]-এর জীবনী সম্পর্কিত আলোচনার বিতর্কিকা। ২২৩ পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি যে রসূল চরিত্রের মহিমা প্রদর্শনের পটভূমি রচনা করে তাঁর সমীক্ষাধর্মী মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, জীবনী রচনায় তা তুলনা রহিত। এতে শুধু হাদীসের সত্যাসত্য নিরূপণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমগ্র ইসলামের আবির্ভাবের কারণের মধ্যে এই সমীক্ষা নিপুণ শিল্পীর সৃষ্ট পোর্ট্রেটের বা ল্যান্ড স্কেপের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনায় আকরম খাঁ যে মেধা, পরিশ্রম ও মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তা অক্লান্ত সাধনা অধ্যবসায়ের ফল।"

'মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য' নামে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর আরও একটি গ্রন্থ ১৯৩২ খৃ. ঐ মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

মরু ভাস্কর

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী [১৮৯৬-১৯৫৪ খৃ.] রচিত 'মরু ভাস্কর' নামের সুলিখিত জীবনী বইটি মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহারের সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ ১৯৪১ খৃ. বুলবুল পাবলিশিং হাউস কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সম্বন্ধে অধ্যাপক আবদুল গফুর লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নবী চরিতসমূহের মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরু ভাস্কর' অন্যতম। মননশীল গদ্য লেখক হিসাবে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং সাবলীল ভাষার অধিকারী হিসাবে তাঁর খ্যাতির একটি বড় দলিল এই- 'মরু ভাস্কর'।

www.pathagar.com

'ছোটদের হযরত মোহাম্মদ' নামেও কিশোরদের উপযোগী একটি নবী জীবনী তিনি রচনা করেছিলেন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি ১৯৪৯ খৃ. দেব সাহিত্য কুটির কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বনবী

কবি গোলাম মোস্তফা [১৮৯৭-১৯৬৪]-এ অমর সৃষ্টি। নিঃসন্দেহে 'বিশ্বনবী' কবি গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কবি গোলাম মোস্তফা যদি 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটি ছাড়া অন্য কোন কিছু রচনা নাও করতেন তবু যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালী পাঠক তথা মুসলিম পাঠকদের কাছে তিনি বেঁচে থাকতেন, শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন থাকতেন। 'বিশ্বনবী' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে, এরই মধ্যে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বনবীর কদর পাঠকের কাছে বিন্দুমাত্র কমেনি এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার প্রমাণ ১৯৪২ থেকে ২০০২ পর্যন্ত মোট ৩০টি মত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশককে প্রতি দুই বছরে একটি করে সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছে। এ তথ্য থেকেই পরিষ্কার হয় গ্রন্থটির ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তার কথা।

প্রথম খণ্ডে মোট ৫৮টি পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ১৪টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের আলোচনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। 'বিশ্বনবী' নিঃসন্দেহে একটি গবেষণা গ্রন্থ, সর্বসাধারণের বোধগম্যও। এর কোন আলোচনাই যুক্তির ভারে ন্যূজ হয়ে পড়েনি, আবার আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন অযৌক্তিক কিছুকেও প্রশ্রয় দেয়া হয়নি।

আমাদের বিশ্বাস এ বিশাল গদ্য কাব্যটি আরও দীর্ঘকাল বাঙালী পাঠককে বিমুগ্ধ করে রাখবে।

বিশ্বনবী ছাড়াও কবি গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য' ও 'মরু দুলাল' নামে আরও দু'টি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা [সা] সমকালীন পরিবেশ ও জীবন

ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ থেকে সৈয়দ এ কে কামরুল বারী প্রকাশ করেছেন, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা [সা] সমকালীন পরিবেশ ও জীবন' নামে ১০০৮ পৃষ্ঠার বিপুলায়তন একটি গুরুত্বপূর্ণ সীরাত গ্রন্থ। ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে রাসূল [সা]-এর জীবনের নানাদিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় শুরুর আগে প্রথম ভাগে সমকালীন পরিবেশ শীর্ষক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৮টি পরিচ্ছেদে ৮টি জরুরী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো– রাসূল প্রেরণ, কুরআন-হাদীস সংকলনের ধারা, রাসূল [সা]-এর আবির্ভাবকালীন বিশ্ব, মহানবী [সা]-এর আগমনের পূর্বাভাস, শেষ নবীর আবির্ভাব আরবে কেন, মক্কায় ইসমাঈলী বংশের আগমন, কা'বা শরীফের পুনঃ সংস্কার ও হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর বংশ পরিচয়।

www.pathagar.com

গ্রন্থটির মাঝে মাঝে বিভিন্ন মূল্যবান চিত্রও সংযোজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থের মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থটির রচয়িতা শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তারই সুযোগ্য সন্তান ড. মুজতবা হোসাইন। গ্রন্থটি ১৯৯৮ সালে জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ কর্তৃক গত ১০ বছরে প্রকাশিত সীরাত বিষয়ে মৌলিক রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে পুরস্কার লাভ করে।

সাইয়েদুল মুরসালীন [দু'খণ্ড]

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আবদুল খালেক রচিত 'সাইয়েদুল মুরসালীন' [দু'খণ্ড] বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। 'মোস্তফা চরিত', 'বিশ্ব নবী' পর্যায়ের গ্রন্থ এটি না হলেও জনপ্রিয়তার দিক থেকে অনেকটা কাছাকাছি। এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খৃ.। এরপর ১৯৯০ খৃ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে গ্রন্থটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দু'খণ্ডে প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি লেখকের কঠোর পরিশ্রমের ফসল।

নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ

'পারস্য প্রতিভা'র লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ' গ্রন্থটি ১৯৫৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। সীরাত সাহিত্যের ইতিহাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। লেখক কেন গ্রন্থটি লিখলেন– তা বলতে গিয়ে বলেছেন, "ত্রিশ বৎসর আগের কথা। কতিপয় সাহিত্যমোদি ব্যক্তি আমার পারস্য প্রতিভা পাঠ করার পর আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় একখানি নবী চরিত লিখিতে অনুরোধ করেন কিন্তু আমি আত্মজিজ্ঞাসা হইতে উপলব্ধি করিলাম, নবী চরিত্রের আসল স্বরূপ আমার বোঝা হয় নাই। তারপর পড়িয়াছি যথাসাধ্য এবং শুনিয়াছি বিস্তর কিন্তু এখনও সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সকল দিক সম্যক বুঝিয়াছি– এ দাবী করিতে পারি না। বিষয়টি বাস্তবিকই দুরূহ। তবে যতটুকু বুঝিয়াছি। সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম।"

এমনিভাবে প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচিত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিশোরদের জন্য কবি আল মাহমুদ রচিত 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা]' ও কবি নূরুল হুদা রচিত 'মহানবী' গ্রন্থ দু'টি অনবদ্য হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রতিনিয়ত সীরাত চর্চা ও প্রকাশনা হচ্ছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা মিলে প্রায় হাজারের কাছাকাছি প্রকাশনা বাংলা ভাষায় রয়েছে।

'বাংলা ভাষায় রাসূল [সা] বিষয়ক গ্রন্থ' শিরোনামের আমার একটি লেখায় ৮০২টি পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা [দেখুন; সাহিত্য-সংস্কৃতি : সীরাতুন্নবী সংকলন-২০০১] পেশ করেছি। ফলে আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায়ও সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে আরো সমৃদ্ধ অবদান সংযোজিত হবে।■

www.pathagar.com

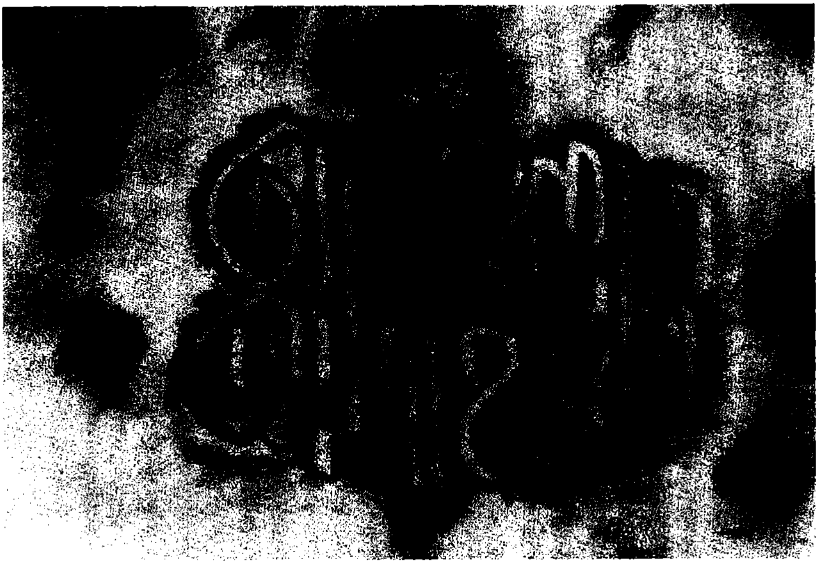

গ্রন্থপঞ্জী

১. ইসলামী বিশ্বকোষ [বিভিন্ন খণ্ড], সম্পাদনা পরিষদ, ই ফা বা।
২. বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, পঞ্চদশ সং-১৯৭৮।
৩. বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা, মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৪. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী [১ম খণ্ড], আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।
৫. মহানবী মুহম্মদ নূরুল হুদা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।
৬. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, আজহার ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।
৭. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা [সা] সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৯৮।
৮. হযরত রাসূল করীম [সা] জীবন ও শিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, ই ফা বা, ১৯৯৭।
৯. নূরনবী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, মার্চ-১৯৯৫।
১০. অগ্রপথিক, সীরাত সংখ্যা, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০১ ই ফা বা।
১১. ই ফা বা প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকা, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ২০০০।
১২. সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক, জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ২০০১।
১৩. সাহিত্য সংস্কৃতি, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৬, ২০০০ ও ২০০১।
১৪. মাসিক মদীনা [সীরাতুন্নবী সা. সংখ্যা '৯৯], সম্পাদক : মুহিউদ্দীন খান।
১৫. ইসলামী সংস্কৃতি [বিশ্বনবী সংখ্যা' ১৯৯৮], সম্পাদক : আবু রিদা, কলকাতা।

www.pathagar.com

উসওয়াতুন হাসানা

আবেদুর রহমান

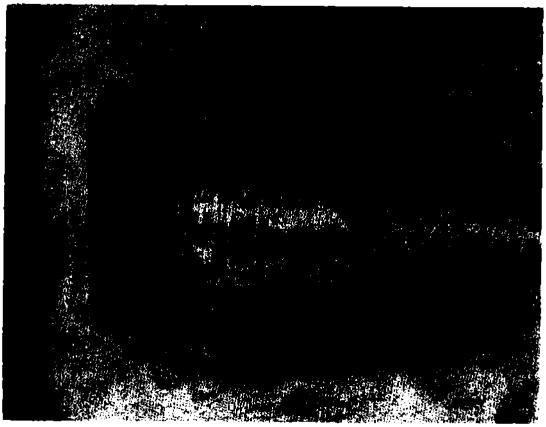

কি মজার বিষয় যার পিতার মৃত্যুর ৫ মাস পর জন্মগ্রহণ করলেন! জন্মের ৬ বছর পর মায়ের মৃত্যু হলো। এরপর দাদা তারপর চাচার নিকট মানুষ হলেন। যিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করলেন না। সেই মানুষটিই হয়ে গেল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

যিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, ন্যায়বিচারক, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, সেনানায়ক এবং রাষ্ট্রনায়ক।

যার চরিত্রের ভূষণ ছিল, সততা, উদারতা, আমানতদারী ও নম্রতা ইত্যাদি। যিনি পৃথিবীর সকল মানুষ তথা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনিই হলেন সর্বকালের সর্বযুগের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] যাকে সৃষ্টি না করা হলে পৃথিবীর কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ৫৮৪ খৃষ্টাব্দে "হরবে ফুজ্জার" এর নৃশংসতা, বিভীষিকা ও তাণ্ডবলীলা দেখে বালক মুহাম্মাদ [সা] দারুণভাবে ব্যথিত হন। তখন চাচা হযরত যুবায়ের [রা]ও কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে অসহায় ও দূর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শান্তি শৃংখলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত অংগীকার নিয়ে গড়ে তোলেন "হিলফুল ফুজুল" নামক একটি সমাজ সেবামূলক সংগঠন। ভবিষ্যতে নেতা

www.pathagar.com

হওয়ার এটা একটি শুভ লক্ষণ। তিনি যে মহামানব ছিলেন তা তাঁর জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়। কারণ তাঁর জীবনাচারণ বিশ্বের সকল যুগের মানুষের জন্য অনুকরণীয় ছিল। যেমন তাঁর বয়স ২৫ হওয়া সত্ত্বেও ৪০ বছর বয়সী বিধবা নারী বিবি খাদীজাকে [রা] তিনি বিবাহ করেন।

'হুদায়বিয়ায় সন্ধি' শর্তাবলী। শর্তাবলীতে তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে কুরাইশরা মুসলমানদের ঠকিয়েছে, তাছাড়াও লেখার পর কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর সন্ধিপত্র থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য দু'টি কেটে দেয়ার জন্য দাবি করেছিল। কিন্তু সন্ধিপত্রের লেখক হযরত আলী [রা] তা মেনে নিতে রাজি হলেন না।

অবশেষে বিশ্বনবী [সা] সুহায়েল বিন আমরের আপত্তির প্রেক্ষিতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য দু'টি নিজ হাতে কেটে দেন এবং এর পরিবর্তে সুহায়েল বিন আমরের দাবি অনুযায়ী 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ লিপিবদ্ধ করার জন্য হযরত আলী [রা]-কে নির্দেশ দেন। এ ধরনের ত্যাগ শিকার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নাই।

এভাবেই তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তায়েফে কাফেরদের পাথরের আঘাতে তাঁর শরীর রক্ত রঞ্জিত হওয়ার পরও তিনি তাদের জন্য দোয়া করেছেন। কে আছে এমন মানুষ এ ধরাতে।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ওমর ফারুক [রা] কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করে মুহাম্মাদ [সা]-এর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

কিন্তু তাঁর দীর্ঘ দিনের শত্রুকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করে দেন। ক্ষমার এই মহান আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরল।

এই পৃথিবীতে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বা জীবনের বিদায়ী ভাষণে মানুষ শুধু তার স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের নসীহত করে এবং সম্পদ বণ্টনের দিক নির্দেশনা দেয়। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবাধিকার সম্পর্কিত যে সনদপত্র ঘোষণা করেন দুনিয়ার ইতিহাসে তা আজও অতুলনীয়।

আমি আজ ভাষণ থেকে শুধু একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করবো যা তিনি কাজের লোকদের বিষয়ে বলেছেন, "চাকর চাকরানীদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তাই খেতে দেবে; তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকে তাই [সমমূল্যের] পরিধান করতে দেবে।"

একটি হাদীস- আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : যখন তোমাদের কারও খাদেম গরম এবং ধোঁয়া সহ্য করে খাবার তৈরী করে নিয়ে আসে, তখন সে যেন তাকে নিজের সাথে বসিয়ে আহার করায়, অবশ্য খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয় তবে সে যেন অন্তত তার হাতে দু-এক লোকমা তুলে দেয়। [মুসলিম]

www.pathagar.com

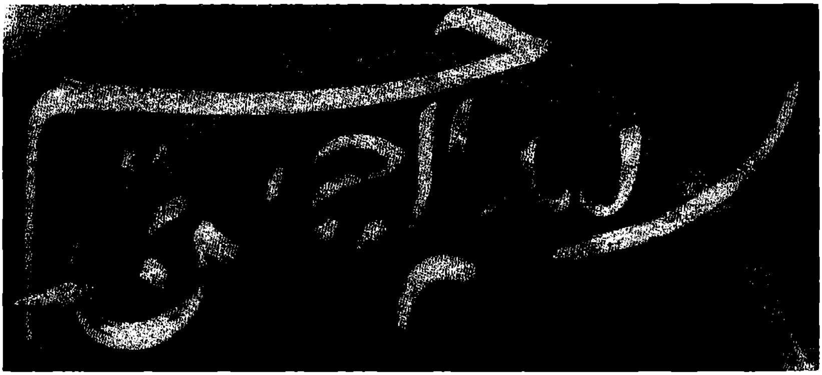

অন্য হাদীসে রাসূল [সা] সাধ্যাতীত কোন কাজ দিতে নিষেধ করেছেন। তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করাকে নিষেধ করেছেন এবং ভাল ব্যবহার করতে বলেছেন। কিন্তু আমরা কি করছি?

আমাদের অধিকাংশেরই পরিবারের সবচেয়ে অসহায় মানুষটি হচ্ছে সে যাকে আমরা বুয়া বলে ডাকি। প্রথমে ডাকার মধ্যেই একটি অবহেলা।

এরপর খাবার, পোশাক তারটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিম্নমানের। ব্যবহারের ব্যাপারে কোন কথাই নেই সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার। আমি কোন কোন পরিবারে দেখেছি কাজের বৃদ্ধ পুরুষ লোকটিকে পরিবারের সকলেই বুড়া মিয়া বলে ডাকছে এমনকি পাঁচ বছরের ছোট শিশুও।

অনেকে আবার মনে করেন কাজের লোককে বেশী লাই দেওয়া যাবে না অর্থাৎ তার প্রাপ্য সঠিকভাবে দেওয়া যাবেনা। এটা নিজেদের বানানো একটা থিওরী।

আমি আমাদের সকলের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই তাহলে রাসূল [সা] নির্দেশগুলো কি অবাস্তব ছিল? না আমরা সীমাবদ্ধতার মধ্যে ডুবে আছি। আসুন এ বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করি এবং রাসূলের নির্দেশ আমলের মাধ্যমে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাই। একজন খ্রিষ্টান লেখক উইলিয়াম মুর বলেছেন, "He was the mater mind not coly of his own age but of all ages" অর্থাৎ মুহাম্মাদ [সা] যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে শুধু সে যুগেই একজন মনীষী বলা হবে না, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।■

www.pathagar.com

আসল ঠিকানা

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

রবীন্দ্রনাথের কবিতার নায়ক উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমিকে বলা হয়েছে "শুধু বিঘে দুই"। মানে মাত্র দুই বিঘা।

রবীন্দ্রনাথের যুগে দুই বিঘা জমি হয়তো অতি সামান্য বিষয় ছিল। কিন্তু আবুল মিয়ার ছেলে মনু মিয়ার দুই কাঠা জমি এখন অনেক মূল্যবান।

উপেনের জমির মত মনু মিয়ার এই জমি মিথ্যে দেনার ক্ষতে ডিক্রি জারি করে কেউ নিলামে কিনে নেয়ার সম্ভাবনা নেই। আবুল মিয়াকে এ জমি লিখে দিয়ে গেছেন তার মনিব হাজী ফজর আলী। দীর্ঘদিন ফজর আলীর বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করে পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছিল আবুল মিয়া। বিশ্বস্ত গৃহভৃত্যরা তখন এমনি করেই পরিবারের অংশ হয়ে যেত। ফজর আলী মৃত্যুর আগে তার বিশাল ভূভাগ থেকে দুই কাঠা জমি আবুল মিয়াকে দিয়ে গেছেন পরবর্তী বংশধরদের বংশ পরম্পরায় বিশ্বস্ততার সাথে খেদমত করার জন্য।

ফজর আলীর সুশিক্ষিত সুযোগ্য সন্তানেরা ধান, পাট, সরিষা, জব, ভুট্টার খেত ও গোচারণ ভূমির মত অলাভজনক কাজে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট নন। তাদের চোখে রঙিন স্বপ্ন। তাই গড়ে তুলেছেন বিশাল আবাসন প্রকল্প "স্বপ্নের ঠিকানা"।

www.pathagar.com

শত শত বিঘা জমি মাটি ভরাটের সময় আবুল মিয়ার দুই কাঠা জমি এমনিতেই ভরে যায়। ফজর আলীর বড় ছেলে স্বপ্নের ঠিকানার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করম আলী একদিন বলেছিল :

– আবুল মিয়া, তুমিতো বুড়ো হয়ে গেছ। একমাত্র ছেলে মনু মিয়া ছাড়া কেউ নেই তোমার। জমিটুকু ফেলে না রেখে স্বপ্নের ঠিকানায় মিলিয়ে দাও। বিনিময়ে তুমি একটা ফ্লাট নিয়ে যাও।

আবুল মিয়া পরামর্শ করে তার শিক্ষিত ছেলে মনু মিয়ার সাথে। মেট্রিক পর্যন্ত ছেলেকে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল সে। প্রস্তাব শুনে মনু মিয়ার মনে পড়ে যায় দুই বিঘা জমির লাইন দুটি।

"সপ্তম পুরুষ যেখানে মানুষ, সে মাটি সোনার বাড়া
দৈন্যের ধায়ে বেঁচিবো সে মায়, এমনি লগ্নিহারা?"

সপ্তম পুরুষ না হলেও শিশুকাল থেকে তার বাবা তাকে এই জমিতে মানুষ করেছেন। মাটির মমতা উপেনের চেয়ে তার কম নয়।

মনু মিয়ার কথা শুনে উপেনের বাবুর মত আঁখি লাল করেনি করম আলী। নির্বিঘ্নে থাকতে দিয়েছেন আবুল মিয়া ও মনু মিয়াকে।

আবুল মিয়াদের মত সাধারণ মানুষ এখনও স্বাভাবিক মৃত্যুর সুযোগ পায়। কিছু দিন রোগে ভুগে একদিন শেষ বিদায় নেয় আবুল মিয়া। দুই কাঠা জমি থেকে কমে যায় সাড়ে তিন হাত জায়গা। নিজের জমিতেই চিরশয়নের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় আবুল মিয়াকে।

'স্বপ্নের ঠিকানা'র কাজ এগিয়ে চলে দ্রুত গতিতে। প্রতিদিন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয় কালার বিজ্ঞাপন। ঢাকা শহরে নিজের বাড়ি। ভাড়ার টাকায় ফ্ল্যাট কিনুন। প্লট ও ফ্ল্যাট বুকিং চলছে।

"এই এক গাঁও ঐ এক গাঁও মধ্যে ধূ ধূ মাঠ"

ধূ ধূ মাঠের বুকে মাথা তুলছে বড় বড় বাড়ি আর বিশাল টাওয়ার। গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছের জায়গায় এখন ইট, বালি, সিমেন্ট, পাথর ও রডের স্তূপ।

গায়ক হওয়ার কোন স্বপ্ন ছিল না মনু মিয়ার। তবু স্কুলের ফাংশনে মন দিয়ে শুনতো কিছু গান। যেমন :

"আকাশের হাতে আছে এক হ্রাস নীল
বাতাসের আছে কিছু গন্ধ
রাত্রির গায়ে জ্বলে জোনাকী
তটিনীর বুকে মৃদু ছন্দ"...

গভীর রাতে দুই কাঠা জমিতে দাঁড়িয়ে দেখতো নীল আকাশ, ফুলের গন্ধে বিমোহিত হত

www.pathagar.com

মন। ফুর ফুর বাতাস, ঝিঁ ঝির ডাক, জোনাকীর আলো অবচেতন মনে সুর জাগাতো। গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠতো–

"আকাশের ঐ মিটি মিটি তারার সাথে কইবো কথা
নাইবা তুমি এলে... ।"

স্বপ্নের ঠিকানা বদলে দিয়েছে চির চেনা মনু মিয়ার স্বপ্নের পৃথিবীকে। তবু একটু একা হলেই মনে পড়ে যায় ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

"বর্ষার ঝর ঝর সারাদির ঝরছে
মাঠ ঘাট থৈ থৈ খাল বিল ভরছে।"

কোথায় সেই থৈ থৈ মাঠ ঘাট? কোথায় ভরা খাল বিল! সারাদিন ঝরার দরকার নেই। ঘণ্টা দুই ঝরলেই রোড-লেন, অলি-গলি ড্রেনের নোংরা পানিতে থৈ থৈ। বর্ষার থৈ থৈ পানিতে সারাদিন লাফ ঝাপ আর ডুব সাঁতার কেটে খেলা করেছে মনু মিয়া। এখন একটু পা ডুবলেই সারাদিন চুলকায়।

রামপুরা খাল থেকে টঙ্গীর তুরাগ নদী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড শীতকালে ছিল ধূ ধূ পান্তর আর বর্ষাকালে সাগরের মত! কখনো নদী না দেখেও মনু মিয়া গান গাইতো–

"নদীর কূল নাই, কিনার নাইরে..."!

কূল কিনারাহীন জলরাশির বুকে এখন বসুন্ধরা, বসুমতি, বনশ্রী, স্বদেশ নিকেতন, সুবাস্তু কোম্পানীর আবাসন প্রকল্প। সান ভ্যালী, নজর ভ্যালী, লেকভিউ, রিভারভিউ, মাতৃছায়া, শান্তি নীড়, আরো কত আকর্ষণীয় নাম!

সূর্যের আলো, মৌসুমী বায়ু, খাল বিলের পানি জীবন ধারণের জন্য ছিল যথেষ্ট। দিনের বেলা বাতির প্রয়োজন ছিল না। গরমে তাল পাতার হাত পাখাই ছিল যথেষ্ট আরাম দায়ক। তাই সুন্দর কবিতার লাইন দুটি ছিল অর্থবহ :

"যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি
আসু গৃহে তার দেখিবে না আর নিশিতে প্রদীপ বাতি।

মনের হরষে বাতি জ্বালানোর অবকাশ আছে কার? লোড শেডিং হলেই মুদী দোকানে কেরসিন মোমবাতির লাইন। সিলিং ফ্যান না ঘুরলেই ঘামে ভিজে গোসল। ওয়াসার পাম্প বন্ধ হলেই অযু-গোসল, পাক-সাফ, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর নতুন রূপের কাছে হার মানতে হয় মনু মিয়ার। তাই মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। বিশাল হাউজিং প্রকল্প এলাকায় এতিমের মত অসহায় জমিটুকু ফেলে না রেখে কাজে লাগাতে হবে। অতি দ্রুত পরিকল্পনা করে ফেলে সে। নিজেই নিজের জমিতে গড়ে তুলবে আবাসন প্রকল্প।

প্রকল্পের নাম– 'শেষ ঠিকানা।' কাগজ পেন্সিল আর স্কেল নিয়ে নিজেই করে ফেলে প্রকল্পের নকশা। দুই কাঠা জমিতে তৈরী হবে ষাটটি প্লট। বয়স্কদের জন্য সাড়ে তিন হাত বাই দুই হাত ৪০টি এবং শিশুদের জন্য দেড় হাত বাই এক হাত ২০টি। প্রতিটি

www.pathagar.com

প্লটের মূল্য ৫০ হাজার ও ৩০ হাজার টাকা। ডাউন্ট পেমেন্ট ও কিস্তির সুযোগ নেই। নগদ টাকা প্রদানের সাথে সাথেই প্লট হস্তান্তর।

ঘর সাজানোর সব জিনিসেই পাওয়া যায় বিদায় স্টোরে। কিন্তু ঘর পাওয়া যায় না। তাই একচেটিয়া ঘরের ব্যবসা করবে মনু মিয়া।

"বিচারপতির বিচার হবে কোন মাঠে, কার আদালতে?
সাড়ে তিন হাত জমিন লেখা আছেরে সবার বরাতে!"

সামর্থ্যবান মানুষ চায় তাদের সমাধি চিরদিন স্মৃতিচিহ্ন হয়ে টিকে থাকুক। আজিমপুরের ক্ষণস্থায়ী কবর তাদের কাম্য নয়। বাড়ির আঙ্গিনায় কবর খোঁড়াও কেউ পছন্দ করে না। সাড়ে তিন হাত জমি আলাদা কোথাও কেনা যায় না। দেড় কোটি মানুষের ঢাকা শহরে প্রতি ঘণ্টায় মানুষ মরছে। আসল ঠিকানার প্লট বেশীদিন পড়ে থাকবে না।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরদিনই ইন্তিকাল করেন 'স্বপ্নের ঠিকানার' ম্যানেজার করম আলী। হাতের কাছেই মিলে যায় আকাঙ্ক্ষিত সাড়ে তিন হাত প্লট। বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে প্লট বরাদ্দের জন্য বেশী না হলেও সামান্য জটিলতা মুকাবিলা করতে হয়। ঘরে লাশ রেখে এটুকু ঝামেলাও পোহাতে হলো না।

গৃহভৃত্য আবুল মিয়ার কবরের পাশেই তৈরী হয় হাজী ফজর আলীর কোটিপতি সন্তান করম আলীর শেষ ঠিকানা।

নির্মাণ শৈলীতেও কোন পার্থক্য নেই। সাড়ে তিন হাত গর্তের ওপর কাঁটা বাঁশের মাচা। অনতিদূরে এক ভিক্ষুক সুর করে গান গাইছে :

"বাত্তি নাই, বাত্তি নাইরে অন্ধকার কবরে!"

ইচ্ছে করলেই বাঁশের মাচার নিচে একটা টিউব লাইট কালেকশন দেওয়া যায়। করম আলীর মত মানুষের কবরে এয়ার কন্ডিশনও লাগানো যায়। তবু কেউ সে ইচ্ছা করে না। মাটির নিচে শায়িত মানুষের জন্য আপন জনের আর কিছু করার নেই। মাটির ওপরে কেউ কেউ কিছু করে।

রাজনৈতিক নেতাদের কবরের ওপর স্মৃতিসৌধ তৈরী হয়। পীরের কবরে গম্বুজ ওয়ালা মাজার হয়। জন্ম মৃত্যু বার্ষিকীতে আলোক সজ্জা হয়, ফুলের তোড়া, আগর বাতি, মোমবাতি, গোলাপ পানি, সেন্ট আতর অনেক কিছু দেখা যায়। কিন্তু মাটির নিচে ২০ টাকার ৬০ পাওয়ারের একটা বাল্ব কেউ দেয় না।

করম আলীর ভাই-ভাতিজারা মৃতুদেহ কফিনে সাজিয়ে অনায়াসে 'স্বপ্নের ঠিকানা' থেকে বের করে আসল ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। ৫০ হাজার টাকার বান্ডেলটা হাতে নিয়ে করুণ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে সে দৃশ্য মনু মিয়া। আসল ঠিকানার প্রথম কাস্টমার প্লট বুঝে নিয়ে বাড়িতে পদার্পণ করছেন। মনু মিয়ার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে :

"পৃথিবী তোমার আসল ঠিকানায় নয়
মরণ একদিন মুছে দিবে সকল রঙ্গিন পরিচয়!"■

www.pathagar.com

মানবদেহে কুসুম-কলি

মোহাম্মদ সফিউদ্দিন

মানব জীবনে শিক্ষার শেষ নেই। আমাদের নবী করীমের [সা] জীবনেও শিক্ষার অভাব ছিলো না। তিনি একা একা সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভাবতেন। হাঁটতে-বসতে-ঘুমুতে প্রতি মুহূর্তে মানবগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর হৃদয়ে কম্পনের সৃষ্টি হতে থাকে।

একদিন একা পথ চলতে গিয়ে শুনতে পেলেন– 'হে মুহাম্মাদ! তিনি এদিক ওদিক তাকালেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন। আবার সেই মিষ্টি কণ্ঠ– 'হে মুহাম্মাদ!' এবার তার হৃদয় কেঁপে ওঠে। তিনি চলে আসেন নিজ গৃহে। ভাবতে থাকেন কে সে? আমাকে ডাকছে অথচ আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

স্বামীর চেহারা দেখে খাদীজা [রা] বিবি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এমনকি ঘটেছে যে আপনার মন খারাপ? চেহারায় দুশ্চিন্তার প্রভাব বিদ্যমান! আপনি সব খুলে বলুন।

নবী করীম [সা] প্রিয় স্ত্রী খাদীজা [রা] বিবির কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব শুনে জ্ঞানবতী খাদীজা [রা] বিবি অভয় দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আল্লাহ আপনার হিফাযত করবেন নিশ্চয়ই।

খাদীজা [রা] বিবির কথাতেও তাঁর হৃদয়ের কম্পন দূরীভূত হলো না।

www.pathagar.com

বরঞ্চ আরো ঘনীভূত হতে লাগলো। তাঁর মনে বার বার বেজে ওঠে সেই ডাক– সেই কণ্ঠস্বর– 'হে মুহাম্মাদ! আপনি রাসূলুল্লাহ, আপনি আল্লাহর রাসূল।'

নবী করীম [সা] সবকিছুই খাদীজা বিবির সঙ্গে আলোচনা করতেন। খাদীজা বিবি কোনো বিষয়ে বুঝতে না পারলে তিনি ছুটে যেতেন তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযার কাছে। তিনি ছিলেন পার্থিব জ্ঞানে খুব পারদর্শী। খাদীজা [রা] ওয়ারাকাকে বললেন, ভাই আমি মিসরার কাছ থেকে জেনেছি মুহাম্মাদ সিরিয়ায় পৌঁছে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম করছিলেন। ওই গীর্জার ধর্মযাজক মিসরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, গাছের নিচে যে যুবক বিশ্রাম করছে সে কে?

মিসরা জবাবে বললেন, তিনি হারামের অধিবাসী জনৈক কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তি। ধর্মযাজক তখন বলেন, এ গাছের নিচে কোনো নবী ছাড়া অন্য কেউ বিশ্রাম নিতে পারেনি এবং পারবেও না।

মিসরা আবার বললেন, বিশ্রাম শেষে পথ চলছি। দুপুরে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ। দেখতে পাই দু'জন ফিরিস্তা মুহাম্মাদকে [সা] ছায়া দিয়ে রৌদ্র তাপ থেকে রক্ষা করছেন। তাছাড়া কদিন যাবৎ তিনি শুনতে পাচ্ছেন– 'হে মুহাম্মাদ আপনি রাসূলুল্লাহ। আপনি আল্লাহর রাসূল।'

সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন, খাদীজা, এসব ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, মুহাম্মাদ এ যুগের নবী। আমি জানি বর্তমান বিশ্ব সমাজে একজন নবীর আগমন ঘটবে এবং তিনি খুব শীঘ্রই আসছেন। তিনি চেহারায় হাসি ফুটিয়ে বললেন, এটা ইঞ্জিল শরীফে বর্ণিত সেই নবীর যুগ হবে।

ওয়ারাকা প্রতীক্ষিত নবীর আগমনের বিলম্ব হওয়ায় আক্ষেপ করে নিজেও শিহরিত হয়ে বললেন, সেই নবী আসতে আর কতো দেরি হবে? জানো খাদীজা আমি অত্যন্ত আগ্রহভরে সেই নবীর আগমনের দিকে পথ চেয়ে আছি। আমার আরো প্রত্যাশা থাকবে আমাদের মক্কার উচ্চভূমি ও নিচুভূমির মাঝ থেকে তোমার কথার বাস্তবরূপ। যে কথা তুমি ঈসায়ীয় ধর্মযাজকের বলে জানিয়েছো। জানো আমি ধর্মযাজকদের কথা বিকৃত করা একদম পছন্দ করি না।

খাদীজা তুমি আরো জেনে রাখো, মুহাম্মাদ খুব শীঘ্রই আমার তোমার বিশ্বের সরদার হবেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধবাদী হবে তারা সবাই পরাজিত হবে। তিনিই পুরো বিশ্বে সৃষ্টিকর্তার আলো ছড়াবেন। আর সেই আলো সমগ্র সৃষ্টিজগতকে করে তুলবে আলোকময়। যারা তাঁর সঙ্গে অযথা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবে তারা হবে নির্ঘাত পরাজিত। যারা মুহাম্মাদের সঙ্গে থাকবে তারা হবে বিজয়ী। আমার আফসোস। এ সময় যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তোমাদের সবার আগে আমিই তাঁর দলভুক্ত হবো।

ওয়ারাকার মুখে আগাম সংবাদ জেনে খাদীজা [রা] বিবির হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কখন সেই শুভক্ষণটি আসবে সে আশায় সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে নিজেকে সপে দেন। স্বামীর প্রতি আরো বিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন।

www.pathagar.com

নবী করীমের [সা] মন গৃহে বন্দি থাকছে না। কে যেনো তাঁকে অহরহ ডেকে চলেছে। দিন দিন লোকালয় ছেড়ে দূরে... আরো ... দূরে যেতে লাগলেন। তবু সে ডাকের যেনো শেষ নেই। যেতে যেতে জনমানবহীন হীরা পর্বতের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন।

জনমানবহীন সীমাহীন আওয়াজ হীরা পর্বতে। কিন্তু তাঁর চারপাশের গাছপালা, তরুলতা পাথর খণ্ড সবাই তাঁকে দেখা মাত্র বলে উঠছে, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!' নবী করীম [সা] ডানে বামে পিছনে ফিরে কাউকে দেখতে পান না। এতে তিনি আরো ভাবিত হয়ে ওঠেন।

হীরা পবর্তমালা শ্যামল ছায়ায় ভরপুর। বিশাল বিশাল গুহা রয়েছে অগণিত। আল্লাহর প্রিয় রাসূল নবী করীম [সা] মানবকুলের মুক্তির কাণ্ডারী একটি গুহায় বসে গেলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ধ্যানে। কিন্তু ধ্যানমগ্ন হলেও তাঁর বুকের কম্পন থামলো না। তাঁর ভেতরের না জানা হাহাকার কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না।

হৃদয়ে কম্পন নিয়েও আরো ধ্যানমগ্ন হয়ে ওঠেন। নাওয়া খাওয়ার কথা ভুলে যান। দিন-রাত কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতেই পারেন না। তিনি আরো উদ্যম নিয়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু এতেও যেনো শেষ নেই। অদৃশ্য কে যেনো তাঁকে আরো নিকটে যেতে ইঙ্গিত করছেন!

নবী করীম [সা] সে ইঙ্গিতে চমকিত। বিস্মিত। দৃষ্টিতে অনন্ত সুন্দর। মন তাঁর উদগ্রীব সুন্দরের কাছে যেতে। কিন্তু কে সেই সুন্দর? সে সুন্দর দেখা যাচ্ছে না কেনো? তাহলে কি এখানেই সৃষ্টির রহস্য লুকায়িত?

এভাবে দিনের পর রাত। রাতের পর দিন কেটে যেতে লাগলো। আল্লাহর সুগন্ধে বিভোর নবী করীম [সা] সবকিছু ভুলে গেলেন যেন। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। হৃদয় প্রচণ্ড আবেগে, উদ্বেগে, শঙ্কায় ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। কোন সে অজানাকে জানবার জন্য তাঁর অন্তর বিদীর্ণ করে চলেছেন?

হীরা পর্বতের গুহায় নবী করীম [সা] চির সুন্দরের সাধনায় মগ্ন থাকায় একাকিনী খাদীজা [রা] বিবি নিশ্চিত ছিলেন তাঁর স্বামী আল্লাহর হিফাযতে আছেন। তাঁর ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। তাই তিনি নিজেও নবীর কাজে কখনো বাধা দিতেন না। বরঞ্চ তিনি অন্যকেও কোনো রকম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করতে দিতেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার স্বামীর এতো দিনের সাধনা সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে।

নবী করীম [সা] প্রতি বছর এক মাস হীরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন কাটাতেন। তাঁর মনে সেই ধ্বনি- কে যেনো ডেকে বলছেন, 'ইয়া মুহাম্মাদ- হে মুহাম্মাদ। আপনিই রাসূল।'

অবশেষে এলো সেই শুভক্ষণ। রমযান মাস। গভীর রাত। হীরা পর্বতের নির্জন গুহায় বাহ্যিহীন ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ ভেসে এলো, হে মুহাম্মাদ!

নবী করীম [সা] স্পষ্ট শুনতে পেলেন। চোখ মেলে তাকালেন। সামনে দেখতে পেলেন মহাজ্যোতির্ময় জিবরাইল [আ] দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর রূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ভেতর আলো ঝলমল করছে।

www.pathagar.com

নবী করীম [সা] সে আলোকছটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর পুরো অন্তর আত্মা প্রকম্পিত হতে লাগলো। তিনি বিস্ময় দৃষ্টিতে জিবরাইলের [আ] দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নবী করীমকে [সা] তাকিয়ে থাকতে দেখে অতি সুন্দর আলো কণিকায় বিদ্যুৎ চমকিত। পর মুহূর্তেই জিবরাইল [আ] ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি পাঠ করুন! পাঠ করুন।

নবী করীম [সা] নিরক্ষর। তিনি পড়বেন কি করে? তিনি বললেন, আমি যে পড়তে জানি না। তাই আমি পড়বো কি করে?

জিবরাইল [আ] দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। নবী করীম [সা] কিছু বুঝে ওঠার আগেই জিবরাইল [আ] তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মুক্ত করে দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ, এবার পাঠ করুন।

এবারো নবী করীম [সা] বললেন, আমি যে পড়তে জানি না। আমি কি করে পড়বো?

জিবরাইল [আ] আবার তাঁকে জড়িয়ে ধরেই মুহূর্তের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তারপর আবার বললেন, পাঠ করুন হে মুহাম্মাদ।

আল্লাহর ইশারা কারো বুঝবার ক্ষমতা নেই। নবী করীম [সা] এবার আগের মতো সরাসরি বলতে পারলেন না– আমি পড়তে জানি না। তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন, আমি কি পড়বো?

জিবরাইল [আ] আবার তাঁকে জড়িয়ে বুকের সঙ্গে টেনে নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ছেড়ে দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ আর দেরি করছেন কেনো? আপনি তাড়াতাড়ি পড়ুন। ‘পাঠ করো তোমার সেই মহান প্রভুর নামে, তিনি সমস্তই সৃষ্টি করেছেন।’ নবী করীম [সা] ‘ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল লাযী খালাক’ পড়তেই শিহরিত হলেন। কিন্তু অকল্পনীয় রহস্যে তিনি আবেগে আপ্লুত-অভিভূত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

আলোয় আলোময় যেনো বিশ্ব। পৃথিবীর বুকে কি আল্লাহর রওশানি নেমে এলো? নবী করীমের [সা] হৃদয়ে আলোর বন্যা প্রবাহিত হতে লাগলো। তাঁর মনপ্রাণও যেনো সৃষ্টির কল্যাণের চিন্তায় প্রজ্জ্বলিত হতে থাকলো। তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চোখ মেলে তাকালেন সেই সুন্দরের দিকে। কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় সুন্দর নেই। আছে জিবরাঈল [আ]। তিনিও আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

নবী করীম [সা] মুহূর্তে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি কি করবেন ভাবতেই পারছিলেন না। অতি আনন্দেও ভয়ে তাঁর দেহে কম্পন বেড়ে গেছে। শরীরে যেনো জ্বরের প্রকোপ সৃষ্টি হচ্ছে। এরকম আগে কখনো অনুভব হয়নি। তিনি দ্রুত পদে নিজ গৃহে ছুটে এলেন।

খাদীজা [রা] বিবি স্বামীর মুখপানে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন ভেবেছেন। কিন্তু নবী করীম [সা] বললেন, খাদীজা আল্লাহর দোহাই, তুমি আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। জলদি কাজটি সমাধা করো।

খাদীজা [রা] বিবি নবীর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর গা কাঁপতে লাগলো। সে কাঁপনে খাদীজা [রা] বিবির মনে ধারণা জন্ম নিলো নিশ্চয়ই তাঁর কঠিন অসুখ হয়েছে। স্বামীর অসুখের কথা ভেবে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

কিছু সময়ের মধ্যেই খাদীজা [রা] বিবির মনের আশঙ্কা দূরে ঠেলে দিয়ে নবী করীম [সা] কম্বল সরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন।

নবীর সমস্ত কথা শুনে যোগ্য স্ত্রী খাদীজা [রা] বিবি বুঝতে পারলেন ভয়ের কিছুই নেই। তাই তিনি বললেন, আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। আজ যা ঘটে গেছে এতে আপনি খুশি থাকুন। নিজের মনকে সাহসী করে তুলুন। জীবন মরণ যার হাতে আমার বিশ্বাস তিনি আপনার মঙ্গল করবেন। আমি আরো বিশ্বাস করি আল্লাহ আপনাকেই পৃথিবীর মানুষের মঙ্গলের জন্য নেতৃত্ব দান করবেন। আমি আল্লাহর নামে বলছি আল্লাহ আপনাকে কখনো বিপদে ফেলবেন না। কারণ আপনি ইতোমধ্যে মক্কা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন। কাজে কর্মে কথাবার্তায় আপনি সত্যবাদী। অন্যের দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আপনি নিজের কাঁধে বহন করে নেন। আপনি মেহমানদের যোগ্য সম্মান দিয়ে থাকেন। আপনি অন্যের বিপদে নিজেকে বিলিয়ে দেন। কেউ আপনার ক্ষতি করতে চাইলেও তাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

খাদীজা [রা] বিবির চোখে ঘুম নেই। বিয়ের পর থেকেই নবী করীমের [সা] আল্লাহ প্রিয়তার কথা দেখে আসছেন। পনেরো বছর সংসার জীবন কাটাচ্ছেন। কখন কি হচ্ছে, ইঞ্জিল শরীফে তাঁর সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছেন। তাই নবীর স্ত্রী হিসেবে তারও কিছু করণীয় রয়েছে। নবীকে পূর্ণ সহযোগিতা করা তাঁর একান্ত কর্তব্য বলে মনে করছেন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের মানুষের মাঝে কি আল্লাহর দীনের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবেন?

প্রাণী জগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই যারা মানুষের মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে, যারা দুনিয়ার সুখের মোহে সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে হানাহানি মারামারিতে মেতে উঠেছে তাদের খোদার দীনি আলোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য প্রতিটি মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে সুস্থ সবল করে তোলা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি মানুষ ক্ষয়িত বিপথগামী হয়ে গেলে তাদের সেই অন্ধকার পথ থেকে তুলে আনা, সেতো নবী করীমের [সা] পক্ষেই সম্ভব। খাদীজা [রা] বিবি মনে মনে সুদূর চিন্তায় নিজেকে নিয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কে সেই শক্তি? যিনি মুহাম্মাদকে [সা] অনিন্দ্য কাব্য শব্দমালা শিখিয়ে দিয়েছেন?

খাদীজা [রা] বিবি নিজেও সেই সুন্দর শব্দমালা মুখস্থ করে নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরেও ভয়ের উদ্রেক উত্থিত হতে লাগলো যে মুহাম্মাদ [সা] তাঁকে যা যা শুনিয়েছেন তা যদি কুরাইশদের মাঝে বর্ণনা করেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। এতে তারা হয়তো মুহাম্মাদকে [সা] বিব্রত করতে পিছপা হবে না।... স্বামীর চিন্তায় খাদীজা [রা] বিবি স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর হৃদয় নানা চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হতে লাগলো। ভবিষ্যৎ জীবন কি হবে ভাবতে গিয়ে মনের কোণে ভেসে ওঠে– না কেউ মুহাম্মাদের [সা] কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

নবী করীম [সা] ঘুম থেকে জেগেই পাশে দেখতে পেলেন খাদীজা [রা] বিবি উৎসুক

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তা দেখে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। বুঝতে পারলেন তিনি যা বলেছেন তা খাদীজা [রা] বিবি আনন্দচিত্তেই গ্রহণ করেছে।

খাদীজা [রা] বিবি এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে নবী করীমকে [সা] আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মে আস্থা এনে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

ওয়ারাকা বিন নওফেল খাদীজা [রা] বিবিকে যা যা বলেছিলেন তা নবী করীমকে [সা] বললেন। এতে নবী করীম [সা] একটু স্বস্তি পেলেন। তারপর কাবা শরীফের পাদদেশে গিয়ে ওয়ারাকা বিন নওফেলের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা বয়ান করলেন।

ওয়ারাকা বিন নওফেল নবীর মুখে সব শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, হযরত মূসার [আ] ওপর যা নাযিল হয়েছিলো আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই তোমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। একথা অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করবে না। তারা বরঞ্চ তোমার ওপর আঘাত করবে। তারা তোমার ক্ষতি করবে। তোমাকে মক্কা ত্যাগে বাধ্য করবে। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। আমি যদি সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আল্লাহর জন্য আমি তোমার পাশে অবশ্যই থাকবো। এক পর্যায়ে ওয়ারাকা নবীর কপালে চুমু খেলেন।

ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করা অত্যন্ত কঠিন। মক্কা নগরীসহ পুরো আরবীয় সমাজের মানুষ মদে আসক্ত। জুয়া খেলায় মত্ত। লুটতরাজে যাদের জুড়ি নেই তাদের কি করে ন্যায়ের পথে আনা যাবে? তাছাড়া যারা পাথর মূর্তি, গাছ-পালার পূজো করে আসছে তাদের কিভাবে ওইসব বন্ধ করানো যাবে? যাদের বংশ পরম্পরায় কাবা শরীফের ভেতর মূর্তিতে মূর্তিতে ভরে রেখেছে তাদের কি চৈতন্যদয় ঘটবে ওইসব বিসর্জন দিয়ে এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার?

খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত পণ্ডিত ওয়ারাকা বিন নওফেলের কথা স্মরণ হলো– 'অবিশ্বাসীরা তোমার ওপর অত্যাচার করবে। তারা তোমার ক্ষতি করবে। তোমাকে মক্কা নগরী ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। তোমার সঙ্গে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।'

নবী করীম [সা] মহাচিন্তায় পড়ে গেলে তিনি খাদীজা [রা] বিবির সঙ্গে আলাপ করতেন, এতে খাদীজা [রা] বিবি হযরতের মনে শান্তি আনতে পারতেন। তাঁর সাহচর্য না পেলে তিনি দুর্বিসহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়তেন।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আল্লাহর প্রতি বিশেষ আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর ভালোবাসা, নৈকট্য পেতে হলে তাঁর সেবায় নিজেদের উজার করে দিতে হবে। তাঁরা উভয়ে নামাযের কথা অনুভব করলেন। নামায না পড়লে আল্লাহকে পাওয়া যাবে কেমনে? আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাকে পাঠিয়ে নামায পড়ার নিয়ম-কানুন এবং দোয়া-দরুদ শিখিয়ে দিলেন।

নবী করীম [সা] নামায আদায়কালে খাদীজা [রা] বিবিও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করতেন। তাঁরা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকলেও পুরো মক্কা নগরীর মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন। কোথাও কি কেউ জেগে নেই? কেউ কি আল্লাহর পথে এগিয়ে আসতে পারে না?

www.pathagar.com

আল্লাহর ইবাদত করছেন। নবী করীম [সা] এবং খাদীজা বিবির নামায পড়ার বিষয়টি কিন্তু একজনের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। তিনি প্রতিদিন লোকচক্ষুর আড়ালে পর্যবেক্ষণ করে যেতে লাগলেন।

লোকটি ভিন্ন গোত্রের কেউ নন। তিনি হযরতের চাচা আবু তালেবের জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত আলী। আলী বয়সে কিশোর হলেও তাঁর মাথায় প্রখর বুদ্ধি রয়েছে। তাই একদিন হযরতের কাছে এসে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, আল আমিন আপনারা কার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত সিজদা দিয়ে চলছেন?

কিশোর বালকের কথায় হযরত বললেন, আমরা সিজদা করি বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আল্লাহর কোনো পিতা-মাতা নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনিই পৃথিবীর সবকিছুর অধিকর্তা। মানুষের প্রতি তাঁর দয়া মায়ার অন্ত নেই। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সর্বশক্তিমান। নবী করীম [সা] বললেন, কাজেই তুমিও আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাও।

হযরত আলী কিশোর। হঠাৎ ধর্ম পরিবর্তনের কথায় মনে দ্বিধা জাগে। তিনি নবীকে বললেন, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে নিই। পরে আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাবো। কিন্তু পরের দিনই আবার এসে বললেন, বাবাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তো বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে সৃষ্টি করেননি। কাজেই আমিই বা কেনো বাবার অনুমতি না নিয়ে আল্লাহর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো না?

নবী করীমের [সা] কাছে বায়আত গ্রহণ করলেন। তিনিই পুরুষের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ইসলামের ওপর আস্থা আনলেন। শুধুই তাই নয়, কিশোরদের মধ্যেও প্রথম। তারপরে তৃতীয় ব্যক্তি হলেন মিসরা। যিনি এক সময় খাদীজা [রা] বিবির ক্রীতদাস ছিলেন। তাকে নবী করীম [সা] মুক্ত করে দিয়ে নিজের পুত্ররূপে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ দিনের বন্ধু আবু বকর [রা] নবী করীমের [সা] ওপর অগাধ আস্থাশীল ছিলেন। তিনি মক্কা নগরীতে খুবই সম্পদশালী ব্যক্তি। জ্ঞানে ও গুণে তাঁর তুলনা মেলা ভার। রাসূলের [সা] পরেই তাঁর স্থান ছিলো মানুষের মাঝে।

নবী করীম [সা] মনে মনে স্থির করলেন তিনি কুরাইশদের মাঝে ইসলামের পতাকা তুলে ধরবেন। একদিন বন্ধুবর আবু বকরের [রা] কাছে নিজের মনের কথা ও আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তারপর মধুময় কণ্ঠে কয়েকটি আয়াত আবৃত্তি করে শোনালেন। এক পর্যায়ে আবু বকরকে [রা] আল্লাহর বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে আহ্বান করে বললেন, এখন থেকে পাথরের মূর্তি পূজো করা ছেড়ে দাও। এক আল্লাহকে বিশ্বাস করো, নামায আদায় করো।

এসব আহ্বান করে তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে আবু বকর [রা] হয়তো রেগে যাবেন। হয়তো তিনি তার সিদ্ধান্ত জানাতে কিছু দিন সময় নেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আবু বকর [রা] বিস্ময়করভাবে– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ– 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ [সা] তাঁর প্রেরিত রাসূল' এই ঘোষণা

www.pathagar.com

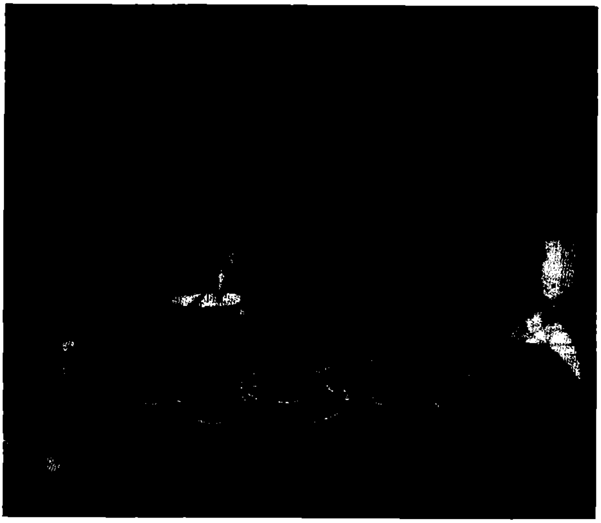

দিলেন। আবু বকর [রা] এক আল্লাহ এবং নবী করীমের [সা] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিলে তাঁর পরে পরেই পুরুষদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে এলেন তারা হলেন- ওসমান বিন আফফান, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস, জোবায়ের বিন আওয়াম এবং ওবায়েদা বিন জাররাহ। এদিকে মহিলাদের মধ্যে খাদীজা [রা] বিবির পরেই ইসলামে বিশ্বাসী হয়ে আসলেন আবু বকরের [রা] কন্যা আসমা, ওমরের বোন ফাতিমা, ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়া এবং জেন্নিরা।

বিনা বাধায় নিজ বাড়ির আশপাশের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে নবী করীম [সা] স্থির করলেন এখন থেকে ঘরের বাইরে গিয়ে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ প্রচার করতে হবে।

আল্লাহর ইশারা কে বুঝতে পারে? অল্প দিনের মধ্যেই বহু নারী-পুরুষ একে একে আল্লাহর প্রতি আস্থা স্থাপন করতে লাগলো।

নীল আকাশে সূর্যের কিরণ

ঢেকে গেছে চাঁদ

মানব দেহে কুসুম কলি

নেই যে কোনো খাঁদ। ■

www.pathagar.com

রাসূল [সা] নির্দেশিত ইসলামী জীবন ও সুন্দর আচরণ

কাজী তাবাসসুম

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ [সা] এমন একটা সময় এসেছিলেন যখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। পাশবিকতা, হিংস্রতা, শিরক, পৌত্তলিকতার সয়লাব, চারিদিকে দ্বন্দ্ব-হানাহানি, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ তখন ছিলো নৈমিত্তিক ব্যাপার। মজলুমের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠতো। কন্যাশিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো, আর নারী ছিল কেবলই ভোগের সামগ্রী। সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও জীবনের কোনো সৌন্দর্য বিকশিত হতো না। এমনই এক ঘনঘোর অমানিশায় আবির্ভূত হলেন মুহাম্মদ [সা] এক আলোকবর্তিকা হাতে। সেই আলোয় আলোকিত হলো বিশ্ব ভুবন, আলোকিত হলো মানুষ। এ আলোর নাম ইসলাম। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান।

ইসলাম মানে শান্তি। ইসলাম মানে স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। একজন মানুষ যখন ঘোষণা করে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু– তখন এই ঘোষণা তার জীবনকে আমূল পাল্টে দেয়। তাওহীদ তথা আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সর্বময় ক্ষমতার ধারণা মানুষের মাঝে জাগিয়ে তোলে আত্মসম্মান বোধ। আল্লাহই সকল কিছুর মালিক সে কেবলই আল্লাহর প্রতিনিধি এ ধারণা ও বিশ্বাস তাকে করে একই সাথে আত্মনির্ভরশীল, নির্ভীক, বিনয়ী ও নম্র। তার শক্তি, সম্পদ ও যোগ্যতার সবটুকুই আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছে এ বিশ্বাস তাকে গর্বস্ফীত ও উদ্ধত হতে দেয় না। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও শক্তির ধারণা তার মনে এনে দেয় শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ।

www.pathagar.com

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ, আর একে পূর্ণতা দেয় আখিরাতের চেতনা। চরিত্রগত ভাবেই মানুষ এমন যে, সব কাজের শুরুতেই তার মনে প্রশ্ন জাগে সে কাজের লাভ ক্ষতি সম্পর্কে। আখিরাত বিশ্বাস মানুষকে সেই লাভ ক্ষতির ধারণা দেয়। ইসলাম বলে এই দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরই রয়েছে চিরস্থায়ী নিবাস। আর সেই চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য ব্যর্থতা পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আচরণ ও কর্মের উপর। এভাবে ইসলাম মানুষের সামনে উপস্থাপন করে এক নবতরো জীবনবোধ। মানুষের চিন্তা, চেতনা, কথা ও কাজে সূচিত হয় এক পরিবর্তন। মানুষের আচরণে আসে এক বৈপ্লবিক বিন্যাস।

মূলতঃ মানুষ ও প্রাণীর জীবনে যা কিছু ঘটে এবং তারা যা কিছু করে তার সবই আচরণ। The social work dictionary অনুযায়ী "Behavior is any action or response by an individual including observable activity, measurable physiological changes cognitive image, fantasies and emotions" প্রাণী ও মানুষের মনোদৈহিক সব ধরনের ক্রিয়াকলাপই আচরণের পরিধিভুক্ত। মানুষের আচরণকে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। নির্দিষ্ট অভিপ্রায় ও পূর্ব সিদ্ধান্ত বা সচেতনতা ছাড়াই যেসব আচরণ সংঘটিত হয় সেগুলো হলো অনৈচ্ছিক আচরণ। যেমন– হাঁচি, কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, জন্ম-মৃত্যু, মানব বৃদ্ধি ও বংশগতি ইত্যাদি। এসব আচরণ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। বিশ্ব প্রকৃতির আর সব সৃষ্টির মতো এসব আচরণ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যদিকে যেসব আচরণ মানুষের সচেতন ইচ্ছার অধীন তা হলো ঐচ্ছিক আচরণ। এই ঐচ্ছিক আচরণের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ, সচেতনতা ও এর ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণ ও সুস্পষ্ট চেতনা বিদ্যমান থাকে। ইসলাম এই ঐচ্ছিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জীবন ও সুন্দর আচরণ এ বিষয় দুটিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নেই। বিষয় দুটো একে অন্যের পরিপূরক। এর বাস্তব প্রমাণ আমরা পাই রাসূল [সা]-এর সাহাবীদের জীবন থেকে। ইসলাম পূর্ব যুগে যারা ছিলেন চরম স্বার্থবাদী, গোত্রস্বার্থ রক্ষায় যাদের তলোয়ার ঝংকৃত হতো, সেই মানুষরাই তাওহীদের ঘোষণা করার সাথে সাথে হয়ে গেলেন মাটির মানুষ। অন্যদিকে বিলাল [রা], যায়েদ [রা] এদের মতো দাসদের জীবনও পাল্টে গেলো। তারা হলেন আবু বকর [রা]-এর মতো ধনাঢ্য ব্যক্তির বন্ধু, সহযোগী। এভাবে ইসলাম সূচনা করলো এক নবযুগের। একদিকে মানবিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উদার বাণী অন্যদিকে নৈতিক চরিত্রের এক অনুপম আদর্শ দুনিয়ার মানুষের মাঝে জাগালো এক নব জাগরণ। সমগ্র জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলো মানবাচরণের শুদ্ধতার। কেননা ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। তাই ব্যক্তি সংশোধন ছাড়া সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অল্প অল্প করে তাঁর বাণী পাঠাতে লাগলেন।

www.pathagar.com

তাঁর রাসূলের প্রতি। আর রাসূল [সা] তা বাস্তবায়ন করতে থাকলেন তাঁর নিজ জীবনে। সাহাবীরাও তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। অবিশ্বাসীরা সবিস্ময়ে দেখতে লাগলো তাদের চিরচেনা মুহাম্মদ [সা] ও তাঁর সহযোগীদের পরিবর্তন। এমনিভাবে এক এক করে দলটি ভারী হতে লাগলো। তারপর মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হলো এক নতুন রাষ্ট্র। ইসলামের আলোকে এক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে গেলেন ইসলামী জীবনের প্রকৃত রূপ। তুলে ধরলেন বিশ্বের দরবারে ইসলামী জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য।

ইসলাম কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়। ইসলাম ব্যক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি তথা জীবনের সবদিক ও বিভাগে পরিবর্তন আনতে চায়। ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধান। তাই ইসলাম সমগ্র জীবনাচরণকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে চায়। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর ঘোষণা দেবার পর মহান আল্লাহ মানুষকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। দিয়েছেন জীবন চলার পাথেয় হিসেবে আল কুরআন এবং অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে মুহাম্মদ [সা]-কে। এই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমরা পাই ইসলামী জীবনাচরণের নির্দেশনা।

ইসলামের নির্দেশিত আচরণ

মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিনিয়ত অন্যদের সংস্পর্শে আসতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহ্ তাই মানুষে মানুষে সুন্দর আচরণের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– "আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না, বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথা বলবে।" [সূরা বাকারা : ৮৩]

"বাবা-মার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকট আত্মীয় ও এতিম মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাঁদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো।" [সূরা আন নিসা : ৩৬]

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে তার সমগ্র জীবনে যত মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয় তাদের সকলের সাথে সুন্দর আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন।

পিতা-মাতার প্রতি আচরণ

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ হলো তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলো না, ধমকের স্বরে কথা বলো না। কথা বলো মর্যাদা সহকারে। দয়া ও কোমলতা সহকারে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে। এমনকি যদি পিতা-মাতা মুশরিক হয় তাহলেও তাদের সাথে সদাচার করে যেতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে উভয়ের উপর উভয়ের কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার দিয়ে দেয়া হয়েছে। দাম্পত্য জীবনকে সুখী সমৃদ্ধশালী করার জন্যে তাদের দু'জনই দু'জনের

www.pathagar.com

উপরে সে অধিকার লাভ করে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সা] তাদের দান করেছেন। উভয়ের প্রতি উভয়ের থাকবে নিষ্কলুষ আন্তরিকতা, সুনিবিড় প্রেম ভালোবাসা ও আবেগ উদ্দীপ্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। কুরআন ঘোষণা করেছে– "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তার নিকট শান্তি লাভ করতে পারো, আর তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা, হৃদ্যতা, দয়া ও করুণা সঞ্চার করে দিয়েছে।" [সূরা রূম : ২১]

সন্তানদের প্রতি

সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে পিতা-মাতাকে বলা হয়েছে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষণ করতে। "তোমরা দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করো না, তাদের জীবিকা আমিই দেবো আর তোমাদেরও।" [সূরা বনী ইসরাইল : ৩১]

তাদের লালন পালন, তাদের শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠনও পিতা-মাতার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল [সা] বলেছেন– "সুন্দর নৈতিক চরিত্র, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চাইতে উত্তম কিছুই বাবা-মা সন্তানদের দান করতে পারে না।"

আত্মীয় স্বজনদের প্রতি

আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ হলো তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, ভালো ব্যবহার করা, খোঁজ খবর নেয়া, দারিদ্রে তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের হক নষ্ট না করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন না করা। রাসূল [সা] বলেছেন– রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলে থাকে এবং বলে– "যে আমাকে রক্ষা করলো আল্লাহও তাকে রক্ষা করবেন, আর যে আমাকে ছিন্ন করলো আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

প্রতিবেশীর প্রতি

রাসূল [সা] প্রতিটি ইসলামী পরিবারকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তিনি বলেছেন– "জিব্রীল আমাকে সব সময়ে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারে তাকীদ করতেন। এতে আমার ধারণা হচ্ছিল, হয়তো বুঝি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

অধীনস্থ লোকদের প্রতি

আমাদের প্রতিটি পরিবারে কাজের ছেলে-মেয়ে থাকে। পরিবারগুলোকে এদের ব্যাপারে যত্নবান হতে বলা হয়েছে। রাসূল [সা] বলেন– "তোমাদের চাকর চাকরানী ও দাস দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই ও বোন। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ যার যার ভাই বোনকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, সে যেন তাদের তাই খেতে দেয়, যা সে নিজে খায়। তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরে। আর সাধ্যের বাইরে কোন কাজ যেন তার উপর না চাপানো হয়।

www.pathagar.com

একান্ত যদি চাপানো হয় তবে যেন তা সমাধ করতে তাকে সাহায্য করা হয়।" [বুখারী, মুসলিম]

এভাবে প্রতিটি সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে জাহেলী যুগের প্রচলিত নিয়ম প্রথা ভেঙ্গে প্রতিটি সম্পর্ককে স্থাপন করলেন সম্মান ও স্নেহের নিরিখে। বিবি হালিমা এলে তিনি নিজের চাদর খুলে বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন। স্ত্রীদের প্রতি তাঁর ছিল নিষ্কলুষ আন্তরিকতা, সুনিবিড় ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক।

সামাজিক গণ্ডি ছাড়িয়ে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন ইসলামী জীবনের সৌন্দর্য আরো বিকশিত হলো, আরো পূর্ণতা লাভ করলো। এতদিন ধরে শাসক ও শাসিতের যে রূপে জাহেলী সমাজের মানুষ অভ্যস্থ ছিলো সেখানে মানুষ দেখলো এক সমতা ও ঐক্যের সমন্বয়। প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে– কুরআনের এই ঘোষণায় শাসকের আচরণ হয়ে উঠলো নিয়ন্ত্রিত। তাইতো আমিরুল মুমিনীন উমর [রা]-কে আমরা দেখি আটার বস্তা নিয়ে দরিদ্র মায়ের কুটিরে পৌঁছিয়ে দিতে। জাহেলী সমাজে শাসক ছিল সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। প্রজারা শাসকের শত অন্যায় নীরবে সহ্য করতো। ইসলাম এ ক্ষমতা কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে দিলো। জবাবদিহিতার জালে আবদ্ধ করলো শাসককে। রাসূল [সা] বলেন– "সাবধান তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।"

একবার আবু বকর [রা]-এর স্ত্রীর মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হলো। তখন আবু বকর [রা] খলীফা। তিনি বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত টাকায় সংসার চালান। তার স্ত্রী সেই টাকা থেকে একটু একটু করে জমালেন। মাস শেষে স্বামীর হাতে টাকাগুলো দিয়ে মিষ্টি আনতে বললে আবু বকর [রা] জিজ্ঞেস করলেন এ টাকা কোত্থেকে এলো। স্ত্রীর জবাব শুনে বললেন, তাহলে এ টাকা তো আমাদের প্রয়োজন নেই। এ বলে তিনি টাকাগুলো বায়তুল মালে ফেরত দিলেন এবং বলে দিলেন পরবর্তী মাস থেকে ঐ পরিমাণ টাকা কম দিতে। এই হলো ইসলামী শাসকের চরিত্র।

হযরত আলী [রা] ছড়ি নিয়ে কুফার বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। দেখতেন ব্যবসায়ীরা প্রতারণা করছে কি না।

খলিফার কাছে যে কোন বিষয়ে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার জনগণের ছিল। আবু বকর [রা] তার খিলাফতের প্রথম ভাষণেই বলেন– "আমি সোজা পথে চললে আমাকে সাহায্য করো, বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করে দেবে।"

আলোচিত নির্দেশগুলো থেকে আমরা এমন কতকগুলো মানবিক দুর্বলতার সন্ধান পাই যা ইসলামী জীবনের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শিথিল করে ফেলতে পারে। সামাজিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করতে পারে যাতে করে ইসলামী জীবনের বুনিয়াদ হেলে পড়তে পারে। এর পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহর এমন কিছু গুণের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলো

www.pathagar.com

এই মানিবক দুর্বলতার স্থান দখল করে মানুষের আচরণে আনতে পারে সৌন্দর্য, সামাজিক বন্ধনকে করতে পারে দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"নিজের চাল চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। অওয়াজকে নিচু রাখো। সব আওয়াজের চেয়ে উঁচু আওয়াজ হলো গর্ধবের।" [লোকমান : ১৯]

গর্ব ও অহংকারের বিপরীতে আল্লাহ বলেন– "রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে তোমাদের সালাম।" [ফুরকান : ৬৩]

"হে সেইসব লোক যারা ঈমান এনেছ মুখে কিন্তু তা এখনো অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে আল্লাহ আখিরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন।" [আবু দাউদ]

মুসলমানদের পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কে দুটি হাদীস উল্লেখ না করলেই নয়– "তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক দুঃখ কষ্টের অনুভূতিতে এমনি দেখতে পাবে যেমন একটি দেহ। যদি তার একটি অংগ রোগাক্রান্ত হয়, তবে তার সাথে গোটা দেহ জ্বর ও রাত্রি জাগরণের মধ্যে তাতে অংশগ্রহণ করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্যে ইমারতের মত হওয়া উচিত এবং তাদের একে অপরের জন্যে এমনি দৃঢ়তা ও শক্তির উৎস হওয়া উচিৎ যেমন ইমারতের একখান ইট অপর ইটের জন্যে হয়।" [বুখারী ও মুসলিম]

এই নির্দেশনাগুলো কেবলমাত্র কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই সীমিত ছিল না। বাস্তবে সাহাবীরা এ আচরণ অনুশীলন করতেন।

আল্লাহ পাক সবকিছুই রাসূল [সা]-এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সূরা আলে ইমরানের ১৫৮নং আয়াতে রাসূল [সা]-এর সুন্দর আচরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এভাবে–

"এটা খোদার অনুগ্রহ যে, আপনি এদের প্রতি কোমল। যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজ সম্পন্ন হতেন, তাহলে এরা আপনার চারপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো।"

কুরআন সুন্নাহর এসব নির্দেশ এবং ইসলামী জীবনে সুন্দর আচরণের বাস্তব উদাহরণ আমাদের সামনে থাকার পরও আমরা যেন আজ পথহারা হয়ে পড়ছি। সমগ্র পৃথিবী এখন উত্তপ্ত। জবরদখল, হানাহানি, যুদ্ধ, মানবতাহীনতার সয়লাব। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে চলছে অবিরাম সংঘাত সংঘর্ষ। দুর্বল ও মজলুমের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে ধরাপৃষ্ঠ। ক্ষমতার লোভ, অর্থ-প্রতিপত্তি ও স্বার্থপরতা মানুষের মনুষত্বকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ মানুষ তার নিজ পরিচয় ভুলে গেছে। একে অপরের প্রতি প্রেম ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, দয়া-মায়া, পরোপকার, সহনশীলতা ইত্যাদি মানবীয়

www.pathagar.com

গুণ ভুলে হয়ে পড়েছে প্রবৃত্তির দাস। কুরআনী শিক্ষা ভুলে তারা পাশ্চাত্যের ঝলমলে মেকি সভ্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

যে পিতা-মাতাকে আল্লাহ এত সম্মান দিলেন, নির্দেশ দিলেন যে, তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলোনা, ধমকের সুরে কথা বলো না। দয়া ও কোমলতা, বিনয় ও নম্রতার সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। আজ সেই পিতা-মাতাকে বার্ধক্যে আশ্রয় নিতে হচ্ছে বৃদ্ধ নিবাসে। যারা সেখানে নির্বাসিত হতে চান না তারা প্রতিক্ষণে গর্ভজাত সন্তানের কাছ থেকে পান অবহেলা ও লাঞ্ছনা। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে নেই আস্থা, নির্ভরতা। যান্ত্রিক যুগের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে উভয়ই জড়িয়ে পড়ছে ভিন্ন ভিন্ন পেশায়। সন্তান সন্ততি বড় হচ্ছে আয়া বুয়ার কাছে। আক্রান্ত হচ্ছে ডিশ টিভি, কম্পিউটার গেম আর মাদকের নেশায়। অন্যান্য সামাজিক আচরণেও এসেছে শৈথিল্য।

শক্তিমান লোকেরা ইচ্ছামত যুলুম, নির্যাতন চালাচ্ছে দুর্বলদের উপর। অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, অন্যায় ছেয়ে গেছে জীবনের পরতে পরতে। আমরা ভুলতে বসেছি আশরাফুল মাখলুকাতের পরিচয়। ভুলে গেছি আল্লাহর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব।

এই পরিস্থিতি থেকে সত্যিকার পরিত্রাণ লাভের জন্যে অনিবার্য প্রয়োজন একটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন আদর্শের। যে আদর্শ হবে সব যুগের মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য ও কল্যাণকর। এ বিশ্বজনীন আদর্শের আলোকেই মানুষের চিন্তা চেতনা, স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ ও জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। রাসূল [সা] যেমন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যক্তিগঠন থেকে শুরু করেছিলেন, আমাদেরও সেই পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে হবে। কেননা এ পথে ব্যক্তি চরিত্র ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূল [সা] প্রদর্শিত আল কুরআনের সমাজ বিনির্মাণ করতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন– "লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা" অর্থাৎ তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূল [সা]-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। তাই এই আদর্শের আদলেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে ইসলামী জীবন ও সুন্দর আচরণ।

তথ্যসূত্র

১. তাফহীমুল কুরআন : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক : খুররম জাহ মুরাদ
৩. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান : নঈম সিদ্দিকী
৪. ইসলামের সামাজিক আচরণ : হাসান আইউব
৫. ইসলাম পরিচিতি : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৬. ইসলামের পারিবারিক জীবন : আবদুস শহীদ নাসিম
৭. মানব বৃদ্ধি, আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ : আতিকুর রহমান ও সালমা জোহরা
৮. সীরাত [সা] স্মারক : ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৯. ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহকে [সা] ভালোবাসা ঈমানের শর্ত

ফখরুদ্দীন আহমাদ

এক.

মানুষ সৃষ্টির সেরা, এ কথা সবারই জানা। আবার এই মানুষকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেছেন, "তারা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।"

তাহলে সৃষ্টির সেরা যে মানুষ সে মানুষ হওয়ার উপায় কি? এবং মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায় কখন?

সেরা মানুষ হওয়ার উপায় হচ্ছে, আল্লাহর উপর ঈমান এনে তাঁর দেয়া জীবন বিধান দুনিয়ার জীবনে মেনে চলা। আর মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায় তখন, যখন আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো চলে কিংবা দুনিয়ায় প্রচলিত অন্য কোন নিয়ম মেনে চলে।

আল কুরআনই আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান। এটি মৌলিক গ্রন্থ। তাই এ কুরআন কিভাবে মেনে চলতে হবে, তা মানুষকে সরাসরি দেখাতে বা শিখাতে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য মুহাম্মাদকে [সা] একমাত্র আদর্শ করে পাঠিয়েছেন। সূরা আল আহযাবের ২১ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।" রাসূলুল্লাহর [সা] নবুওয়তের তেইশ

www.pathagar.com

বছর যিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্তই বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয়। তিনি যেভাবে নিজে চলেছেন, পরিবার চালিয়েছেন, সমাজ ও রাষ্ট্র চালিয়েছেন, তা সবই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে।

কাউকে ভালোবাসলেই কেবল তার আদর্শ গ্রহণ করা যায়, অনুসরণ করা যায়। রাসূল [সা] নিজেই বলেছেন, "যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের মা-বাবা, সন্তান এবং সকল মানুষ থেকে বেশী প্রিয় হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউ মুমিন হতে পারবে না।" [সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম]

রাসূলকে [সা] কিভাবে ভালোবাসতে হবে? এই ভালোবাসা মানে কি বুকের ভেতর তাঁর জন্য শুধু দরদ অনুভব করা? উহুদ যুদ্ধ বা তায়েফের ঘটনা শুনে চোখের পানি নাকের পানি এক করা? মিলাদ মাহফিলে বসে বা দাঁড়িয়ে কেবল তাঁর নামে দরূদ পড়া? না, শুধু এসব কিছু ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হচ্ছে তাঁকে অনুসরণ করে চলা। রাসূলকে [সা] ভালোবাসার বা অনুসরণ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, কারণ আল্লাহ বলেছেন, "হে নবী! মানুষকে বল, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" [সূরা আলে ইমরান : ৩১]

রাসূল [সা]-কে অনুসরণ করে চললে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালোবাসবেন এবং তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন, এর চেয়ে বড় পাওয়া মানুষের জন্য আর কি হতে পারে?

দুই.

ইসলামের বিধান অমান্য করলে আল্লাহ তায়ালা ভীষণ রাগান্বিত হন, কারণ তাতে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের ক্ষতি, অশান্তি, বিপদ, মুসিবত ও বিপর্যয়ে তিনি খুবই কষ্ট পান! মানুষ তাঁর অতি প্রিয় সৃষ্টি! প্রিয় জিনিস নষ্ট হয়ে যাক এটা কেউ চায় না, আল্লাহও চান না। তাই তিনি মানুষের জন্য এমন এক জীবন বিধান পাঠালেন, যা মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। জীবন বিধানটি যাতে মানুষ সহজে মেনে চলতে পারে, সে জন্যই অবিসংবাদিত চরিত্রের অধিকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদকে [সা] জীবন্ত কুরআনরূপে পাঠিয়েছেন। তিনি যা কিছু করেছেন ও বলেছেন, তা সব আল্লাহরই বিধান। তাঁকে মেনে চললেই আল্লাহকে মেনে চলা হয়।

"যে রাসূলকে মেনে চলে, সে আসলে আল্লাহকেই মেনে চলে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে রাসূল! আমি তো তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।" [সূরা আন নিসা : ৮০]

"আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমার রাসূলের উপর স্পষ্ট সত্য পৌছানো ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই।" [সূরা আত্ তাগাবুন : ১২]

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের কথা মতো চলো। আর নিজেদের আমল নষ্ট করো না।" [সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩]

"আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলো এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জেনে রাখো, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় হুকুমগুলো পৌঁছে দিবেন।" [সূরা আল মায়িদা : ৯২]

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও নারীর এ অধিকার থাকে না যে, সে ঐ বিষয়ে নিজে কোন ফায়সালা করবে। আর যে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহ।" [সূরা আল আহযাব : ৩৬]

তিন.

আল্লাহর রাসূল [সা] যেভাবে আচার ব্যবহার করতেন, কথা বলতেন, চলতেন, বসতেন, খেতেন, পান করতেন, আনন্দ করতেন, দু:খ প্রকাশ করতেন, আদর স্নেহ করতেন, হাসতেন, ভদ্র ব্যবহার করতেন, মানুষের বিপদে সাহায্য করতেন, ইবাদাত করতেন, ধৈর্য ধরতেন, সৎ উপদেশ দিতেন, অন্যায় কাজে বাধা দিতেন, ইসলামের দিকে ডাকতেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতেন, তা সব অনুসরণ করলেই প্রমাণ হবে, আমরা তাঁকে ভালোবাসি। সব অনুসরণ করবো, কিন্তু শেষেরটি করবো না, তা হবে না, কারণ শেষের কাজটিই আসল কাজ। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই [আল্লাহ] তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও দীনে হক [সঠিক জীবন বিধান]সহ এজন্য পাঠিয়েছেন, যাতে রাসূল তা দুনিয়ার সকল দীন বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন।" [সূরা আস্ সাফ : ৯]

দীন কায়েম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ফারয। তাই রাসূল [সা] আল্লাহর সকল নির্দেশের ন্যায় এই নির্দেশটিও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। জান-মাল ক্ষতির ভয়ে এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই। উহুদ যুদ্ধের দিন এক হাজার সাহাবী রাসূলের [সা] ইমামতিতে ফজরের নামায আদায় করে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা দেন, মাঝ পথ থেকে আবদুল্লাহ বিন উবাইর নেতৃত্বে তিনশো সাহাবী পিছু হটে যায়। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে তাদেরকে মুনাফিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও এতটুকু ছাড় দেননি। এতে বুঝা যায়, শুধু নামায-রোযা, দোয়া-দরূদ, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দান-সাদকা, নফল ইবাদাত ইত্যাদি ঠিক মতো পালন করলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না, কারণ এগুলো প্রাসঙ্গিক, মূল কাজ হলো দীন কায়েমের আন্দোলন। রাসূল [সা]-এর পিছনে নামায আদায়কারী সাহাবী হয়েও দীন কায়েমের কাজ থেকে দূরে থাকায় তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসে। দীন কায়েমের আন্দোলনে শামিল থাকলে জাহান্নামের আগুন থেকে বিনা প্রশ্নে মুক্তির গ্যারান্টি দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। সূরা আস্ সাফ-এর ১০ ও ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! আমি কি এমন এক ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং

www.pathagar.com

জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা বোঝ।"

চার.

অনেকে বলেন, "নবীজীর [সা] সঙ্গে আমাদের তুলনা ঠিক না, আমরা কি আর তাঁর মতো কাজ করতে পারবো?" এ ধারণাটা একেবারেই ভুল, কারণ নবীজীর সঙ্গেই আমাদের কাজের তুলনা করতে হবে, অন্য কারো সাথে নয়। আমাদের সকল কাজ তাঁর কাজের মতো হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে, না হলে, তাঁর মতো করে করতে হবে। কারণ, একমাত্র তাঁকেই সকল কাজের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রিয় নবীর আসল কাজই ছিল সমাজে প্রতিষ্ঠিত বাতিল দীনকে অস্বীকার ও উৎখাত করে আল্লাহর দীন [আল ইসলাম] কায়েম করা। কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোনদিনই একাজকে পছন্দ করে না। কেননা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে দুর্নীতি করার আর সুযোগ থাকে না, তাই তারা তাঁর ও সাহাবীদের ওপর যুল্ম-নির্যাতন শুরু করে। তাদের শত নির্যাতনেও রাসূল [সা] ও তাঁর সাহাবীরা [রা] বিচলিত হননি, অধৈর্য হননি, আপোষ করেননি। প্রয়োজনে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, তবু ইসলাম ত্যাগ করেননি, বাতিলের কাছে মাথা নত করেননি। আজ আমরা দেশ দেশ বলে চিৎকার করি, কিন্তু ইসলামের ধারধারি না বরং দেশে যাতে ইসলামী আইন চালু হতে না পারে, সে তৎপরতা চালাই! অথচ ইসলাম কায়েম হলেই প্রকৃত কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও শান্তি আসবে। সেখানে সকল নাগরিক তার সঠিক অধিকার ও নৈতিক শিক্ষা পাবে। নৈতিক শিক্ষা না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নতি মানুষকে যালিম ও বেপরোয়া বানায়। তাই তো আজকের ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে গাড়ী, বাড়ী, নারী ও টাকার অভাব নাই, কিন্তু শান্তির দারুণ অভাব।

যেহেতু আল্লাহর রাসূল [সা] মার খেয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীন কায়েমের জন্য জিহাদ চালিয়ে গেছেন, তাহলে আমরা যদি তাঁর এ কাজকে অনুসরণ না করে নিজের মর্জি মতো ঘরে বসে টুকটাক ইবাদাত করি কিংবা মাসজিদে গিয়ে গিয়ে মানুষকে দীনের পথে ডাকি, সেটা কি ভুল নয়? দীন কায়েম হয়ে গেলে দীনের দিকে মানুষকে আর ডাকতে হয় না, এমনিতেই দলে দলে লোক তা গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যায় [দীন কায়েম হয়ে যায়] [হে রাসূল!] তুমি দেখ মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হচ্ছে!" [সূরা আন নাসর : ১, ২]

রাসূল [সা]-এর নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এবং মক্কা বিজয়ের পর তা-ই বাস্তবে দেখা গেল। মানুষ দেখলো, ইসলাম সম্পর্কে তাদের যা বুঝানো হয়েছিল, তা সঠিক নয়। বাতিল রাষ্ট্রে জনগণ নয় বরং ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালীরাই ইসলামের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

পাঁচ.

আল্লাহর নবী [সা] কত নির্যাতন সহ্য করে, তায়েফে রক্ত ঝরিয়ে, উহুদে দাঁত ভেঙ্গে এবং সাহাবীরা [রা] জান-মাল দিয়ে ইসলাম কায়েম করেছেন। সেই ইসলাম উম্মাতে মুহাম্মাদী ধরে রাখতে পারেনি; এসেছে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র। বর্তমানে তো অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ইহুদী-খৃস্টানরা মুসলিমদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করছে। তবু তো আমাদের টনক নড়ছে না, জামায়াতবদ্ধ হচ্ছি না সকল মুসলিম। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রশিকে ধরে থাকো, দলাদলি করো না।" [সূরা আলে ইমরান : ১০৩]

"তোমরা ঐ লোকদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বহু দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং স্পষ্ট হিদায়াত পাওয়ার পরও মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" [সূরা আলে ইমরান : ১০৫]

রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা জামায়াতবদ্ধ হবে, নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে এবং তা মেনে চলবে।" [মুসনাদে আহমাদ, জামে আত তিরমিযী]

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত কাজ করছি, অর্থাৎ জামায়াতবদ্ধও হচ্ছি না আবার দলাদলিও করছি। সে জন্যই মার খাচ্ছি দুনিয়ার জায়গায় জায়গায়। মার খেতে খেতে মুসলমানদের মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে গেছে, অথচ আমরা মাসজিদে মাসজিদে গিয়ে তাসবীহ টিপ্‌ছি আর বেহেশতের হুর-পরীর মধুর চিন্তায় রোমাঞ্চিত হচ্ছি! বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন থেকে এক হাজার বছর পিছিয়ে পড়েছি। ইবনে সিনা, আল বিরুনী, আত্‌ তূসী, আত তাবারী, আর-রাজীর মতো বিজ্ঞানী আর জন্মায় না, কারণ, বিজ্ঞানটাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। অবশ্য বিজাতির আবিষ্কৃত এসির ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম করতে আমরা মোটেও কসুর করি না!

বিদায় হাজে রাসূল [সা] বলেছেন, "তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দুটিকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখলে পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ [আল কুরআন ও আল হাদীস]।" আমরা এ দুটিকে বাদ দিয়ে মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদ আঁকড়ে ধরেছি। ফলে রাসূলের [সা] কথা অনুযায়ী আমরা এখন পথভ্রষ্ট। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছি দিকবিদিক। কোথাও শান্তি পাচ্ছি না। বৈষয়িক উন্নতি সত্ত্বেও সমস্যার পর সমস্যা, বিপদের পর বিপদ এসে আমাদেরকে ঘিরে ফেলছে!

আল্লাহর হুকুম মেনে চলার নামই হলো ইবাদাত। এই ইবাদাতের নিয়মাবলী মানুষকে শিখাতে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদকে [সা] মডেল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাই চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে অনুসরণ করে চলাই হলো ইবাদাত। এক মিনিটও নিজের ইচ্ছা মতো বা অন্য কারো নিয়ম মতো চলা যাবে না।

মুসলিম জাতির বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্তির পথ একটিই, আর তা হচ্ছে, শুধুমাত্র রাসূলকে [সা] ভালোবাসা তথা তাঁকে অনুসরণ করা তথা আল কুরআন-আল হাদীস অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা।■

www.pathagar.com

অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়

একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]

এস.এম. জহির উদ্দীন

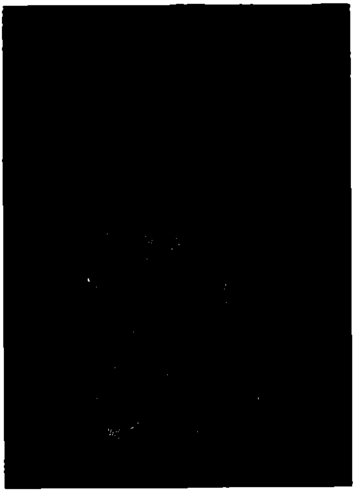

যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিপথগামী মানবতার মুক্তির জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানবতার অল্প সংখ্যক লোকই তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো জাতিই তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তাঁরা সহ্য করেছেন দুর্বিষহ যন্ত্রণা। কেউ সফল হয়েছেন, কেউ হননি। যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের ওফাতের পর সময়ের আবর্তে জাতি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে।

মানবতা তখন অবহেলিত, পরিত্যক্ত। ইতিহাস যাকে অন্ধকার বা জাহিলিয়াত বলে অভিহিত করে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] আগমন। তাঁর কালের ও অগণিত ভবিষ্যতের সকল জাতির সকল মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থার।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ছোট-বড়, ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, নর-নারী সকলের জন্য নিয়ে এলেন এক অমোঘ শিক্ষা। তাঁর অতুলনীয় চরিত্রে ঘটেছে তার সম্যক বিকাশ।

সমাজে প্রচলিত সকল আইন, সকল মতবাদ, সকল কর্মকাণ্ডকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তিনি ঘোষণা করলেন আল্লাহর বাণী। "ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন–জীবন বিধান।" –সূরা আলে ইমরান : ১৯

আল্লাহ আরো বলেন, "এ আনুগত্য [ইসলাম] ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় সে পদ্ধতি কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্চিত।" –সূরা আলে ইমরান : ৮৫

হঠাৎ করেই মহানবী [সা] এ ঘোষণা দেন নি। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর চরিত্র, কর্ম-কৌশল দ্বারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা [মহানবী সা. সম্পর্কে] তাঁর বান্দাহদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, "আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।" –সূরা আল আহযাব : ২১

মহানবী [সা] তাঁর আদর্শের আলোকেই সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রকে বাঁচাতে চেয়েছেন।

সমাজের সকল দিক তখন নানা সমস্যায় জর্জরিত।

যাবতীয় কর্তৃত্ব ছিলো এক শ্রেণীর হাতে, অন্য শ্রেণী ছিলো শোষণের শিকার।

নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিলো না, তাদের সৃষ্টি যেন ভোগ-লালসার জন্য।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যুগ যুগ ধরে চলতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

নবজাতক মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়া ছিলো তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক বা মর্যাদা রক্ষার অনন্য এক পথ।

এমনই এক সময়ে মহানবী [সা] তাঁর কর্ম-কৌশল দ্বারা সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

রাজা-বাদশাহরা তখন বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে জেঁকে বসেছিলেন। তাঁদের খেয়াল-খুশিই ছিলো আইন। এদের উদ্দেশ্যে মহানবী আল্লাহর বাণী ঘোষণা দিলেন, "আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসিক।" –সূরা আল মায়িদা : ৪৭

"যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" –সূরা আল মায়িদা : ৪৪

আল্লাহ আরো বলেন, "যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই যালিম।" –সূরা আল মায়িদা : ৪৫

মা'কাল ইবনে ইয়াছার [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতপর সে খিয়ানাতকারীরূপে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। –সহীহ আল বুখারী : ৬৬৫২

অন্যদিকে রাসূল [সা] জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, নেতৃত্বরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যায় এমন কথা বা আদেশ না করেন, তাহলে তাঁদের [নেতৃত্ব] আদেশ অবশ্যই পালনীয়; হোক সে হাবসী গোলাম, কৃষ্ণাঙ্গ বা নীচু বংশের কেউ।

আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তোমরা [হুকুম] শ্রবণ

www.pathagar.com

করো ও আনুগত্য করো– যদিও তোমাদের ওপরে কিশমিশের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হাবসী গোলাম বা দাস শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। –সহীহ আল বুখারী : ৬৬৪৩

রাষ্ট্রীয় তহবিল ছিলো ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত তহবিল। কিন্তু মহানবী [সা] ঘোষণা করেন– এটি সরকার প্রধানের তহবিল নয়, এটি জনগণের তহবিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, জনগণের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণই এর মূল লক্ষ্য।

রাসূল [সা] আরো ঘোষণা দিলেন, আইনের চোখে সাধারণ ব্যক্তি ও সরকার প্রধান সকলেই সমান, সকলেরই সমান অধিকার।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা কর। এবং তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না।" –সূরা আল মায়িদা : ৪৯

রাসূল [সা] সমাজে এ নীতিই বাস্তবায়ন করেন। আবু হুরাইরা [রা] এবং যায়িদ ইবনে খালিদ [রা] থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা একবার নবীর [সা] নিকট ছিলাম, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবো। –সহীহ আল বুখারী : ৬৭৭০

অর্থ, বংশ, বর্ণ ইত্যাদি নয়, তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতার ভিত্তিতে মহানবী [সা] মানুষের মর্যাদা নির্ণয়ের শিক্ষা দেন। ফলে মক্কা বিজয়ের সময় বানু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী এক অভিজাত মহিলা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হলে কুরাইশরা বিচলিত হয়ে পড়েন। অনেক শলা-পরামর্শের পর তারা উসামা বিন যায়েদকে পাঠায় মহানবীর [সা] কাছে সুপারিশের জন্য। উসামার কথা শুনে রাসূলের [সা] মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, "তুমি কি আল্লাহর নির্দ্ধারিত একটি শাস্তি সম্পর্কে [রহিত করার] সুপারিশ করতে এসেছ?" তিনি জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিলো এই যে, তাদের মধ্যে কোন সবল লোক অপরাধ করলে তা দেখেও না দেখার ভান করা হতো। কিন্তু কোন দুর্বল লোক অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হতো। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে আমি তার হাতও কেটে ফেলবো। –সহীহ আল বুখারী

রাসূল [সা] শিক্ষা দিলেন আইনের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, ছোট-বড়, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলে সমান।

মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বলতে কিছু আছে একথা সাধারণ লোকের কল্পনা করাও ছিলো অনর্থক। সম্পদ লুণ্ঠন, হত্যা-ধর্ষণ এ তো ছিলো তাদের Hobby। সেই ভয়াবহ সময়ে রাসূল [সা] আল্লাহর বিধান ও তাঁর [রাসূলের] সুন্নাহ দ্বারা মানুষের জীবন ও সম্পদের এমন নিরাপত্তা বিধান করেন যে, সানা থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত একজন সুন্দরী নারী অলংকারসমেত ভ্রমণ করতে পারতো, একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ভয় ছিলো না।

মহানবী [সা] কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজ গড়ার জোর তাকিদ দিয়েছেন। জীবন চলার সমস্ত পাথেয়, সকল দিক নির্দেশনা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। আর মহানবী [সা] তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে। এ দু'টি জিনিসকেই তিনি সর্বদা আঁকড়ে ধরার তাকিদ দিয়েছেন।

আবুযার গিফারী [রা] বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহর [সা] দরবারে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। .....তিনি বললেন, নিজেকে কুরআন অধ্যয়ন ও আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত রাখো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে আকাশে স্মরণ করবেন এবং এটা জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানগুলোতে তোমার জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে। –মিশকাত

সে সময়ে নারী জাতি ছিলো শাসক বা অভিজাত শ্রেণীর যৌন লালসার পাত্রী। তারা অসংখ্য নারীকে রক্ষিতা হিসেবে রাখতো এবং বহু নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতো। নারীদের ইযযাত বা নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিলো না। ইযযাত বা নিরাপত্তা বলতে যা ছিলো তা শুধু পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত। অর্থ-সম্পদেও নারীদের কোন অধিকার ছিলো না।

রাসূল [সা] জানিয়ে দিলেন- আল্লাহ বলেন, "নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর।" –সূরা আল বাকারা : ২২৮

আল্লাহ আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোর পূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়।" –সূরা আন নিসা : ১৯

স্ত্রীদের আধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আর আনন্দের সাথে [ফরয মনে করে] স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও।" –সূরা আন নিসা : ৪

রাসূল [সা] নারীদেরকে সমাজের অবহেলার স্থান থেকে টেনে তুলে মাতা, স্ত্রী, বোন, কন্যার স্থানে অধিষ্ঠিত করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। স্ত্রীদের সম্পর্কে বললেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" –সহীহ আল বুখারী

তিনটি, দু'টি বা একটি বোন বা কন্যাকে দীনদারীর সাথে লালন-পালন করলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। কন্যা সন্তানের অবস্থাতো এমন পর্যায়ে ছিলো- একদিকে তাদের জন্ম গ্রহণে লোকেরা দারিদ্রের ভয় করতো অন্যদিকে তারা নিজেদের মর্যাদাহানি মনে করতো। তাই তাদের জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠা বোধ করতো না।

এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে, কারণ এই দু:সংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবো, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবো।" –সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯

এদের সম্পর্কে ক্রোধ প্রকাশ করে আল্লাহ ঐসব অবুঝ কন্যাদের প্রশ্ন করবেন, কোন্ অপরাধে তোমাদের হত্যা করা হয়েছিলো?

আল্লাহ আরো বলেন, "দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও।" –সূরা বনী ইসরাইল : ৩১

দাস-দাসীর অবস্থা ছিলো আরো ভয়াবহ। তারা ছিলো মনিবের খেলার পুতুল। তাদের অধিকার, স্বাদ-আহ্লাদ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলতে কিছুই ছিলো না। মনিবের স্বাদ-আহ্লাদ পূরণই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। পণ্যের মতো তাদেরকে হাট-বাজারে বিক্রি করা

www.pathagar.com

হতো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে অন্যকে উপহার হিসেবে দেয়া হতো। অপরাধ না করলেও মারপিট করা যেত। রাসূল [সা] প্রচলিত এ ধারাকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করেন। তিনি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। জানিয়ে দিলেন তারাও আমাদের মতই মানুষ। তাদেরকেও সেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে তা দেখিয়ে দিলেন। দশ বছর খিদমাত করার পরও যায়িদ কখনও রাসূলের [সা] মুখে এ কথা শুনেন নি যে, এটা করনি কেন, ওটা করোনি কেন বা এটা করা হয়নি কেন?

আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তিন প্রকার লোক দ্বিগুন পুরস্কার পাবে।..... সেই ব্যক্তি, যার কোন দাসী থাকলে সে তাকে উত্তম তরবিয়াত দান করে, দীনের শিক্ষা দান করে, তাকে মুক্ত করে।..... –সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রাসূল [সা] বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে [তার আযাদকৃত দাসের] প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ্ তার [মুক্তিদানকারী ব্যক্তির] প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। –সহীহ্ আল বুখারী : ২৩৩৪। বিদায় হজ্বের ভাষণেও তিনি দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার তাকিদ দেন।

সুদই ছিলো অর্থনৈতিক শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। তারা একে ব্যবসার মতো লাভজনক হালাল উপার্জন মনে করতো। মদ, জুয়া, মওজুদদারী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে ছিলো। এগুলো অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অসহনীয় করে তুলেছিলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকী রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না কর তাহলে জেনে রাখ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।" –সূরা আল বাকারা : ২৭৮

আল্লাহ্ আরো বলেন, "যে সুদ তোমরা দিয়ে থাক, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না।" –সূরা আর রূম : ৩৯

প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করলেন সুদের কারণে মূলত সম্পদ বাড়ে না। দান করার মাধ্যমেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ বলেন, "তারা বলেঃ 'ব্যবসাতো সুদের মতো।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।" –সূরা আল বাকারা : ২৭৫

আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। –সূরা আল বাকারা : ২৭৬

রাসূল বললেন, সুদ দাতা, গ্রহীতা, সাক্ষী, যার মাধ্যমে দেওয়া হয়, যে লিপিবদ্ধ করে সকলেই অভিশপ্ত।

ইবন মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত। যে সুদ খায়, যে খাওয়ায়, যে দু'ব্যক্তি সুদের সাক্ষী হয় এবং যে ব্যক্তি এতদসংক্রান্ত বিবরণ কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করে, তাদের সকলকে রাসূলুল্লাহ [সা] অভিসম্পাত করেছেন। –সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম

www.pathagar.com

আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূল [সা] বলেছেন, যে রাতে আমার মি'রাজ হয়, ...আমি এমন কয়েকজন লোকের নিকট দিয়ে যাই যাদের পেট এতটা স্ফীত ছিলো যেন তা ঘর। আর তা ছিলো সাপে পরিপূর্ণ। সাপগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর।
–মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

যুদ্ধ ছিলো আরবদের নেশা। শত শত ব্যক্তি তথা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে। সর্বদা বিরাজ করতো আতংক আর হতাশা। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যুদ্ধ চলতো শতশত বছর। এসব বিষয় দেখে মহানবী [সা] ব্যথিত হন। তাঁর বয়স মাত্র সতর। একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আয যুবাইর ইবনু আবদিল মুত্তালিব ছিলেন একজন কল্যাণকামী মানুষ। তিনি এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে গড়ে তোলেন এক সংগঠন। নাম 'হিলফুল ফুদুল'। মহানবী সানন্দে এই সংগঠনে যোগ দেন। এ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিলো– ১. দেশ থেকে অশান্তি দূর করা, ২. পথিকের জান-মালের হিফাযাত করা, ৩. অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা, ৪. মাযলুমের সাহায্য করা, ৫. কোন যালিমকে মক্কায় আশ্রয় না দেয়া।

পবিত্র কা'বা পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত। একবার পাহাড়ের পানিতে দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন করে নির্মাণ করা হলো কা'বার দেওয়াল। বিরোধ বাধে সরিয়ে রাখা হাজরে আসওয়াদ নামক কালো পাথরটি পুন:স্থাপণের বেলায়। কে পুন:স্থাপণ করবে স্বস্থানে।
সিদ্ধান্ত হয় যে ব্যক্তি সবার আগে কা'বার প্রাঙ্গনে পৌঁছবে সে-ই এর মীমাংসা করবে। সকলেই চিন্তিত। কে আগে আসবে, আর কে-ই বা সেই সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী হবেন।
অত:পর দেখা গেলো যুবক মুহাম্মাদই [সা] সবার আগে এলেন। সকলেই যেন স্বস্তি পেলো। তিনি একটি চাদর আনার নির্দেশ দিলেন। নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ চাদরের মাঝখানে রাখলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের একজন করে প্রতিনিধিকে চাদরের কোণা ধরে উপরে তুলতে বললেন। অত:পর তা আনা হলো কা'বার দেওয়ালের নিকট। মহানবী [সা] পুনরায় নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ স্বস্থানে রেখে দিলেন। সকল গোত্রের লোকেরা খুশি। জাতি একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পেল।
এভাবে সমাজের অসংখ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে মহানবী [সা] ছিলেন সমালোচনার ঊর্দ্ধে। বিরোধীরাও তাঁর ফায়সালা মেনে নিত সানন্দে।

মহানবী [সা] যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার যথার্থ প্রয়োগে ব্যর্থতাই আজকের সমাজের অধ:পতনের মূল কারণ। তাঁর শিক্ষা থেকে আমাদের জীবনের আদর্শ বহু যোজন দূরে সরে গেছে। আমরা কল্যাণ চাই কিন্তু তা আল কুরআন ও আল হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে থেকে। যার ফলে মুসলিম দেশেও প্রকৃত শান্তির বড়ই অভাব। আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের [সা] কর্ম-কৌশল গ্রহণ করতে পারলেই কেবল শান্তি বা কল্যাণ ফিরে পাওয় সম্ভব। ■

www.pathagar.com

অপরাধ দমনে রাসূলের [সা] ভূমিকা

হুসাইন আল জাওয়াদ

অপরাধ দমনে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তিনি যেমন একদিকে রহমতের নবী, দয়াল নবী, অন্যদিকে ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিচারক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্রের মত কঠোর। অন্যায়কে তিনি কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। সর্বদা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন। শুধু নিজেই প্রত্যাখ্যান করতেন এমনটি নয় বরং অন্যায় প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার চেষ্টা চালাতেন।

এমন একদিন ছিল যখন কাউকে অপরাধ কার্যে দেখলে কিছু বলার সাহস ছিল না। তখন শুধু দেখেই যেতেন এবং মজলুম মানুষের দরদে আপ্লুত হতেন। ধীরে ধীরে তিনি যখন ১৫ কি ১৬ বছরে উপনীত হলেন, তখন আরবের যুবকদের নিয়ে সমাজ থেকে অন্যায়, জুলুম, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এবং মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হতে 'হিলফুল ফুযূল' নামে একটি সংগঠন গঠন করেন। তিনি তখন পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। কারণ সে সংগঠনটি আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মত পরিচালিত হয়নি। কিন্তু সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার দূরীভূত করার জন্যে তাঁর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

বহু প্রতিক্ষার পর সে কাঙ্ক্ষিত অহী প্রাপ্ত হলেন। অহীর মাধ্যমে তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন পরিষ্কারভাবে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। সাহস ও জনবল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ পর্যায়ে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং জোর প্রতিবাদ করতে থাকেন। যেমন মানুষ হত্যা করা একটি জঘন্য অপরাধ। তবে ন্যায়সঙ্গত হত্যা ব্যতীত। যারা বৈধ কারণ ছাড়া কোনা মানুষকে হত্যা করে তারা মহাপাপী।

www.pathagar.com

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস ইবনু মালিক [রা] থেকে বর্ণনা এসেছে– একবার এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের মাথা পাথর দিয়ে থেতলে দেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ক্রীতদাসী অলঙ্কার সজ্জিত হয়ে শহরের বাইরে গমন করলে এক ইয়াহুদী তাকে পাথর নিক্ষেপ করে। মুমূর্ষ অবস্থায় মেয়েটিকে নবী করীম [সা]-এর নিকট আনা হলে মেয়েটিকে রাসূল [সা] জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে মেরেছ? এ কথা তিনবার জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি রাসূলের কথায় ইতিবাচক সাড়া দিলে রাসূল [সা] ঐ ইয়াহুদীকে ডেকে আনেন। লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকার করল। রাসূল [সা] লোকটির মাথা থেতলে দেবার নির্দেশ দিলেন। সহীহ মুসলিম ও মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত আছে যে. রাসূল [সা] তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। অর্থাৎ কেউ কাউকে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করতে হবে। এটাই রাসূলের নির্দেশ। এভাবে হত্যাকাণ্ড হ্রাস পেতে পারে।

রাসূল [সা] আরো বলেছেন, মুসলমানদের গালি দেয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরী। শুধু ইসলাম কেন, পৃথিবীর সকল ধর্মে, সকল আইনে কাউকে হত্যা করা এবং বিনা কারণে গালি দেয়া পাপের কাজ। রাসূল [সা] হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান যেমন দিয়েছেন, এর পাশাপাশি তাদের ক্ষমা করে দেয়ার কথা উচ্চারণ করেছেন। দোষ করে কেউ ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেয়াই মহাউত্তম কাজ।

অনুরূপ কারো ওপর যুলুম অত্যাচার করা যাবে না। কাউকে হয়রানি করা যাবে না। কারো জীবন-সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাবে না। আমাদের নবী [সা] বলেছেন– একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং তার ওপর যুলুম করা যাবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া যাবে না। একজন মুসলমান কখনো তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের ওপর অত্যাচার চালাতে পারে না। তিনি আরো বলেছেন, কোন মুসলমান যদি অন্যায়ে লিপ্ত হয়, আর তুমি তা প্রত্যক্ষ কর, তাহলে এ দোষের কথা অন্য ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করে দেবে না, অর্থাৎ তার ত্রুটি গোপন রাখবে। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহও ঐ কিয়ামতের দিন বিচারের সময় তোমার দোষ ঢেকে রাখবেন। অন্যায় কাজ করে না, পাপের কাজে লিপ্ত হয় না, এমন কোন মানুষ কখনো পাওয়া যায় না। আল্লাহর দরবারে আমরা সকলেই অপরাধী। তাই অহঙ্কার করার এবং নেচে গেয়ে ঢালাওভাবে অন্যের দোষ বলে বেড়ানোর মাঝে কোন কৃতিত্ব নেই।

চাকর-চাকরানির ব্যাপারেও রাসূল [সা] কথা বলেছেন। বিশেষ করে বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেন, তোমরা চাকর-চাকরানির ওপর অত্যাচার করবে না। তারাও মানুষ। তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তা খেতে দেবে। এ ব্যাপারে কোন তারতম্য করা যাবে না। আজকের অনেক পরিবারের লোকেরা তাদের বাসায় মেহমান এলে ঐসব চাকর-চাকরানির দ্বারা ভাল ভাল নাশতা, খাদ্য সরবরাহ করে। তারা স্বার্থপরের মতো খেতেই থাকে। চাকরদের প্রতি সামান্য খাদ্যও এখান থেকে জুটেনা। এটা নিতান্তই সংকীর্ণ মনের পরিচয়। তাই আজকের সাধারণ আইনও তাদের এ আচরণের বিরুদ্ধাচরণ করে। ইসলামী আইনের কথাতো বলাই হল।

www.pathagar.com

এবার আসা যাক মদ জুয়ার ব্যাপারে। মদ্যপান সামাজিক অনাচার ও অপরাধের মধ্যে অন্যতম। মদ্যপায়ী ব্যক্তি সমাজ জীবনে অশান্তিতে ও নিরাপত্তাহীনতায় পশুজীবন হতেও অধঃপতনের নিচে নেমে যায়। ফলে সমাজ জীবনে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ, মারামারি ও হত্যা পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে থাকে। অনুরূপ জুয়া খেলাও। বর্তমান সমাজে নানা ধরনের লটারী, হাউজি প্রভৃতি আধুনিকতার নামে চালুকৃত জাতীয় ক্ষতিকর কাজই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো কখনো মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মদ, জুয়া, লটারী, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রাসূল [সা] বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ্যপান করলো, অতঃপর তা থেকে তওবা করলো না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। [বুখারী]

আজকের আফিম, গাজা, ফেনসিডিল উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যা অতিমাত্রায় আমাদের দেশের প্রধান শহরগুলোতে বিক্রি হচ্ছে। এবং যা মানবজীবনকে করে বিষময়।

অনুরূপ রাসূল [সা] সুদ, ঘুষ সম্পর্কেও হুঁশিয়ারী সংকেত উচ্চারণ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রচলিত আইনে সুদের কাজ-কারবারকে সমর্থন করে। যার ফলে কোন বক্তি যদি সরকার থেকে একলাখ টাকা ঋণ নেয় তা শোধ করতে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। তাকে ঋণের বোঝা নিয়ে সুদের অভিশাপ কাঁধে করে কবরে যেতে হয়। তাই রাসূল [সা] বলেছেন, যে সুদ খায়, ঘুষ খায় ও প্রদান করে উভয়ে সমান অপরাধী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত : 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী [সা] সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদিকারবারের সাক্ষী এবং সুদ-চুক্তি লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন।' [বুখারী ও মুসলিম]

রাসূল [সা] আরো বলেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি টাকা ভোগ করে, তার এ অপরাধ ছত্রিশবার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। [মুসনাদে আহমদ]

এতক্ষণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে সমাজের অপরাধ দমনে রাসূল [সা]-এর ভূমিকা আলোকপাত করা হল। উপরিউক্ত কাজগুলো সত্যিই সমাজের জন্যে ক্ষতিকারক। রাসূল যেহেতু আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তো আমরণ অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করেছেন। এসব অপরাধ থেকে আমরা যদি বিরত থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে পারব এবং দুনিয়াতেও সুখে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে পারব। অপরাধ মানুষের সহজাত অভ্যাস, সাথে রয়েছে এ অপরাধ প্রবণতাকে ঘৃণার জন্যে একটি বিবেক। এ বিবেকের সাথে পরামর্শ করে আমাদের চলতে হবে। যদিও বিবেকের কাছে আবেগ কখনো ধরা দেয় না। আবেগ দ্বারা যারাই পরিচালিত হয় তারাই ভুল করেন।

তাই আসুন, সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূল [সা]-এর অনুসরণ করি। পাশাপাশি অন্যায় অপরাধকে এড়িয়ে চলি। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। ■

www.pathagar.com

বার্ষিক প্রতিবেদন

[এপ্রিল ২০০৬-মে ২০০৭]

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

বাংলাদেশকে একটি সুখি ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়তে একদল মননশীল সাহিত্য সংস্কৃতি কর্মী ও সংগঠক তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। ঢাসাস কেন্দ্র তার কর্মসূচীর মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও বিশিষ্ট কবি আসাদ বিন হাফিজ-এর নেতৃত্বে সব্যস্যাচী একটি টিমের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এর সার্বিক কার্যক্রম। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরছি।

১. 'সাহিত্য-সংস্কৃতি' স্মারক-২০০৬ প্রকাশ

খ্যাতিমান কবি মোশাররফ হোসেন খান-এর সম্পাদনায় শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের প্রচ্ছদে 'সাহিত্য সংস্কৃতি' সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক-২০০৬ প্রকাশ করা হয়। চমৎকার কলেবরের এ স্মারক দেশের খ্যাতিমান কবি বুদ্ধিজীবী লেখক সাংবাদিক বৃন্দের লেখায় সমৃদ্ধ ছিল। মাত্র ৫০ টাকা মূল্যের চমৎকার এ স্মারকটি সুধীজনের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

www.pathagar.com

২. নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

৬ মে জাতীয় যাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে পবিত্র সীরাতুন্নবী [সা] উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার।

৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর ফিতা কেটে উদ্বোধন করছেন জাতীয় সংসদের স্পীকার ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার। সাথে অন্যান্য মেহমানবৃন্দ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আহমদ নজির মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ড. নাজিম উদ্দিন প্রাক্তন পরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ড. মাহমুদুল হাসান চেয়ারম্যান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, পিপলস ইউনিভার্সিটি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড. আর এ গনি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আহ্বায়ক ইব্রাহীম মন্ডল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর। উপস্থাপনা করেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। জাতীয় যাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারীতে আয়োজিত দেশের খ্যাতিমান ২৬ জন নবীন-প্রবীণ শিল্পীর দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন ঃ ড. আবদুস সাত্তার, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, এ এইচ এম বশীর উল্লাহ, সাইফুল ইসলাম, অধ্যাপক মীর মোঃ রেজাউল করীম, ফরেজ আলী, ইব্রাহীম মন্ডল, আরিফুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, শহীদুল্লাহ এফ, বারী, আমিনুল ইসলাম আমিন, কৃশান মোশাররফ, মাহবুব মুর্শিদ, বশির মেজবাহ,

www.pathagar.com

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ড. আবদুস সাত্তার। স্বাগত বক্তব্য রাখছেন শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম, মুবাশ্বির মুজমদার, আমিরুল হক এমরুল, মোহাম্মদ আবুল ফজল মুন্না, ফেরদৌস আরা আহমেদ, মুস্তাফা আল মারুফ, আবু দারদা নাঈম, ইসহাক আহমেদ, ফেরদৌসি বেগম, নিসার জামিল, মোরশেদুল আলম ও মোঃ আবদুল্লাহ।

৩. ৩নং জোনের বিশেষ কর্মীসভা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

২৬ মে ঢাসাস কেন্দ্র মিলনায়তনে ৩নং জোন সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ কর্মী সভা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ১নং জোন সভাপতি গবেষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

www.pathagar.com

উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর।

৪. ৩নং জোনের উদ্যোগে কবি ফররুখ আহমদ-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন

কবি ফররুখ আহমদ সত্যের সাধক। সত্য তাঁর জীবন ও কাব্যে সমভাবে প্রকট। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ৩নং জোন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শিক্ষাবিদ ও ভাষা বিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ এ কথা বলেন।

১২ জুন সোমবার ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের ৩নং জোন আয়োজিত রাজধানীর হামদর্দ মিলনায়তনে কবির জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও গানের অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য সম্পাদক কবি সাজজাদ হোসাইন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ফররুখ একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, মাসিক ফুলকুঁড়ি পত্রিকার সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আজাদ, ঢাসাস কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, ঢাসাস কেন্দ্রের সাহিত্য সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি হাসান আলীম, ৩নং জোন সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, কবি ফররুখের বিদ্রোহের স্বরূপ আমরা সবাই বুঝেছি। নজরুল ইসলাম প্রচলিত সমাজ-সংস্কার-ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্রোহ করেছেন, ফররুখ আহমদ সেই ধারা সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দার্শনিক উপলব্ধিবোধ ও বুদ্ধির দীপ্তি তাঁর কবিতার প্রাণ।

www.pathagar.com

সভাপতি বক্তব্যে বলেন, ফররুখ আহমদ বেশ কিছু জনপ্রিয় গান রচনা করেছিলেন। এর অনেকগুলো রেডিওতে প্রচারিত হতো, এখন তা আর শোনা যায় না। আমি মনে করি ফররুখের সেই হারিয়ে যাওয়া গানগুলো সংগ্রহ করে সিডি প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. শিল্পী সাহিত্যিকদের মিলন মেলা

আমরা এমন একটি সময়ে এসে দাঁড়িয়ে আছি যখন এই দুনিয়াকে সভ্যতার মডেল উপহার দেয়ার জন্য প্রয়োজন একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের। তা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে জনগণের সমর্থন নিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকার গঠনের মাধ্যমে। এ জন্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের আহ্বায়ক মীর কাসেম আলী এ কথা বলেছেন। তিনি ১৮ জুলাই বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন মিলনায়তনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত প্রীতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠকদের প্রীতি সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের উপদেষ্টা জনাব হামিদুর রহমান আযাদ ও বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির সভাপতি মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম। আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। কবিতা পাঠ করেন কবি মোশাররফ হোসেন খান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মশিউর রহমান, আমিরুল মোমিনীন মানিক প্রমুখ।

প্রধান অতিথি মীর কাসেম আলী রাসূল [সা]-এর জীবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সভ্যতা বিকাশে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানান।

হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, নেতৃত্বের সংকট পূরণ করতে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে।

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম বলেন, জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য।

৬. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে আবৃত্তি, গান, নিবেদিত কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা

১৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলমগীর কবীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি আসাদ চৌধুরী, সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি মোশাররফ হোসেন খান ও কবি হাসান আলীম।

www.pathagar.com

নজরুল-ফররুখ স্মরণ সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলমগীর কবীর বলেন, নজরুল ও ফররুখ যে আদর্শের কথা বলেছেন সেটা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় রাজনীতির ব্যর্থতা সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে নজরুল ও ফররুখকে স্মরণ করা বেশী প্রয়োজন। বিশেষ অতিথি জনাব কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, কবি নজরুল কবিতা লিখে জেল খেটেছেন। কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের কথা নজরুল ছাড়া অন্য কোন কবি বলেননি। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক জনাব শাহাবদ্দীন আহমদ স্বভাবসুলভ চিত্তাকর্ষক আবৃত্তির মাধ্যমে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নজরুলকে ভয় করে তাঁকে দূরে রাখে কারণ হচ্ছে তাঁর শিক্ষার ভার উনারা বুঝতে পারেন না। তিনি কবি নজরুলকে বিশ্বের জাতীয় কবি আখ্যা দেন। নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জনাব কবি আবদুল হাই শিকদার বলেন, নজরুলের জন্ম হয়েছিল এদেশকে উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য। তিনি ভাষা বিদ্রোহ করেছেন। তার এক হাতে ছিল বাঁশের বাশরী আর এক হাতে ছিল রণতূর্য। তিনি বলেন, কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন পঞ্চাশ দশকের শ্রেষ্ঠ কবি।

সভাপতির বক্তৃতায় জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, কবি নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় চেতনার কবি এবং কবি ফররুখ আহমদ ইসলামী জাগরণে কবি। এই দুই কবির আদর্শ নিয়ে আমাদের জাতিকে এগিয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী জনাব কবি আসাদ বিন হাফিজ।

www.pathagar.com

৭. সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমজানের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা

সাবেক শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি বলেন, সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমজানের ভূমিকা অনন্য। এটা প্রশিক্ষণের মাস। যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, তাদের চেয়ে প্রগতিশীল হওয়ার সুযোগ অন্য কারো নেই। তাদের মধ্যে কোন কুসংস্কার থাকতে পারে না। একমাত্র আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নিলে কোন মানুষের প্রভুত্ব করার সুযোগ থাকে না। তারা পরস্পর ভাই হয়ে যায়।

তিনি ১৫ অক্টোবর ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমজানের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মকবুল আহমদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, নজরুল গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ, জাতীয়তাবাদী দলের তথ্য সম্পাদক জনাব রেজাবুদ্দৌলাহ চৌধুরী, সুরকার শিল্পী আজাদ রহমান ও কবি আসাদ বিন হাফিজ। অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট কবি, শিল্পী, সুরকার, সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব নজরুল-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ। (নীচে) বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী আজাদ রহমান এবং কেন্দ্রের সভাপতি।

www.pathagar.com

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের একাংশ।

৮. ২৮ অক্টোবরের লোমহর্ষক বর্বরতা নিয়ে নির্মিত ভিসিডির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

বিগত ২৬ নভেম্বর আল-ফালাহ্ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ২৮ অক্টোবর ২০০৬'র ঢাকা পল্টনে সংঘটিত হত্যা-সন্ত্রাসের লোমহর্ষক ও বর্বরোচিত ঘটনা নিয়ে নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টারির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক

সাবেক শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রেন্ট প্রযোজিত ডকুমেন্টারী উপহার দিচ্ছেন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রেন্টের আহ্বায়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ।

www.pathagar.com

শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। বক্তব্য রাখেন জনাব মকবুল আহমদ, বি.এন.পি'র তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী। কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

৯. মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রামপুরা বনশ্রী সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ, বিশেষ অতিথি কবি হাসান আলীম, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও হারুন ইবনে শাহাদাত। সভাপতিত্ব করেন রাবসাস সভাপতি এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুব হোসেন।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছে মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী।

১০. কক্সবাজার ও সেন্ট মার্টিনে সাংস্কৃতিক সফর

বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কেন্দ্রের অধিকাংশ সদস্যদের সপরিবারে অংশগ্রহণে বিগত পহেলা ফেব্রুয়ারী থেকে পাঁচ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পর্যটন নগরী কক্সবাজার ও সেন্ট মার্টিনে সাংস্কৃতিক সফর অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর এর নেতৃত্বে এ সফর বাস্তবায়নের জন্য গঠিত হয় কমিটি। আহ্বায়ক– কবি আসাদ বিন হাফিজ, সচিব– মোঃ আবেদুর রহমান, অর্থ বিভাগ– শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। ১০৫ সদস্য বিশিষ্ট এ সাংস্কৃতিক সফরে উল্লেখযোগ্য যারা ছিলেন– বিশিষ্ট লেখক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল হক ও জয়নুল আবেদীন আজাদ পরিবার, বিশিষ্ট শিল্পী হামিদুল

www.pathagar.com

সেন্ট মার্টিনে এক বিশেষ মুহূর্তে কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, কবি আসাদ বিন হাফিজ, আবেদুর রহমান।

ছোট নৌকায় চড়ে ছেড়াদ্বীপের কূলে ভিড়ছে সফরকারী দল।

ইসলাম, কবি সোলায়মান আহসান, বিশিষ্ট ব্যাংকার লেখক ইকবার কবীর মোহন পরিবার, ডাঃ শাহনুর বেগম পরিবার, অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভুঞা পরিবার সহ আরো অনেকে।

১১. এক নং জোনের উদ্যোগে পসাসের বর্ষবরণ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

গত ৬ এপ্রিল ২০০৭ শুক্রবার পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের (পসাস) উদ্যোগে বৈশাখের কবিতা বৈশাখের গান শীর্ষক বর্ষবরণ মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। পসাস সভাপতি কবি মহিউদ্দিন আকবরের সভাপতিত্বে ও পসাস সেক্রেটারী জাকারিয়া

www.pathagar.com

পসাসের বর্ষবরণ মিলনমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

খান সৌরভের পরিচালনায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, কবি আ.শ.ম বাবর আলী, নাট্যকার শাহ আলম নূর, ছড়াকার শফিকুর রহমান রঞ্জু, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক শরীফ আবদুল গোফরান, কবি নূর-ই আউয়াল, কাজী রহিম শাহরিয়ার, ছড়াকার মালেক মাহমুদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আশরাফ সিদ্দিকী নিম্নোক্ত ৫ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এই সভা প্রস্তাব করছে যে, ১. সমগ্র বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার বছরের এই নববর্ষ উৎসবের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবো সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। ২. অতীতে গ্রামবাংলায় এবং শহরে যেসব খেলাধুলা প্রচলিত ছিল সেগুলো পুনরুজ্জীবিত করে খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করতে হবে। ৩. অতীতে যেসব স্থানে গ্রামীণ মেলা জমে উঠতো তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে গ্রামীণ কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করে গ্রামবাংলাকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। ৪. প্রতিটি গ্রামে এবং পথের দুই ধারে প্রচুর ফলদ এবং অর্থকরী বৃক্ষ রোপন করে দেশকে অন্যান্য দেশের মত সবুজ ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে হবে– যার দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা-জেলা পরিষদ। ৫. যে কোন মূল্যে আমাদের সাক্ষরতা ও শিক্ষার হার বাড়াতে হবে।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কণ্ঠশিল্পী গোলাম নবী পান্না ও মোমিন মেহেদীর উপস্থাপনায় নববর্ষের কবিতা ও গান পরিবেশন করা হয়।

১২. ‘স্পেন ট্রাজেডি’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ছড়াকার শফিকুর রহমান রঞ্জু রচিত স্পেন ট্রাজেডী শীর্ষক ছড়াগ্রন্থের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট লেখক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল হক, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, ছড়াকার মানসুর মুজাম্মিল, মহিউদ্দিন আকবর, কবি নূর-ই আউয়াল, সহ-সেক্রেটারী মোঃ আবেদুর রহমান ও ছড়াকার শফিকুর রহমান রঞ্জু প্রমুখ।

‘স্পেন ট্রাজেডি’ ছড়াগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন জনাব মাহবুবুল হক ও কবি আসাদ বিন হাফিজ।

১৩. ৪র্থ কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

বিগত ১৯ এপ্রিল সীরাতুন্নবী [সা] উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলানায়তনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ভাষা বিজ্ঞানী, ড. কাজী দীন মুহম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কবি আবদুর রশীদ খান, কবি আল মুজাহিদী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, আমরা আজ এক অশান্ত দুনিয়ায় বাস করছি।

www.pathagar.com

চতুর্থ কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. কাজী দীন মুহাম্মদ। বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ, (নীচে) কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর, কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

চারিদিকে হাহাকার। ধর্ম নেই, নীতি নেই, মানবতা বহু দূরে। যদি পৃথিবীতে শান্তি ও সুখের চাষ করতে হয় তাহলে আদর্শ অনুসরণ করতে হবে হযরত মুহাম্মদ [সা] এর। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজ চরিত্র বলে মানব সমাজের সকল অসুখ দূর করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রকৃত মানব সমাজ। এ সমাজেরই কাম্য একমাত্র দিশারী অন্ধকারে ধ্রুব নক্ষত্র, ইসলামী আদর্শ রাসূল [সা] এর প্রদর্শিত পথ। সভাপতির বক্তব্যে কবি আল মাহমুদ বলেন, আমাদের নবী করীম [সা] তাঁর সময়ে তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। হাদীসের অনেক বিষয় সঠিকভাবে আমাদের দেশে উৎঘাটিত হয়নি, তা না হলে জানা যেত যে আমাদের নবী শিল্প সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ও প্রশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি কবিদের জন্য তাঁর পোষাক আর চাদর খুলে দিয়েছিলেন।

কবি আসাদ বিন হাফিজ-এর পরিচালনায় স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি আল মুজাহিদী, কবি আবদুর রশীদ খান, মাহবুবুল হক, হাসান আলীম, মোশাররফ হোসেন খান, ইব্রাহীম মন্ডল, আবদুল মুকীত চৌধুরী, শরীফ আবদুল গোফরান, ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, নূর-ই আউয়াল, শহীদ সিরাজী, আফসার নিজাম, মনসুর আজিজ, গোলাম নবী পান্না, সোহরাব আসাদ, নিজাম সিদ্দিকী, শুভ্র জাহিদ, মালেক মাহমুদ

www.pathagar.com

প্রমুখ খ্যাতিমান কবি। কবিতা পাঠ শেষে শরীফ বায়জীদ মাহমুদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় হামদ-নাত পরিবেশন করে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, সন্দীপন শিল্পী গোষ্ঠী, অনিন্দ্য সাংস্কৃতিক সংসদ, মহানগর শিল্পী গোষ্ঠী ও টুনটুনিদের আসরের ক্ষুদে শিল্পীরা। এতে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করে– ফারুক আল মামুন এর কথা ও সুরে হামদ– সাগর নদী আর পাহাড় বনে এবং সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী পরিবশেন করেন আমিরুল মোমেনীন মানিক এর কথা ও সুরে নাত–মরুর বুকে ফুটলো যে দিন এবং শিশু শিল্পীরা পরিবেশন করে হামদ-নীল আসমান সবুজ পৃথিবী। অনিন্দ্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ পরিবেশন করে লুৎফর রহমান এর কথা ও সুরে হামদ– রাত্রির আকাশে জোছনা ও মেঘের খেলা এবং আ ন ম মনিরউদ্দীন এর কথা ও কাওসার হামিদের সুরে নাত– হে রাসূল তোমায় বাসলে ভালো। টুনটুনিদের আসরের ক্ষুদে

কাওয়ালী পরিবেশন করছে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী।

না'ত পরিবেশন করছে টুনটুনিদের আসরের ক্ষুদে শিল্পীরা।

www.pathagar.com

কাওয়ালী পরিবেশন করছে মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী

শিল্পীরা পরিবেশন করেন আবু তাহের বেলাল এর কথা ও মশিউর রহমান এর সুরে নাত– ছোট বড় সবার কাছে ছিলেন আলামীন এবং আবু তাহের বেলাল এর কথা ও মশিউর রহমান এর সুরে ইসলামী গান–- খেলার সময় খেলা বন্ধু পড়ার সময় পড়া। একক সংগীত পরিবেশন করেন হাসনাত আবদুল কাদের– আরব ভূমির গুলবাগিচায়। মহানগর সংস্কৃতি সংসদের শিল্পীবৃন্দ পরিবেশন করে হাসিনুর রব মানুর নেতৃত্বে কাওয়ালী।

সবশেষে সাইফুল্লাহ মানছুর পরিচালিত ডকুমেন্টারী মদীনা মুনাওয়ারা ঃ ইতিহাসে ফিরে যাওয়া প্রদর্শিত হয়। হাজারো দর্শক শ্রোতা এ অনুষ্ঠান প্রাণভরে উপভোগ করেন।

১৪. নাবিকের সাহিত্য সভায় নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ

২৪ এপ্রিল ২০০৬ সোমবার সন্ধ্যায় আল ফালাহ্ মিলনায়তনে নাবিক সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট গবেষক, সম্পাদক, কলামিস্ট শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রধান অতিথি হিসাবে তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমরা জাতিগত দিক থেকে বাংলাদেশী মুসলমান। যারা বাঙ্গালী মুসলমান হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় তাদের প্রশ্ন করতে চাই যদি মুসলমান শব্দটি ফেলে দেয়া হয় তাহলে আর কি থাকে? আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির একমাত্র ভিত্তি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।'

নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি ইবরাহীম বাহারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় আরও বক্তব্য রাখেন কবি হাসান আলীম, ছড়াকার শরীফ আবদুল গোফরান।

১৫. নাবিক সাহিত্য সভায় কবি আল মাহমুদ

৩১ মে ২০০৬ বুধবার বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে নাবিক সাহিত্য সভায় প্রধান অতিথি বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ বলেন, লেখকদের একটিই মূলমন্ত্র হওয়া

www.pathagar.com

নাবিকের সাহিত্যসভায় বিশিষ্ট নজরুল গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ

উচিত তা হচ্ছে পূর্বসূরীদের সাহিত্যের দেয়ালকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে নিজের একটি শক্ত দেয়াল নির্মাণ করা। যদি তা করতে সক্ষম হয় তাহলে তারা টিকে থাকবে নয়তো সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাবে।

নাবিক সভাপতি ইবরাহীম বাহারীর সভাপতিত্বে উক্ত সাহিত্য সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম ও আবেদুর রহমান। সংগীত পরিবেশন করেন হাসিনুর রব মানু ও আবুল কালাম আজাদ। সাহিত্য সভায় প্রবন্ধ পড়েন কবি আবদুল কুদ্দুস ফরিদী। গল্প পড়েন নাসিমুল বারী ও নাজমুস সায়াদাত।

নাবিক সাহিত্যসভায় কবি আল মাহমুদ

www.pathagar.com

১৬. শাহাবুদ্দীন আহমদের জন্য সুবচনের বিশেষ দোয়া

সৎসাহিত্য আন্দোলনের নিরাপোষ সৈনিক, সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের অকৃত্রিম বান্ধব বিশিষ্ট সাহিত্যব্যক্তিত্ব ও নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ বিগত ৯ এপ্রিল মস্তিষ্কের

রক্ত ক্ষরণে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সুবচন সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে তাঁর এই গুরুতর অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দানের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সুবচনের শুভাকাঙ্ক্ষী জনাব আনোয়ার হোসাইন। দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন সুবচন সভাপতি কামরুল ইসলাম হুমায়ুন, সেক্রেটারী আলতাফ হোসাইন রানা এবং আবদুল আজিজ বাদল, শেখ আহমদ, জয়নাল আবেদীন, সরকার আলমগীর, মাহমুদুর রহমান ও রফিকুল ইসলাম।

ঈদের কবিতা পাঠ ও ইফতার মাহফিল

১৮ অক্টোবর ২০০৬ আল ফালাহ মিলনায়তনে নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ঢাকা আয়োজন করে ঈদের উপর কবিতা পাঠ ও ইফতার মাহফিল। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ফজলুর রহমান, আবেদুর রহমান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন নাবিক সভাপতি ইবরাহীম বাহারী।

১৭. নাবিকের সাহিত্য সভায় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল হক

০২ আগস্ট ২০০৬ বিশিষ্ট কলামিস্ট প্রাবন্ধিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল হক নাবিক সাহিত্য সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। নাবিক সভাপতি ইবরাহীম বাহারীর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। লেখা পাঠে অংশ নেন নূর-ই-আওয়াল, নুরুন্নাহার শেফালী, সাইফ মাহদী, মঈন মুরসালিন, শাকিল মাহমুদ, মালেক মাহমুদ, প্রহরী

নাবিক সাহিত্যসভায় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল হক

www.pathagar.com

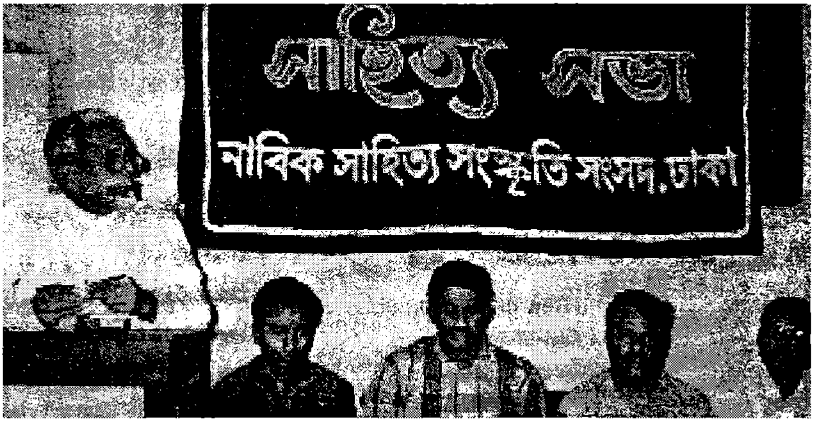

নাবিক সাহিত্যসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ

মনিরুজ্জামান, নাফে নজরুল, নাজমুস সায়াদাত প্রমুখ। মাহবুবুল হক বলেন, সাহিত্যে সৃজনশীলতা ও তারুণ্যের উদ্যমকে কাজে লাগাতে হবে।

১৮. সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবুল আসাদ

৩০ এপ্রিল ২০০৭ সোমবার নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ আয়োজন করে এক সাহিত্য সভার। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক ও দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ। তিনি বলেন, কবিতায় আধুনিকতার সাথে সাথে ম্যাসেজ থাকতে হবে। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কবি হাসান আলীম, শরীফ আবদুল গোফরান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন নাবিক সভাপতি ইবরাহীম বাহারী। পঠিত লেখার উপর আলোচনা করে শুভ জাহিদ। সংগীত পরিবেশন করেন আবুল আলা মাসুম। লেখা পাঠ করেন কবি খালীদ শাহাদাৎ হোসেন, কবি সোহরাব আসাদ, কবি আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, কবি মনসুর আজিজ, কবি রেদওয়ানুল হক, কবি আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। সভাটি পরিচালনা করেন নাবিক সেক্রেটারী নাজমুস সায়াদাত।

১৯. শাহাবুদ্দীন আহমদের জন্য দোয়া মাহফিল

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদের জন্য নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ঢাকা আয়োজন করে দোয়া অনুষ্ঠান। এতে তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি ইবরাহীম বাহারী। আরো উপস্থিত ছিলেন নাজমুস সায়াদাত, আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, মোজাম্মেল প্রধান প্রমুখ।

শেষ কথা

এই ছিল এপ্রিল '০৬-মে '০৭ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দিবস, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণ সভা, সেমিনার, গান ও ক্যালিগ্রাফির প্রশিক্ষণ ক্লাশ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অব্যাহত ছিল।

www.pathagar.com

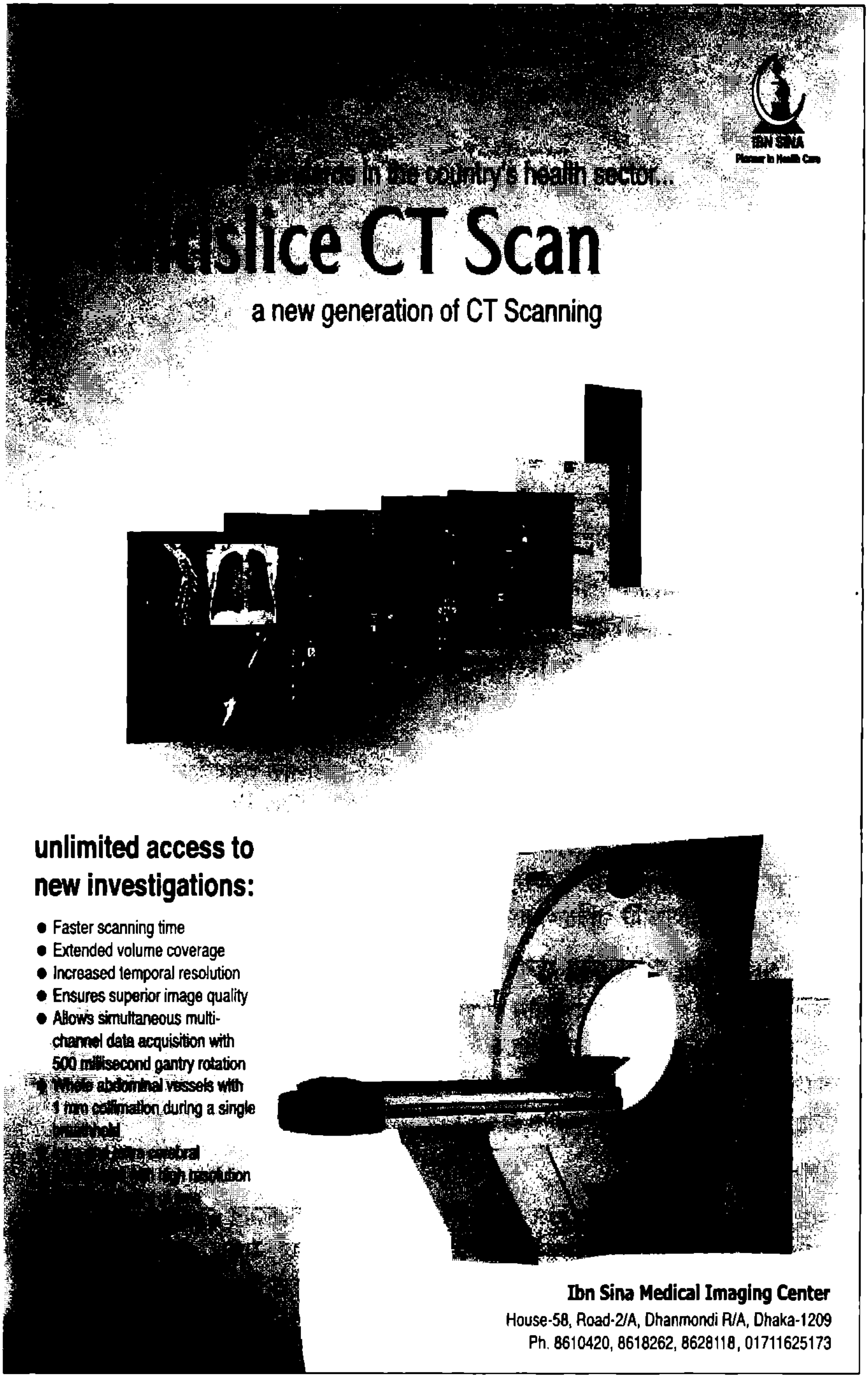

www.pathagar.com

বের হলো বের হলো বের হলো

মুহাম্মদ আনওয়ার হুসাইনের-

আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজের- **৪র্থ খণ্ড**

কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস

মূল্য ঃ ৩০০/-

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

সিরিজের অন্য গ্রন্থগুলো হলো

সিরিজ-১ : **আল কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগব্যাংগ** (মূল্য: ২৫০/-)
সিরিজ-২ : **কুরআন কিয়ামাত ও পরকাল** (মূল্য: ২৬০/-)
সিরিজ-৩ : **কুরআন মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব** (মূল্য: ২৬০/-)

সম্প্রতি প্রকাশিত আরো পাঁচটি বই

আহমেদ দিদাত রচিত ও এ কে মুহাম্মদ আলী অনূদিত-
- **আলৌকিক কিতাব আল কুরআন** (মূল্য: ৫০/-)

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা রচিত
- **তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবিহ নামায** (মূল্য: ২৫/-)

প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ আলমগীর রচিত
- **An Analytical look Into Modern and Islamic Education** (মূল্য: ৪০/-)

মাওলানা হামিদা পারভীন রচিত
- **দারসে হাদীস প্রথম খণ্ড** (মূল্য- ৮০/-)
- **দারসে হাদীস দ্বিতীয় খণ্ড** (মূল্য- ৮০/-)

প্রকাশের অপেক্ষায়

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রচিত ও
জুলফিকার আহমদ কিসমতি অনূদিত-
- **শরীয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা**

আল মেহেদী রচিত-
- **সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য**

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম রচিত-
- **ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা**

আল্লামা হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম রচিত
- **রুহের রহস্য**

আলহাজ্ব জুনাব আলী ভূঁইয়া রচিত
- **দারসে কুরআন (তৃতীয় খণ্ড)**

মাওলানা হামিদা পারভীন রচিত
- **দারসে হাদীস (তৃতীয় খণ্ড)**

আজই আমাদের শো-রুমগুলো পরিদর্শন করুন

আমাদের বাছাইকরা বইয়ের বিপুল সমাহার থেকে আপনার পছন্দের বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৬২২১৯৫, ০১৮১ ৫৪২২৪১৯
www:ahsanpublication.com

বিক্রয় কেন্দ্র
- বুক এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
  ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
  ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১ ৯৩৭৪৮০
- ১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা
  ফোন ঃ ৮৩৫৩১২৭, ০১৭১ ৪২০৭৮৩৯

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত বইয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি

বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
❖ আল কুরআনের অভিধান	সংকলন : খলিলুর রহমান মুমিন	নিট-২২৫/-
❖ কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	নিট-৬০/-
❖ সহীহ মুসলিম (১)	ইমাম মুসলিম (র)	নিট-১৩০/-
❖ সহীহ মুসলিম (২)	ইমাম মুসলিম (র)	নিট-৩০০/-
❖ সহীহ মুসলিম (৩)	ইমাম মুসলিম (র)	২৪০/-
❖ সহীহ মুসলিম (৪)	ইমাম মুসলিম (র)	নিট-১৫০/-
❖ সহীহ মুসলিম (৫)	ইমাম মুসলিম (র)	নিট-১৫০/-
❖ সহীহ মুসলিম (৬)	ইমাম মুসলিম (র)	নিট-২০০/-
❖ সহীহ মুসলিম (৭)	ইমাম মুসলিম (র)	নিট-২৩০/-
❖ সহীহ মুসলিম (৮)	ইমাম মুসলিম (র)	নিট-৩০০/-
❖ জামে আত-তিরমিযী (১)	ইমাম তিরমিযী (র)	নিট-১৬০/-
❖ জামে আত-তিরমিযী (২)	ইমাম তিরমিযী (র)	নিট-১৫০/-
❖ জামে আত-তিরমিযী (৩)	ইমাম তিরমিযী (র)	নিট-৩০০/-
❖ জামে আত-তিরমিযী (৪)	ইমাম তিরমিযী (র)	নিট-১৯০/-
❖ জামে আত-তিরমিযী (৫)	ইমাম তিরমিযী (র)	নিট-১৯০/-
❖ জামে আত-তিরমিযী (৬)	ইমাম তিরমিযী (র)	নিট-২৮০/-
❖ শামায়েলে তিরমিযী	ইমাম তিরমিযী (র)	১০০/-
❖ সুনানু আবী দাউদ (১)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	নিট-২৫৫/-
❖ সুনানু আবী দাউদ (২)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	নিট-৩৫০/-
❖ সুনান আন-নাসাঈ (১)	ইমাম নাসাঈ (র)	নিট-১৭০/-
❖ সুনান আন-নাসাঈ (২)	ইমাম নাসাঈ (র)	নিট-২৬০/-
❖ সুনান আন-নাসাঈ (৩)	ইমাম নাসাঈ (র)	৩০০/-
❖ রিয়াদুস সালেহীন (১)	ইমাম আন-নববী (র)	নিট-১২০/-
❖ রিয়াদুস সালেহীন (২)	ইমাম আন-নববী (র)	নিট-১৪০/-
❖ রিয়াদুস সালেহীন (৩)	ইমাম আন-নববী (র)	নিট-১৪০/-
❖ রিয়াদুস সালেহীন (৪)	ইমাম আন-নববী (র)	নিট-১১০/-
❖ আযকারে মাসনূনাহ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	নিট-৫০/-
❖ আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী	নিট-১০০/-
❖ আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (২)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী	নিট-৮০/-
❖ সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	নিট-১৯০/-
❖ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (১)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-১০০/-
❖ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (২)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-৮০/-
❖ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৩)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-১১৫/-
❖ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৪)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-১২০/-
❖ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৫)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-১৫০/-
❖ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৬)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-১২০/-
❖ তাবি'ঈদের জীবনকথা (১)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-১১০/-
❖ তাবি'ঈদের জীবনকথা (২)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	নিট-১৭০/-
❖ মহানবীর (সা) মহান আন্দোলন	এ কে এম নাজির আহমদ	৪০/-
❖ ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ কে এম নাজির আহমদ	নিট-৫৫/-
❖ সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর	মোশাররফ হোসেন খান	৬০/-
❖ হাজী শরীয়তুল্লাহ	মোশাররফ হোসেন খান	নিট-৫০/-
❖ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ	মোশাররফ হোসেন খান	নিট-৪০/-
❖ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	২০০/-

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (দোতলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৬-৭, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬০৬৪৭, ই-মেইল : www.bicdhaka.com

www.pathagar.com

বালাগাল উলা বিকামালিহি

কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনিরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুতকণা-স্ফুলিংগে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিননুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আল-ফারুকের-হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদত অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে
নিখিল ব্যথিত 'উম্মত লাগি' এখনো তোমার অশ্রু ঝরে।
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।

ফর্‌রুখ্‌ আহ্‌মদ

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরীয়াহ্‌ মোতাবেক পরিচালিত